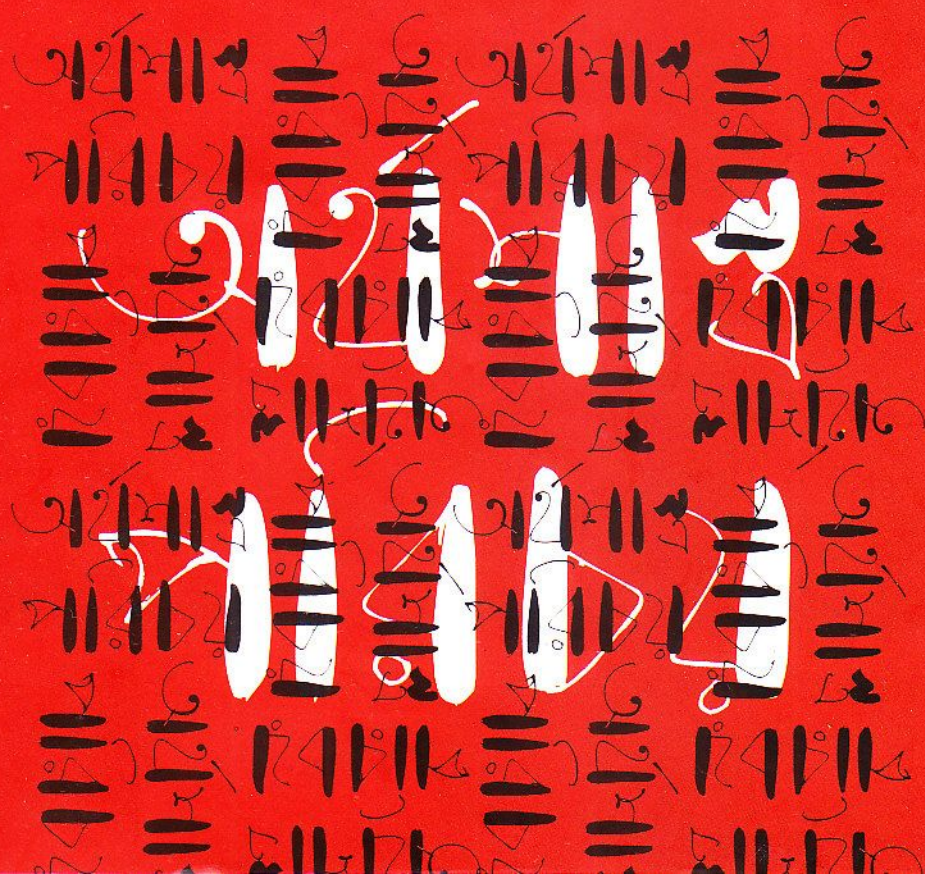


অর্থশাস্ত্র পরিচয়

আনু মুহাম্মদ



“... উৎপাদনের ধরন কিংবা উৎপাদনের লক্ষ্যে অনেক পরিবর্তন হয়। প্রযুক্তির বিকাশ হয়, উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে। এসব কারণে অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। তার বিকাশ ঘটেছে, অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য, অনেক গভীরতা এসেছে।

এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার যে, মানুষের ইতিহাসে অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা যেমন একটি নয়, বহু; তেমনি অর্থনীতি বিষয়ক তত্ত্ব বা অর্থশাস্ত্রও একটি নয়, বহু। আজকের আমরা যে অর্থনীতির (economy) মধ্যে বসবাস করি, তাকে অনেক সময় এরকমভাবে বলা হয় যেন মানুষ চিরকাল এই রকম একটি ব্যবস্থাতেই বসবাস করেছে। আজকে আমরা যে অর্থশাস্ত্রকে (economics) সবচাইতে শক্তিশালী বা প্রভাবশালী হিসেবে দেখি, সেটাকে অনেক সময় ভুলক্রমে এরকম মনে করা হয় যেন অর্থনীতির এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা, কিংবা অর্থশাস্ত্রের যেন এক ধরনের ব্যাখ্যাই বরাবর ছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়।

আমরা আগেই বলেছি যখন থেকে মানুষ উৎপাদন করেছে তখন থেকেই তার কি উৎপাদন করা দরকার, কিভাবে উৎপাদন করা দরকার, কিভাবে তার বিতরণ হবে, কে কি ভোগ করবে, মালিকানা কি হবে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করেছে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, নানা সূত্রাবলী। এগুলোই অর্থনৈতিক তত্ত্ব।...”

ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ

ଆନୁ ମୁହାମ୍ମଦ

ମଂହତି

୧୮୧୭

অর্থশাস্ত্র পরিচয়
প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৪১৭ এপ্রিল ২০১০
স্বত্ব: শিল্পী বড়ুয়া

প্রকাশক
সংহতি প্রকাশন
৩০৫, রোজ ভিউ প্রাজা, ৩য় তলা,
১৮৫ বীরউত্তম সি আর দত্ত রোড, হাতিরপুল, ঢাকা ১২০৫
শো-রুম: ১০৯ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, নিচতলা, কাটাবন, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা
অক্ষর বিন্যাস
কাওছার আলী
মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স, ৬৭/ডি, গ্রিনরোড, পাছপথ, ঢাকা ১২০৫

দাম
দুইশত পঁচাত্তর টাকা বিদেশ ১৫ ডলার

ARTHASHASTRA PARICHOY by ANU MUHAMMAD

Published by Samhati Prokashan (Samhati Publications)

For information, address Samhati Publications, Room 305, Rose View Plaza, 2nd Floor
185 Biruttam C R Dutta Road, Hatirpul, Dhaka 1205, Bangladesh.

E-mail: samhatiprokashan@yahoo.com

Cover Design: Sabyasachi Hazra. Price 250.00 Taka / US \$ 15.00.

ISBN 978-984-8882-06-1

www.iscalibrary.com

উৎসর্গ

আজফার হোসেন

পিয়াস করিম

ও

নূরুল কবীর

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	৯
প্রথম অধ্যায়	
অর্থশাস্ত্রের ধারণা	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ভোক্তার আচরণ ও চাহিদা তত্ত্ব	৩১
তৃতীয় অধ্যায়	
ভোক্তার ভারসাম্য	৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	
চাহিদার মাত্রা ও নমনীয়তা	৭১
পঞ্চম অধ্যায়	
উৎপাদন	৮১
ষষ্ঠ অধ্যায়	
উৎপাদন ব্যয়	১০০
সপ্তম অধ্যায়	
বাজার ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা	১০৮

অষ্টম অধ্যায়	
অনিখুঁত প্রতিযোগিতা	১২৫
নবম অধ্যায়	
উৎপাদন উপাদানের দাম ও বিতরণ	১৩৬
দশম অধ্যায়	
বিতরণ ও বৈষম্য	১৪৭
একাদশ অধ্যায়	
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : ধারণা ও বিনিময় হার	১৫৩
দ্বাদশ অধ্যায়	
লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব ও বাণিজ্য শর্ত	১৬১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব	১৬৯
চতুর্দশ অধ্যায়	
সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণা	১৭৬
পঞ্চদশ অধ্যায়	
সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও বিতর্ক	১৮৮
ষোড়শ অধ্যায়	
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয়	১৯৬
গ্রন্থপঞ্জি	২০১

মুখবন্ধ

অর্থশাস্ত্র সমরূপ জ্ঞানের কোনো ধারা নয়। শুধু শক্তির সাথে ব্যক্তির মতানৈক্যের বিষয় নয়, অন্যান্য জ্ঞানধারার মতো এখানেও মতাদর্শিক সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত অনেক ধারা উপস্থিত আছে। এগুলোর মধ্যে চিন্তা, বিশ্লেষণ পদ্ধতি, লক্ষ্য, উপকরণ এবং সিদ্ধান্তে অনেক তফাৎ হয়। ‘মূলধারার অর্থশাস্ত্র’ বলে পরিচিত ধারাটি যদিও নিজেকে মতাদর্শমুক্ত, বৈজ্ঞানিক, নির্মোহ বলে দাবি করে, কিন্তু সারাবিশ্বে এই ধারাটি এখন পুঁজির দখল, নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য এমনকি গণহত্যার প্রধান তাত্ত্বিক অবলম্বন হিসেবেই কাজ করছে। পর্যালোচনাবিহীন, প্রশ্নবিহীন অধ্যয়নের যে ধারা বাংলাদেশে বিরাজমান; বিদ্যায়তন কিংবা গবেষণাচর্চা সেই ধারার ওপর ভর করে খণ্ডিত, যান্ত্রিক, আত্মসমর্পিত চিন্তাকেই পুনরুৎপাদন করতে সক্রিয়। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন ধারা, তাত্ত্বিক কাঠামোকে যতটা সম্ভব সহজ করে উপস্থাপন এবং অর্থশাস্ত্রের ‘মূল ধারা’কে পর্যালোচনার সঙ্গে, ভেঙে ভেঙে, ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতাসহ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মন্তব্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন অধ্যাপক নূরুল হক এবং ড. আমির হোসেন। গ্রন্থনায় সহযোগিতা করেছেন নাজমে সাবিনা। তাঁদেরকে এইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ‘সংহতি’ প্রকাশনকে ধন্যবাদ।

আনু মুহাম্মদ
২৫ এপ্রিল ২০১০

প্রথম অধ্যায়

অর্থশাস্ত্রের ধারণা Concepts of Economics

বর্তমানে অর্থশাস্ত্র বা Economics বলতে আমরা জ্ঞানের যে শাখা দেখি তা বহু বছরের তর্ক-বিতর্ক, বাস্তবতার দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ে এসেছে। অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গেলে তাই এর বিকাশের সহজ জটিল ধারা অনুধাবন করা দরকার। সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান কালেও অর্থশাস্ত্র সর্বজনসম্মত একক জ্ঞানের শাখা নয়। এর মধ্যে আছে বহুমত, বহু পথ। সেগুলো সম্পর্কেও কিছু ধারণা থাকা দরকার। প্রথম ভাগে আমরা এই বিষয়গুলোকেই আলোচনা করবো। এখানে থাকবে অর্থশাস্ত্রের ধারণা, এর বিকাশ ধারা, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাজন, বাজার, সরকার সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ।

অর্থশাস্ত্র কী

অর্থশাস্ত্র কাকে বলা যাবে সেটা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা কখনও একমত হতে পারেননি। তবে এর আলোচনা ও বিশ্লেষণের এলাকার অনেকগুলো দিক সম্পর্কে অনেকেই একমত।

অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, ‘অর্থশাস্ত্র হলো সম্পদ নিয়ে আলোচনার বিজ্ঞান।’ জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করেন, ‘অর্থশাস্ত্র সম্পদের স্বরূপ এবং তার উৎপাদন ও বিতরণের নিয়মাবলী আলোচনা করে।’

১৮২০ সালের ৯ অক্টোবর ম্যালথাসের কাছে লেখা এক চিঠিতে রিকার্ডো যা বলেছিলেন তা অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা দাঁড় করানোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলা দরকার যে, তাঁদের সময়ে অর্থীৎ ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের সময়ে, বর্তমান সময়ে যাকে বলা হয় অর্থশাস্ত্র বা Economics তাকে বলা হলো রাজনৈতিক অর্থনীতি বা Political Economy। তিনি বলেছিলেন, ‘আপনাদের মতে রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো সম্পদের প্রকৃতি এবং কারণ অনুসন্ধান— আমি মনে করি একে বলা উচিত যে বিধি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উৎপাদনের বিভাজন নির্ধারণ করে তাকে অনুসন্ধান করা। পরিমাণ দিয়েই কোনো বিধি দাঁড় করানো যায় না, কিন্তু অনুপাত থেকে মোটামুটি সঠিক একটি বিধি দাঁড় করানো যায়। দিনে দিনে আমি আরও বেশি বেশি করে বুঝতে পারছি যে, আগের অনুসন্ধানটি অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর এবং পরেরটিই কেবলমাত্র বিজ্ঞানের কাছে

গ্রহণযোগ্য।^১ অর্থাৎ রিকার্ডের এই বক্তব্য অনুযায়ী অর্থশাস্ত্রের মূল কাজ হলো অর্থনীতির ভেতরের সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার সুবাদে সম্পদ বিতরণের বিধি অনুসন্ধান।

আলফ্রেড মার্শাল বলেন, ‘অর্থশাস্ত্র একদিকে যেমন সম্পদের বিজ্ঞান তেমনি অন্যদিকে এটি আরও গুরুত্বের সঙ্গে মানুষ অধ্যয়নের বিজ্ঞান। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে।’ লায়নেল রবিন্স সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন এভাবে, ‘অর্থশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যেটি লক্ষ এবং বিকল্প ব্যবহারের সীমিত উপায়ে সম্পর্ক হিসেবে মানুষের কার্যকলাপ আলোচনা করে।’ স্যামুয়েলসন বলেন, ‘অর্থশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি অধ্যয়নশাস্ত্র যেটি ব্যক্তি ও সমাজ কীভাবে অর্থের ব্যবহার করে কিংবা না করে, উৎপাদনশীল সম্পদ যার বিকল্প ব্যবহার সম্ভব তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে এবং তা বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে বিতরণ করে তার পর্যালোচনা করে।’

বস্তুত অর্থশাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে। আর এই অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ ও বিনিময়। অর্থশাস্ত্র তা যে পর্যায়েই হোক এই চারটি কাজকেই অধ্যয়নের মূল বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে। তবে এই অধ্যয়ন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অর্থশাস্ত্র কীভাবে বিকশিত হয়েছে

মানুষ যখন থেকে উৎপাদন শুরু করেছে তখন থেকেই তার অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তা শুরু। কী উৎপাদন করতে হবে, কীভাবে উৎপাদন করতে হবে, কার জন্য উৎপাদন করতে হবে এসব চিন্তারও সূত্রপাত তখনই। মানুষের জীবনযাপন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, উৎপাদন করবার উপকরণ সবকিছুই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। উৎপাদনের আয়তন বেড়েছে, উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে। উৎপাদনের লক্ষ্য এক থাকেনি। এসব ক্ষেত্রে কখনো দ্রুত, কখনো ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন এসেছে তার কারণে অর্থনীতি বিষয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক সময় ছিল যখন মানুষ যৌথভাবে জীবনযাপন করতো, যা কিছু উৎপাদন বা আহরণ হতো তা পরিমাণেও ছিল অল্প আর যতটুকু ছিল তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে

- ১ “Political Economy you think is an enquiry into the nature and causes of wealth- I think it should be called an enquiry into the laws which determine the division of the produce of industry amongst the classes who concur in its formation. No law can be laid down respecting quantity, but a tolerably correct one can be laid down respecting proportions. Everyday I am more satisfied that the former enquiry is vain and delusive, and the latter only the true objects of the science.” Keynes, *General Theory*, 4

নেয়াতেই তারা অভ্যস্ত ছিল। কালক্রমে মানুষের একদিকে উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে, সম্পদ বাড়ে, অন্যদিকে মানুষের মধ্যে যৌথ জীবনযাপনের আদিপর্বও শেষ হয়, দেখা দেয় তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ। একে একে মানুষ নানারকম অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। উৎপাদনের ধরন কিংবা উৎপাদনের লক্ষ্যে অনেক পরিবর্তন হয়। প্রযুক্তির বিকাশ হয়, উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে। এসব কারণে অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। তার বিকাশ ঘটেছে, অর্থনীতি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য, অনেক গভীরতা এসেছে।

এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার যে, মানুষের ইতিহাসে অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা যেমন একটি নয় বহু; তেমনি অর্থনীতি বিষয়ক তত্ত্ব বা অর্থশাস্ত্রও একটি নয়, বহু। আজকের আমরা যে অর্থনীতির (economy) মধ্যে বসবাস করি, তাকে অনেক সময় এরকমভাবে বলা হয় যেন মানুষ চিরকাল এই রকম একটি ব্যবস্থাতেই বসবাস করেছে। আজকে আমরা যে অর্থশাস্ত্রকে (economics) সবচাইতে শক্তিশালী বা প্রভাবশালী হিসেবে দেখি, সেটাকে অনেক সময় ভুলক্রমে এরকম মনে করা হয় যেন অর্থনীতির এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা, কিংবা অর্থশাস্ত্রের যেন এক ধরনের ব্যাখ্যাই বরাবর ছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়।

আমরা আগেই বলেছি যখন থেকে মানুষ উৎপাদন করছে তখন থেকেই তার কি উৎপাদন করা দরকার, কিভাবে উৎপাদন করা দরকার, কিভাবে তার বিতরণ হবে, কে কি ভোগ করবে, মালিকানা কি হবে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করেছে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, নানা সূত্রাবলী। এগুলোই অর্থনৈতিক তত্ত্ব। তবে এসব চিন্তা এবং তত্ত্ব আগে ছিল অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন।

এসব বিষয়ে গোছানো এবং লিখিত গ্রন্থ হিসেবে প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হলো: কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র। এটি লিখিত হয় প্রাচীন ভারতে, এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। মৌর্য সাম্রাজ্যের চন্দ্রগুপ্তের সময়ে। এর বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে কলকাতায়। অর্থনীতি বিকাশের মাত্রার কারণেই সে সময় অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায় বিশ্লেষণের মাত্রা ছিল কম। অন্য অনেক বিষয়ও এখানে অর্থশাস্ত্রের আলোচনারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপরও বহুদিন পর্যন্ত জ্ঞানচর্চার মধ্যে আমরা এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। দীর্ঘ সময় ধরে জ্ঞানচর্চায় আরেকটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হলো ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই জ্ঞানচর্চা। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র বা তৎকালীন গ্রীসে জ্ঞানচর্চা অবশ্য ধর্মীয় কোনো কাঠামোর মধ্যে হয়নি। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। সেজন্য অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞানচর্চার একটি বড় অংশ আমরা পাই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে। এছাড়া রাজদরবারের নির্দেশ-লুকুমনামা, নীতিমালা, রাজ-পণ্ডিতদের মতামত ইত্যাদিও দীর্ঘসময় অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি ছিল।

বর্তমান অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ধারা

শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো আসে, তাতে অন্যান্য জ্ঞান শাখার পাশাপাশি অর্থশাস্ত্র চর্চাও ধর্ম ও রাজদরবারের বাইরে চলে আসে। মার্কেন্টাইলিস্ট এবং ফিজিওক্র্যাটদের ধারণাগুলোর বিশ্লেষণ এবং বিকাশ সাধন করে সুসংগঠিতভাবে নতুন পর্যায়ে অর্থশাস্ত্র চর্চার সূচনা করেন অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith, 1723-90)। তাঁর প্রধান গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে, নাম: *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*। এরপর অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে যাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় তিনি হলেন ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo, 1772-1823)। কাছাকাছি সময়ের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের মধ্যে আছেন: ম্যালথাস (Thomas Robert Malthus, 1766-1834), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill, 1806-73)। এঁদের সবার অবস্থানে অনেক পার্থক্য থাকলেও তাঁদের পদ্ধতিগত অনেক মিলও আছে। সেজন্য তাঁদের মতবাদকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় ক্লাসিকাল ধারা (Classical School)।

শিল্প বিপ্লবোত্তর পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকশিত হতে থাকলে অর্থনীতি বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রকরণে নতুন নতুন উপাদানের চাহিদাও তৈরি হয়, যুক্তও হতে থাকে। ১৮৭০-এর দশকে প্রান্তিকতাবাদী বলে পরিচিতির বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নতুন অনেক বিষয় নিয়ে আসেন। এগুলোর সমন্বয়, বিকাশ ও তাকে সুসংহতভাবে উপস্থাপন করেন আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall, 1842-1924)। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে, *Principles of Economics* (1890)। মতাদর্শিকভাবে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে অভিন্ন অবস্থান থাকলেও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নতুন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেন তিনি এবং তাঁর কাছাকাছি সময়ের প্রান্তিক অর্থনীতিবিদরা। তাঁকে প্রান্তিক অর্থনীতিবিদসহ তাই আখ্যায়িত করা হয় নয়া ক্লাসিকাল (Neo-classical school) ধারা হিসেবে। আলফ্রেড মার্শালের মাধ্যমেই বিশেষভাবে ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্রের (Micro Economics) সূচনা হয়। বর্তমানে এই নয়া ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রই মূলধারা হিসেবে বিবেচিত হয়।

ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের ধারাবাহিকতায় শুরু করেও অর্থশাস্ত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধারার সূচনা করেন কার্ল মার্কস (Karl Marx, 1818-1883)। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে, গ্রন্থের নাম *Das Kapital*। অন্য ধারার অর্থনীতিবিদরা যেখানে পুঁজিবাদকে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করেন সেখানে মার্কস একে দেখেছেন আগের ব্যবস্থাগুলোর মতোই পরিবর্তনশীল একটি ব্যবস্থা হিসেবে। পুঁজিবাদের গভীর গতিশীল বিশ্লেষণই মার্কসের অর্থনীতি বিষয়ক কাজের মূল দিক হলেও তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ-উত্তর উন্নততর মানবিক সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণী ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

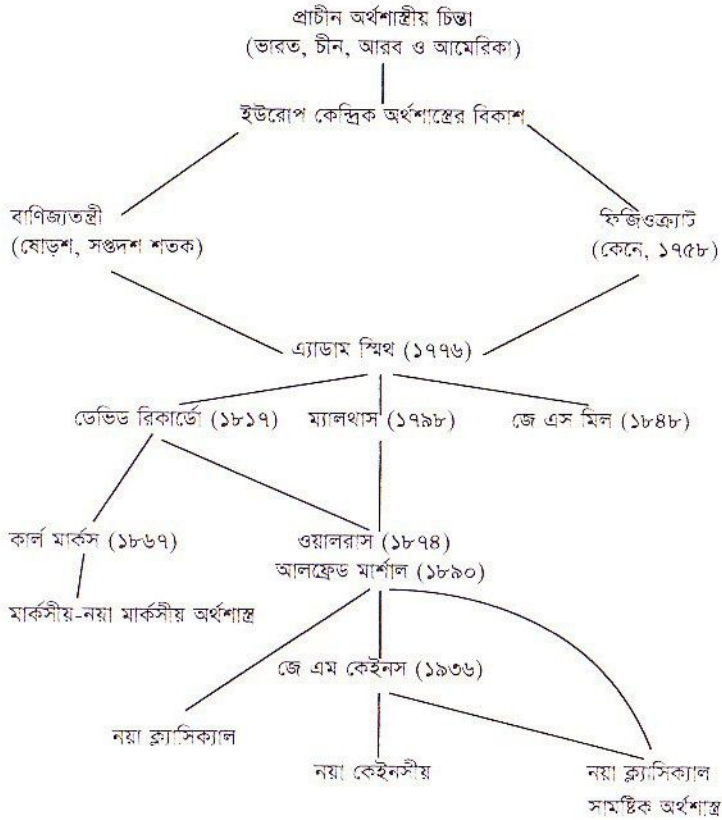
বিশ শতকে অর্থনীতির ক্লাসিকাল ও নয়া ক্লাসিকাল বিশ্লেষণ কাঠামো বড় ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয় ২০ দশকের শেষে। সে সময় ইউরোপ ও মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সকল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মহামন্দা দেখা যায়। মহামন্দা ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকলে ক্লাসিকাল ও নয়া ক্লাসিকাল ধারার বিশ্লেষণের ভিত্তি-বাজারের স্বয়ংক্রিয়তা, অদৃশ্য হস্ত এবং অবাধ অর্থনীতির যাবতীয় ধারণা এই সমস্যার সমাধানে অপার্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, শুধু বাজার নিজে নিজে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট দূর করতে পারে না, সেখানে আরও কিছু বহিঃস্থ উদ্যোগের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেইনসের (John Maynard Keynes, 1883-1946) তত্ত্ব তখন এই বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দেয় এবং অর্থশাস্ত্রে নতুন একটি ধারার সূচনা করে। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, *The General Theory of Employment, Interest and Money*।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে অর্থশাস্ত্রের আরও অনেক বিকাশ হয়। অর্থশাস্ত্রের মধ্যে বহু শাখা প্রশাখার উদ্ভব হয়। তবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, এর সবগুলোই আগে বর্ণিত কোনো না কোনো ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রধান ধারাগুলোর কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সারসংক্ষেপে নিচে দেয়া হলো। এখানে আমরা যদি অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের বিষয়াবলীকে ১. সম্পদের উৎস, ২. বিশ্লেষণের এলাকা, ৩. আয় বিতরণ এবং ৪. অর্থনীতির গতি এই চারটি ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রধান চারটি ধারার পার্থক্যগুলো বোঝা আমাদের জন্য সহজ হবে।

ছক. ১: অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন ধারার কেন্দ্রীয় বক্তব্য-সারসংক্ষেপ

	ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্র	মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র	নিও ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্র	কেইনসীয়
সম্পদের উৎস	শ্রম	জীবিত ও মৃত শ্রম	উপযোগ	চাহিদা ও যোগান
বিশ্লেষণের এলাকা	জাতীয়	সামগ্রিক	একক	সামগ্রিক
আয় বিতরণ	সমাজের তিনটি শ্রেণী-ভূস্বামী, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে খাজনা, মুনাফা এবং মজুরি হিসেবে	মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে, শ্রেণী ভরসাম্মান্য অনুযায়ী	প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান অনুযায়ী	কর্মসংস্থান অনুযায়ী
অর্থনীতির গতিমুখ	একটি পর্যায়ের পর স্থবিরতা	পুঁজিবাদের ভেতরেই উন্নততর ব্যবস্থার শর্ত তৈরি, যার বাস্তবায়ন মানুষের সামগ্রিক উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল	একটানা সুসমন্বিত বিকাশ	দীর্ঘমেয়াদী সবাই মৃত



চিত্র: ১.১ অর্থশাস্ত্রের প্রধান ধারাসমূহ

সারসংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো আসে তাতে অন্যান্য জ্ঞান শাখার পাশাপাশি অর্থশাস্ত্র চর্চা ধর্ম ও রাজদরবারের বাইরে চলে আসে। সেই সময়কাল থেকে অর্থশাস্ত্রের যে বিকাশ হয় আমরা তার প্রধান চারটি ধারার সন্ধান পাই। সেগুলো হলো: ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্র, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র, নিওক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্র ও কেইনসীয় অর্থশাস্ত্র।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের জন্য এবং নিজের বিকাশের জন্য অনেক রকম তৎপরতায় শামিল হয়। এসবের মধ্যে গিয়ে মানুষ সম্পর্কিত হয় আরও অনেক মানুষের সঙ্গে। এভাবে কখনো একা, কখনো আরও অনেকের সঙ্গে মানুষ যেসব কাজ করে তার মধ্যে উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ, বিনিময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজগুলোকে একসঙ্গে অর্থনৈতিক কাজ বলে। এই কাজগুলো সকল মানুষ সকল সময়ে একই রকম করতে পারে না। কী উৎপাদন হবে, কীভাবে উৎপাদন হবে, কার জন্য উৎপাদন হবে এসব বিষয় সকল সময়ে একই থাকে না। পার্থক্যটা তাহলে কীভাবে তৈরি হয়? পার্থক্যটা তৈরি হয় প্রধানত মালিকানা ব্যবস্থার জন্য; এর সঙ্গে সামাজিক নানা নিয়ম-কানুন, বিধিমালা ইত্যাদিও কার্যকর হয়। এই যে মালিকানা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কাজ করে, তাকে এক কথায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা যায়।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

আমরা বর্তমানে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছি তাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'বাজার অর্থনীতি'। তবে এর আরেকটি নাম আছে, সেটি হলো: পুঁজিবাদ। কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বয়স কাঁটায় কাঁটায় বলা যায় না। কারণ কোনো ব্যবস্থার হঠাৎ করে উদ্ভব হয় না, তা একটি লম্বা সময় ধরে গড়ে উঠতে থাকে। তারপরও মোটামুটি হিসাব করলে বলা যায় যে, বর্তমান এই ব্যবস্থার বয়স বড়জোর তিনশ' বছর। এর আগে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ বছর মানুষের অন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেটেছে। সেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। সবদেশে সেগুলোর একই রকম চেহারাও ছিল না।

আমরা ইতিহাসে এরকম ব্যবস্থা দীর্ঘকাল দেখেছি যেখানে মানুষেরা অধিকাংশ ছিলেন দাস, তাদের কেনাবেচা করা যেতো। দাসমালিকরাই সেখানে ক্ষমতাবান ছিলেন এবং সকল অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানাও ছিল তাদেরই হাতে। যুদ্ধে পরাজিত হলে দাস হতে হতো। প্রাচীন গ্রীসে যে সময় বিখ্যাত নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সে সময়ও সেখানে দাস ব্যবস্থা ছিল। আরব দেশে ইসলাম প্রবর্তনের সময়ও আমরা দাস ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাই। আমাদের উপমহাদেশে অবশ্য ঠিক এরকম দাস ব্যবস্থা ছিল না, তবে এখানে খুব শক্তিশালীভাবে যে ব্যবস্থাটি দীর্ঘকাল ধরে ছিল এবং

এখনও অনেকক্ষেত্রে আছে সেটি হলো বর্ণপ্রথা। এই প্রথায জনগতভাবে একজনের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। তার মেধা বা যোগ্যতা এখানে গৌণ।

দাস ব্যবস্থার পর আমরা যে ব্যবস্থা দেখি সেটিকে সাধারণভাবে সামন্তবাদ বলে। এই ব্যবস্থায় ভূস্বামী অর্থাৎ ভূসম্পদের বড় বড় মালিকরাই সমাজে সবচেঁহিতে ক্ষমতাবান। অন্যদিকে বেশিরভাগ মানুষ জমিতে কাজ করেন খাজনার বিনিময়ে, প্রজা হিসেবে বা ভূমিদাস হিসেবে। এই ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে জমিদারী ব্যবস্থাও বলা যায়। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থার রূপ আবার পুরো ইউরোপের মতো ছিল না। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, পুরনো ভারতবর্ষে ব্যক্তিমালিকানাও ইউরোপের মতো ছিল না। এখানে রাজা-বাদশা বা সম্রাটদের হাতে ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত। তাদেরকেই সকল ভূমির মালিক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অনেকে এই সমাজকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজও বলেন। বিভিন্ন ভূস্বামী রাজার প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করতেন।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রক্রিয়া শুরু হয় সপ্তদশ শতক থেকে। এই শিল্প বিপ্লবের প্রক্রিয়াতেই ক্রমে উনিশ শতকের মধ্যে ইউরোপে পুঁজিবাদ একটি ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থাকেই অনেক সময় 'বাজার অর্থনীতি' বলা হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যেই বিশ্বের প্রায় সকল অঞ্চলের মানুষ তখন বসবাস করতেন। আমরা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করবো কিংবা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবো সেটি এই ব্যবস্থা। সেজন্য এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে। সংক্ষেপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. উৎপাদন যন্ত্র ও পুঁজির ওপর ব্যক্তি মালিকানা।
২. ব্যক্তিস্বার্থকে মূল গুরুত্ব প্রদান।
৩. মানুষের শ্রমশক্তিসহ সবকিছুর কেনাবেচার দ্রব্য বা পণ্য হিসেবে আবির্ভাব।
৪. বাজারকে লক্ষ করে, মুনাফার সর্বোচ্চকরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি মানুষের ইতিহাসে অনেকরকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে। এসব ব্যবস্থার অনেকগুলোই এখন অতীত, কিন্তু বর্তমানে আমরা যেসব ব্যবস্থা দেখছি সেগুলো অতীতের বিভিন্ন ব্যবস্থা পার হয়েই এসেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু রেশও আছে।

স্যামুয়েলসন বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কী, কেন এবং কার জন্য উৎপাদন হয় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন যা বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তিনি এই আলোচনা করতে গিয়ে অতীতের ব্যবস্থাগুলো বিবেচনা করেননি। বর্তমান সময়ে বিরাজমান ব্যবস্থাগুলোকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন:

১. বাজার অর্থনীতি
২. নির্দেশমূলক অর্থনীতি এবং
৩. মিশ্র অর্থনীতি।

তঁার ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বাজার অর্থনীতি মানে হলো অবাধ অর্থনীতি যেখানে বাজার

দ্বারাই সবকিছু নির্ধারিত হয়, সরকারের কোনো ভূমিকা থাকে না। আর তাঁর ব্যাখ্যায় মিশ্র অর্থনীতি হলো সেই অর্থনীতি যেখানে বাজার অর্থনীতি থাকবে, কিন্তু সরকারের ভূমিকাও থাকবে। আসলে প্রথম ধরনের অর্থনীতির কোনো অস্তিত্ব বিশ্বে নেই। যাকে স্যামুয়েলসন মিশ্র অর্থনীতি বলেছেন সেটাই বর্তমান বিশ্বে 'বাজার অর্থনীতি'র বাস্তব চেহারা।

স্যামুয়েলসন নির্দেশমূলক অর্থনীতি বলতে বুঝিয়েছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে ভিন্নভাবে কিংবা তাদের কর্তৃত্বের বাইরে যেসব অর্থনীতি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, সেগুলোকে। এগুলোকে অনেকসময় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বলা হয়। এগুলোকে নির্দেশমূলক না বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি বলাই ঠিক। কারণ এসব অর্থনীতি ব্যক্তির বা সরকারের নির্দেশে নয়, বরং একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্দেশমূলক অর্থনীতি সেগুলোকে বলা যায় যেগুলোতে রাষ্ট্রপ্রধান বা কতিপয়ের নির্দেশেই সবকিছু পরিচালিত হয়। সামরিক শাসন বা বেসামরিক স্বৈরশাসন বা রাজতন্ত্রশাসিত ব্যবস্থাতেই এরকম অর্থনীতি দেখা যায়। স্যামুয়েলসন এই ধরনের অর্থনীতি সম্পর্কে কিছু বলেননি। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই অর্থনীতিগুলোও (মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্র শাসিত বা ল্যাটিন আমেরিকা-আফ্রিকা-এশিয়ার স্বৈরশাসন নিয়ন্ত্রিত) বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বা কথিত বাজার অর্থনীতির সঙ্গেই সম্পর্কিত।

নিচের ছকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কী, কেন এবং কার জন্য উৎপাদন হতো এবং হয় তার একটি সার সংক্ষেপ উপস্থিত করা হয়েছে। এখানে সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পার হয়ে এসেছেন, সেগুলোর প্রধান কয়েকটি ধরনে কেন্দ্রীয় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। এখানে আদি যৌথ ব্যবস্থা বলতে বোঝানো হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভবের পূর্বে মানুষের দীর্ঘ সময়কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মানুষ সবাই মিলেমিশেই সবার প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু করতো। প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলতে পুঁজিবাদের উদ্ভবের আগে বিদ্যমান একাধিক ব্যবস্থাকে একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে: দাস ব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা। এগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো: ব্যক্তি মালিকানা সবগুলো সমাজেই কেন্দ্রীভূত আকারে থাকলেও এর কোনোটিই পুঁজিবাদ নয়।

ছক: ২. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কী, কেন এবং কার জন্য উৎপাদন

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	কী উৎপাদন	কীভাবে উৎপাদন	কার জন্য উৎপাদন
আদি যৌথ ব্যবস্থা	যৌথ প্রয়োজনের দ্রব্যাদি	প্রাপ্ত প্রযুক্তি	সবার জন্য
প্রাক-পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থা	ভোগ ও বাজারের জন্য	প্রাপ্ত প্রযুক্তি	নিজেদের ভোগ ও বাজারদারদের জন্য
পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতি	বিক্রিযোগ্য পণ্য	ন্যূনতম ব্যয় ও উচ্চ উৎপাদনের প্রযুক্তি	ক্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
পুঁজিবাদ-উত্তর সামাজিক মালিকানার ব্যবস্থা	সামাজিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদি	ন্যূনতম ব্যয় ও উচ্চ উৎপাদনের প্রযুক্তি	সবার জন্য

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলতে যা বোঝানো হচ্ছে সেটিই বিভিন্ন অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থে বাজার অর্থনীতি বলে আমরা দেখতে পাই। পুঁজিবাদ-উত্তর ব্যবস্থা হিসেবে যা' বলা হয়েছে তা কোথাও কোথাও সমাজতন্ত্র, কোথাও সাম্যবাদ নামে অভিহিত হয়। অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন হাজার বা শতশত বছর পার হয়েছে সেটা এই ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এখনও ঘটেনি। এর কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা দেখেছি। যার মধ্যে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই আছে এবং অনেকগুলো সাবেক সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র আবার পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করছে।

সারসংক্ষেপ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও বিতরণকে কেন্দ্র করে মালিকানা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকেই বোঝায়। এর মধ্যেই মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে স্যামুয়েলসন তিন ভাগে ভাগ করেছেন— ক. বাজার অর্থনীতি; খ. নির্দেশমূলক অর্থনীতি; ও গ. মিশ্র অর্থনীতি। এই ভাষ্য অনুযায়ী বাজার অর্থনীতি হলো অবাধ অর্থনীতি যেখানে বাজার সবকিছু নির্ধারণ করে, সরকারের কোনো ভূমিকা থাকে না। মিশ্র অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতি থাকবে কিন্তু সরকারের ভূমিকাও থাকবে। আর নির্দেশমূলক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রপ্রধান বা কতিপয়ের নির্দেশই সবকিছু পরিচালিত হয়। এর বাইরে আরেকটি ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেটি হলো রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি।

৩

অর্থশাস্ত্রের বস্তুবাচক ও নীতিবাচক বিভাজন

অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক রকম মতপার্থক্য আমরা দেখেছি। এর মধ্যে যে দিকটি বিশেষভাবে গুরুতর সেটি হলো অর্থশাস্ত্রে মতাদর্শ (ideology), মূল্যবোধ (value) বা নীতিনৈতিকতার (ethics) প্রশ্ন। অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁদের কোনোরকম মতাদর্শ বা মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হওয়া ঠিক নয়। তাঁরা মনে করেন যে, অর্থনীতিবিদদের কাজ হলো শুধুমাত্র বাস্তবতা ঠিক যেভাবে আছে তাকে ঠিক সেভাবে দেখা এবং তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা। যেমন, বেসরকারিকরণ করা হলে উৎপাদন বাড়বে কি না, ন্যূনতম মজুরি চালু করলে তা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে কি না, ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বাড়াবে কি না ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, এই কার্যকারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তথ্য সংগ্রহ করে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেরই উপর। এই অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এসব সম্পর্কে নীতিগত সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ কী হওয়া উচিত কিংবা আরও বৃহৎ পরিসরে অর্থনীতি কেমন হওয়া উচিত, সমাজের কার কী পাওয়া উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রদান অর্থনীতিবিদদের কাজ নয়, এই কাজ রাজনীতিবিদ বা মাজতান্ত্রিকদের। তাঁদের দৃষ্টিতে অর্থশাস্ত্র হলো মতাদর্শমুক্ত বিজ্ঞান (Value free science)। তাঁরা যে ধরনের অর্থশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণ করেন তাকে বলা হয় বস্তুবাচক অর্থশাস্ত্র বা Positive Economics। এর বিপরীতে অন্য অর্থনীতিবিদরা আছেন যারা মনে করেন শুধুমাত্র বাস্তবতা বিশ্লেষণ নয়, অর্থনীতিবিদদের একই সঙ্গে কাজ হল অর্থনীতি কোন দিকে যাবে, অর্থনীতিতে কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত দেওয়া। যেমন বেসরকারিকরণ করা উচিত কি অনুচিত কিংবা ন্যূনতম মজুরি চালু করা উচিত কি অনুচিত, অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কী রকম হওয়া দরকার, বিতরণ কেমন হওয়া দরকার ইত্যাদি বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান থাকা দরকার। এরা মনে করেন অর্থশাস্ত্রে মতামত, মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই হবে। কারণ যেহেতু অর্থশাস্ত্র মানুষ ও সমাজ নিয়েই কাজ করেন, সে কারণেই অর্থনীতিবিদদের মত-নিরপেক্ষ হতে পারেন না। এঁদের প্রস্তাবিত অর্থশাস্ত্রকে বলা হয় Normative Economics বা নীতিবাচক অর্থশাস্ত্র।

অর্থশাস্ত্রে নীতি নৈতিকতা বা মতাদর্শের জায়গা নিয়ে প্রশ্নসমূহ

কিন্তু অর্থশাস্ত্রকে এরকম দুটো ভাগে ভাগ করার মধ্য দিয়েই এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক

শেষ হয় না। অর্থশাস্ত্রে মতাদর্শ বা নীতিনৈতিকতার প্রশ্ন আরও কিছু বিষয়কেও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে। শুধু দু'ভাগে অর্থশাস্ত্রকে ভাগ করবার বিরুদ্ধেও যুক্তি কম নেই। এই বিষয়গুলোকে উপস্থিত করা যায় নিম্নরূপে:

প্রথমত অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা। এটি মৌলিক বিজ্ঞান নয় যেগুলোতে গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয় শুধু গবেষণাগারে।

দ্বিতীয়ত অর্থশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধরন ভিন্ন, যেখানে জীবন্ত মানুষই গবেষণার মূল বিষয়। শুধু এই মানুষ নয়, গবেষণায় বা বিশ্লেষণে আরও আসে এই মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পদ, সামর্থ্য ও সমাজ ইত্যাদি।

তৃতীয়ত অর্থশাস্ত্রের মানুষ, বিশেষত আমরা যে ধরনের অর্থনীতিতে বসবাস করি সেখানে আয়, সুযোগ, ক্ষমতা ইত্যাদি দিক দিয়ে বহুভাগে বিভক্ত। শ্রেণীগত পার্থক্য ছাড়াও লিঙ্গীয় (নারী-পুরুষ), বর্ণগত, জাতিগত বৈষম্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিরাজ করছে। শুধু একটি দেশের মধ্যে নয়, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও বিপুল বৈষম্য ও পার্থক্য আছে। সুতরাং কোনো একটি একক দিয়ে সবাইকে বোঝানো যায় না।

চতুর্থত বিচ্ছিন্ন ধরনের পার্থক্য ও বৈষম্য থাকার ফলে কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত ফলাফল বা সিদ্ধান্ত সার্বজনীন হতে পারে না। বস্তুবাচক অর্থনীতির যারা অনুসারী তাদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ বা গবেষণায় অনুমিতি গ্রহণ, বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বিশ্লেষণের এলাকা নির্ধারণ ইত্যাদিতে তাই অসম্পূর্ণতা বা পক্ষপাত থাকার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। নীতিবাচক অর্থশাস্ত্রের অনুসারীদের ক্ষেত্রে সমূহ সম্ভাবনা থাকে পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হবার যাতে অর্থনীতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও পক্ষপাতের বিপদ থাকতে পারে।

পঞ্চমত সমাজবিজ্ঞান বলেই এখানে মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকে। তবে অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ থাকা এবং কোনো ধরনের পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অবশ্যই যথাযথভাবে সমন্বিত তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এই বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলে অর্থশাস্ত্রকে বস্তুবাচক ও নীতিবাচক এভাবে ভাগ না করে বরঞ্চ ভাগ করা যায় এভাবে: বস্তুনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র (Objective Economics) এবং পক্ষপাতদুষ্ট অর্থশাস্ত্র (Biased Economics)।

ব্যাপ্তিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

অর্থনীতির বিশ্লেষণের এলাকা অনুযায়ী অর্থশাস্ত্রকে আবার দু'ভাবে ভাগ করা যায়। দীর্ঘ সময় জুড়ে অর্থশাস্ত্র একক ক্ষেত্র হিসেবেই ছিল। ৩০ দশকের মহামন্দার পর থেকেই অর্থনীতিকে প্রধানতঃ ব্যাপ্তিক ও সামষ্টিক দুইভাগে ভাগ করে দেখার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। ১৯৩৩ সালে নরওয়েজীয় অর্থনীতিবিদ রেগনার ফ্রিচ (Ragnar Frisch), যিনি জন টিনবার্জেন (Jan Tinbergen)-এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান, তিনিই প্রথম অর্থশাস্ত্রের বিভাজন বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেন “micro-dynamics” এবং “macro-dynamics”। সেটিই পরে

“microeconomics” বা ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র এবং “macroeconomics” বা সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র হিসেবে পরিচিতি পায়। এর মধ্যে ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র বলতে আমরা সেটিকেই বুঝি যেটি সমগ্র অর্থনীতিকে বিবেচনা না করে একক ভিত্তিক বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেয়। একক ভিত্তিক বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় একক ভোক্তার আচরণ, চাহিদা, আয় ইত্যাদি কিংবা একক উৎপাদন বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, ব্যয় মুনাফা ধরে বিশ্লেষণ। এই অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের বিকাশ ঘটে প্রথমে প্রান্তিকতাবাদী নামে পরিচিত Karl Menger, Jevons ও Walras প্রমুখদের মাধ্যমে এবং পরে আরও কার্যকর ও সুসংগঠিতভাবে Alfred Marshall-এর কাজে।

এরপর অর্থশাস্ত্রের যে ধারাটি বিশেষভাবে ৩০ দশক পরবর্তী বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের কাজের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বর্তমান রূপ পেয়েছে সেটি হলো সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র বা Macro Economics। এতে অর্থনীতির বিশ্লেষণ করা হয় সামষ্টিক কাঠামোতে, নির্দিষ্টভাবে জাতীয় পরিসরেই সবকিছু বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে এই অর্থশাস্ত্রে সেসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় যেগুলো সামষ্টিক কাঠামো ছাড়া বিশ্লেষণ করা যায় না; যেমন- জাতীয় আয়, বেকারত্ব, দামস্তর, মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, বাণিজ্য চক্র ইত্যাদি।

হ্যাভারসন এবং কোয়ান্ট (James M. Henderson and Richard E. Quandt) এই পার্থক্যকে সংক্ষেপে বলেন এভাবে: “Microeconomics is the study of the economic actions of individuals and well defined groups of individuals and macroeconomics is the study of broad aggregates such as total employment and national income.”

অর্থাৎ ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র হলো, ব্যক্তি বা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিসমূহের দলবদ্ধ অর্থনৈতিক আচরণের শাস্ত্র এবং সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র হলো মোট কর্মসংস্থান এবং জাতীয় আয়-এর মতো সামগ্রিক বিষয়ের শাস্ত্র।

সারসংক্ষেপ

অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্যের বিশেষভাবে গুরুতর দিকটি হলো মতাদর্শ, মূল্যবোধ বা নীতিনৈতিকতার প্রশ্ন। বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য ও বৈষম্য থাকার ফলে কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত ফলাফল বা সিদ্ধান্ত সাবজর্নীন হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞান বলেই এখানে মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকে। তবে অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ থাকা এবং কোনো ধরনের পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অবশ্যই তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ত্রিশ দশকের মধ্যেই অর্থশাস্ত্র ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

বাজার ও বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

বাজার বলতে সাধারণত আমরা একটি স্থান বুঝি যেখানে কিছু না কিছু কেনাবেচা হয়। যেমন- মালিবাগ বাজার, কারওয়ান বাজার। আবার কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য কেনাবেচার অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক সময় বাজার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন: পাটের বাজার খারাপ কিংবা বাড়ির বাজার ভালো ইত্যাদি। বাজার বলতে তাহলে একটি বিষয় বোঝায় তা হলো: কেনাবেচা। আর অর্থশাস্ত্রে বাজার বলতে কেনাবেচার জায়গার চাইতেও কেনাবেচার প্রক্রিয়াটির উপরই গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি।

স্যামুয়েলসন তাই বলছেন, “A market is a mechanism by which buyers and sellers interact to determine the price and quality of a good or service”^৩ অর্থাৎ বাজার বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো দ্রব্য বা সেবার পরিমাণ ও দাম নির্ধারিত হয়।

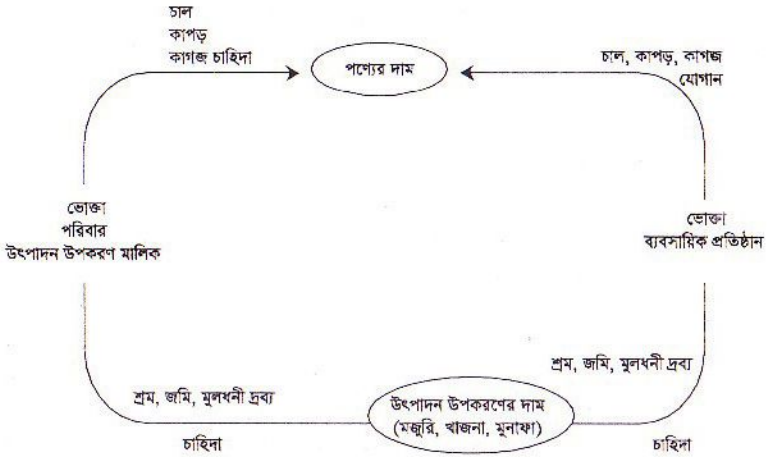
বাজার যদি আদর্শ মডেল অনুযায়ী বিরাজ করে তাহলে তার কাজ হিসেবে সাধারণত পাঁচটি বিষয়কে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়। এগুলো হলো:

১. বাজার কোনো পণ্যের দাম নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে তার গুরুত্ব নির্ধারণ করে।
২. বাজার উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।
৩. বাজার উৎপাদিত দ্রব্য বিতরণকে পরিচালনা করে।
৪. বাজার বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।
৫. বাজার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতা নির্ধারণ করে।

বাজার অর্থনীতি সাধারণত এমন অর্থনীতিকে নির্দেশ করা হয় যেখানে এই প্রক্রিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এই অর্থনীতি সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, এখানে দাম একটি সংকেত হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ দাম উঠানামার উপর ভোক্তা যেমন সে দ্রব্য আর কিনবেন কি কিনবেন না সে সিদ্ধান্ত নেন, তেমনি উৎপাদকও উৎপাদন আর অব্যাহত রাখবেন না অন্য কোনো কিছু উৎপাদনে চলে যাবেন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এ সম্পর্কে আরও বলা হয়, বাজার অর্থনীতিতে দাম তথ্য যোগান দেয়, দাম দিকনির্দেশনা দান করে।

৩. Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics*, 16th edition, 26

বাজার অর্থনীতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মানের প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকে যে কাঠামো নির্দেশ করা হয় তার মূল কথা হলো, স্যামুয়েলসনের ভাষায়, “In a market economy, no single individual or organization is responsible for production, consumption, distribution and pricing.”^৮ অর্থাৎ “বাজার



অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ এবং দাম নির্ধারণে কোনো একক ব্যক্তি বা সংগঠনের দায়-দায়িত্ব নেই।” স্যামুয়েলসন এরকম বাজার অর্থনীতিকেই বলছেন, ‘প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ’ (competitive capitalism)। এই কাঠামোর বাজার কীভাবে ভোজ্য ও উৎপাদক এবং বিভিন্ন বাজারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে তা সহজে বোঝানোর জন্য নিচের সম্মিলিত প্রবাহের ছক দেয়া হলো। উপরের ছকে বাজার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেভাবে পণ্য ও উৎপাদন উপকরণের চাহিদা ও যোগান নির্ধারিত হচ্ছে সেটাই দেখানো হয়েছে।

বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা

কিন্তু আমরা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন অবস্থাই প্রত্যক্ষ করি। কেননা সমস্যা দেখা দেয় তখনই অর্থাৎ বাজার অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই, যখন পুঁজিবাদের উল্লেখিত প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। বাজার অর্থনীতি ঠিকমতো কাজ করতে গেলে বা পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র যথাযথভাবে বজায় রাখতে গেলে সেখানে প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে সম্পদ, পুঁজিসহ সকল ক্ষেত্রে সকল ভোজ্য ও উৎপাদকের সমান প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। বর্তমান বিশ্বে বাস্তবত

এরকম অর্থনীতি খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বাজার অর্থনীতির সবগুলো শর্ত ঠিকভাবে কাজ করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়া যখন কাজ করতে পারে না তখন বাজার সম্পর্কিত প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্তই সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এরকম একটি পরিস্থিতিকে বলা হয় বাজারের ব্যর্থতা (Market Failure)। এই ব্যর্থতা সৃষ্টি হবার পেছনে বেশকিছু কারণ কাজ করে কিংবা আরেকভাবে বলা যায় যে, বেশকিছু ঘটনা বা প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে, বাজার প্রক্রিয়া কাজ করছে না। এগুলো কী?

এগুলোর মধ্যে আছে:

১. যদি অর্থনীতিতে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়।

একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের হতে পারে, এ সম্পর্কে আমরা পরে আরও আলোচনা করবো। এখন আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান হলো এমন প্রতিষ্ঠান যা অন্যদের তুলনায় আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি সম্পদ, বাজারের উপর কর্তৃত্ব, উৎপাদনের পরিসীমা নিয়ে কাজ করে। এরকম প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটলে সেখানে অন্যদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় না। ফলে দিনে দিনে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার সীমা আরও বেশি বিস্তৃত হয় এবং তাতে প্রতিযোগিতার সুযোগ আরও সংকুচিত হয়। এই অবস্থা বিশ্বের সব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেই দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, স্যামুয়েলসনের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থাকলেও সম্পদ ও বিক্রি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা, ব্যাপ্তি ইত্যাদিতে মাত্র কয়েকশ' বৃহৎ কর্পোরেশন পুরো মার্কিন অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরও বলেছেন, আইবিএম, জেনারেল মটরস্ কিংবা এক্সন-এর মতো বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলোতে লক্ষ লক্ষ শেয়ারহোল্ডার আছেন, কাগজপত্রে মালিক হলেও যাদের সংস্থার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সংস্থা পরিচালনা করেন ম্যানেজারেরা।^৭

২. যদি এমন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় যাতে বিনিয়োগ খুব লাভজনক কিন্তু যার সামাজিক ব্যয় অত্যন্ত বেশি।

সামাজিক ব্যয় মানে এমন সব স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি বা ব্যয় যা পুরো সমাজকেই বহন করতে হয়। এর মধ্যে আছে সে সব কারখানা বা বিনিয়োগ যেগুলো পরিবেশ (বায়ু, পানি, মাটি ইত্যাদি) দূষণ করে, সে সব বিনিয়োগ যেগুলো সমরাস্ত্র, মাদকদ্রব্য কিংবা অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যেহেতু লাভজনক সেহেতু বাজার তাকে উৎসাহিত করে, এর সামাজিক ব্যয় বা বহিঃস্থ প্রতিকূল প্রভাব (negative externality) বাজারের নিয়মে ধর্তব্য নয়। কিন্তু এসব বিনিয়োগ শুধু যে সামাজিক দীর্ঘমেয়াদী ও

স্বল্পমেয়াদী ক্ষতির কারণ হয় তাই নয়, এসব বিনিয়োগ অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ থেকে সম্পদ প্রত্যাহার করে। বিশ্বে সমরাস্ত্র উৎপাদনে যে দেশ শীর্ষস্থানে আছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই এক প্রেসিডেন্ট একবার বলেছিলেন, 'প্রতিটি বন্দুক, প্রতিটি যুদ্ধজাহাজ, প্রতিটি রকেট, প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছ থেকে চুরি করে তৈরি যারা ক্ষুধার্ত, যাদের খাবার নেই।'^৬

৩. যদি সামষ্টিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়।

এটা হতে পারে লেনদেন-ভারসাম্যজনিত সমস্যা থেকে, হতে পারে মন্দা বা সমৃদ্ধির বাণিজ্য চক্র থেকে, হতে পারে মুদ্রাস্ফীতি বা বেকারত্বের অবস্থা থেকে। অভিজ্ঞতায় সর্বত্রই দেখা গেছে যে, বাজার নিজে নিজে এসব সমস্যার সমাধান করতে পারে না বা এসব সমস্যা সৃষ্টির পথও বন্ধ করতে পারে না।

বলে নেয়া দরকার যে, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির এসব অবস্থানকে বাজারের ব্যর্থতা বলে অভিহিত করে না। এই ধারার মতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ক্রমান্বয়ে একচেটিয়ার উদ্ভব, বিপুল সামাজিক ক্ষতি, ধ্বংসাত্মক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বেকারত্ব, বাণিজ্য চক্র ইত্যাদি অনিবার্যভাবেই ঘটে। এগুলো পুঁজিবাদের অন্তর্গত বেশিষ্ট্য।

সারসংক্ষেপ

বাজার বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো দ্রব্য বা সেবার পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ হয়। আর বাজার অর্থনীতি বলতে সাধারণত এমন অর্থনীতিকে নির্দেশ করা হয় যেখানে উৎপাদন, ভোগ, বিতরণ এবং দাম নির্ধারণে কোনো একক ব্যক্তি বা সংগঠনের দায়-দায়িত্ব থাকে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়া যখন কাজ করতে পারে না তখন বাজার সম্পর্কিত প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্তই সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে, যা বাজারের ব্যর্থতা (Market failure) নামে পরিচিত।

৬. "Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from who are hungry and are not fed" President Dwight D. Eisenhower, উদ্ধৃতি Ibid, 9.

বাজার অক্ষমতা ও সরকার

এমন কিছু বিষয়ের দিকে অনেক অর্থনীতিবিদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেগুলো বাজার প্রক্রিয়ায় সমাধান করা সম্ভব হয় না। তাঁদের ভাষায় এটা হলো বাজারের সীমাবদ্ধতা (Limits of market)। এর মধ্যে সবচেঁহিতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো: সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবিধ বৈষম্য। এছাড়া জনগণের শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ও আছে। এক্ষেত্রে ‘বাজার অর্থনীতির’ নেতৃস্থানীয় একজন অর্থনীতিবিদ কিভাবে বিষয়টি দেখেন সেটা এখানে উল্লেখ করি। স্যামুয়েলসনও বলেছেন, ‘প্রকৃতপক্ষে বাজারে কি এরকম কোনো অদৃশ্য হস্ত আছে যেটি যার পাবার কথা তার তা পাওয়া নিশ্চিত করে? অথবা যিনি দীর্ঘ সময় কাজ করেন তিনি কি একটি শোভন জীবনমান পাবেন এখানে? না।... অবাধ অর্থনীতিতে নিখুঁত প্রতিযোগিতা পরিণতি হতে ব্যাপক বৈষম্য, অপুষ্টি শিশু যারা বেড়ে উঠবে আরও অপুষ্টি শিশুর জন্য দিতে, আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আয় ও সম্পদের বৈষম্যের স্থায়ীকরণ।’^৯

বাজার অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজারের ভূমিকাই যে প্রধান তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু এরকম একটি অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা কী হবে, সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কতটা হবে সেটা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। এরকম অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে যেসব মতামত আছে সেগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো:

- * অর্থনীতিতে সরকারের কোনো ভূমিকা থাকা ঠিক নয়।
- * অর্থনীতিতে সরকারের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা থাকা উচিত।
- * অর্থনীতিতে সরকারের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব, যেমন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা

৭. Is there an invisible hand in the market place that ensures that the most deserving people will obtain their just rewards? Or that those who toil long hours will receive a decent standard of living? No... Under laissez-faire, perfect competition could lead to massive inequality, to malnourished children who grow up to produce more malnourished children, and to the perpetuation of inequality of incomes and wealth for generation after generation. পূর্বোক্ত, 15th edition, 272.

অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিত।

নিচে এই ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. অর্থনীতিতে সরকারের কোনো ভূমিকাই থাকা ঠিক নয়।
এই মতের অনুসারীরা মনে করেন, সরকারের ভূমিকা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে, অপচয় সৃষ্টি করে, উদ্যোক্তাদের কাজে নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং অর্থনীতিতে সরকারের কোনো রকম ভূমিকাই থাকা ঠিক নয়। এই মতের অনুসারীদের মতে বাজার যদি সব রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে তাহলে তা যে কোনো সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান করতে সক্ষম। এই মতের অনুসারীদের বর্তমান নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ হচ্ছেন মিল্টন ফ্রিডম্যান (Milton Friedman)।
২. অর্থনীতিতে সরকারের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা থাকা উচিত।
এই মতের অনুসারীরা মনে করেন কোনো দেশেই কোনো ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়নই তার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচির পক্ষে সক্রিয় সরকারের উদ্যোগী ভূমিকা ছাড়া সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করেন, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এই ধারার অর্থনীতিবিদরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাঁদের মতে সরকারের ভূমিকা উন্নয়নের অনুকূল না হলে বেসরকারি খাতও সেখানে উন্নয়ন করতে পারে না। ৩০ দশকের মহামন্দায় বাজারের অক্ষম অবস্থা এবং সরকারের অপরিহার্য ভূমিকা এখানে একটি শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে উপস্থিত করা হয়। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত ৭০ ও ৮০ দশকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে, যেগুলোকে কখনও 'অলৌকিক' সাফল্যের দৃষ্টান্ত, কখনও নয়া শিল্পায়িত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, বহু বছর ধরে সেখানে এই সাফল্যে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।^৮ যেসব দেশে উদ্যোক্তা সেভাবে বিকশিত হয়নি, বেসরকারি খাত অসংগঠিত সেসব দেশে বাজারের বিকাশ বা পুঁজিবাদী উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা যে অধিকতার গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা আরও বুঝতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে 'উন্নয়ন অর্থশাস্ত্র' নামে অর্থশাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখার দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করলে।
৩. অর্থনীতিতে সরকারের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব, যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিত।
এই ধারাটিই এখন বেশি শক্তিশালী। প্রথম ধারাটি ৮০ দশক থেকে মধ্য ৯০

৮. Martin Hart-Landsberg: *The Rush to Development*, MR, NY, 1993 এবং Robert Wade: *Governing the Market: Economic Theory and the role of Government in East Asian Industrialization*, Princeton, NJ, 1990.

দশক পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অধিকতর প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক নানা সংকটের উদ্ভবের কারণে, বিশেষত ১৮-১৯ সালে এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় অর্থনৈতিক ধস আবার সরকারের ভূমিকাকে সামনে নিয়ে এসেছে। ২০০৭-৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক ধস, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ মহামন্দা পরবর্তী সবচাইতে জটিল অর্থনৈতিক সংকটে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেইনস সে কারণে এখন বেশি মানাযোগ পাচ্ছেন। বিশ্বব্যাপ্তকেও প্রথম ধারা থেকে সরে এসে তৃতীয় ধারায় যোগ দেবার উদ্যোগ দেখা গেছে। বিশ্বব্যাপ্তকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ (Josef Stiglitz) কিংবা বুটেনের নেতৃস্থানীয় সমাজতাত্ত্বিক এন্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens) একে বলেছেন তৃতীয় ধারা। পল স্যামুয়েলসনকে এই ধারার অন্যতম প্রধান বলা যায়। এই অর্থনীতিকে তিনি বলেন ‘মিশ্র অর্থনীতি’ (mixed economy)।

সারসংক্ষেপ

অর্থনীতিবিদদের মতে সমাজে কিছু বিষয় আছে যেগুলো বাজার প্রক্রিয়ায় সমাধান করা যায় না। যেমন-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবিধ বৈষম্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয় ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভোক্তার আচরণ ও চাহিদা তত্ত্ব Consumer Behaviour and Theory of Demand

প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে ভোক্তার আচরণ অন্যতম কেন্দ্রীয় মনোযোগের বিষয়। একজন ভোক্তার চাহিদা, উপযোগ, পছন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ এবং দাম, আয় ইত্যাদির পরিবর্তনে তার প্রতিক্রিয়ার ধরন ইত্যাদি ব্যাষ্টিক অর্থশাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। আমরা ক্রমে এই বিষয়গুলো আলোচনা করবো।

ভোক্তার আচরণ

ব্যাষ্টিক অর্থশাস্ত্রে একক ভোক্তার আচরণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। ভোক্তার পছন্দ এবং সিদ্ধান্ত কীভাবে নির্ধারিত হয়, কী কী শর্তের উপর এগুলো নির্ভর করে, দাম পরিবর্তন বা আয় পরিবর্তন বা অন্য কোনো পরিবর্তন কীভাবে এবং কী মাত্রায় একজন ভোক্তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে সে সবই এই বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত।

নয়া ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্র একক ভোক্তা ধরে এই বিশ্লেষণকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সেটাকেই অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় বলে বিবেচনা করে। এই ধারার অর্থনীতিবিদদের মতে, ভোক্তা হচ্ছে সার্বভৌম, ভোক্তার পছন্দ আর সিদ্ধান্ত তাই তার সার্বভৌম অবস্থান ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। ভোক্তার তৃপ্তি, উপযোগ সর্বোচ্চকরণ যেহেতু মূল্য লক্ষ্য, সেহেতু তার অবস্থান যাই হোক, যা কিছু থেকেই তার এই তৃপ্তি আসুক সেটাই ভোক্তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করে। তাঁরা মনে করেন, তাই ভোক্তার এই আচরণ বস্তুত: অর্থনৈতিক তৎপরতায় সমান বিনিময়কেই নিশ্চিত করে এবং অর্থনীতিতে একটি সুস্থ অবস্থার সৃষ্টি করে। এই অর্থনীতিবিদদের মতে, এই অবস্থা একই সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্যবহার ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বাজার অর্থনীতির ক্ষমতাকেই প্রকাশ করে।

এই ব্যাখ্যাকে অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদই গ্রহণ করেননি। ব্রিটিশ খ্যাতনামা ও আন্তর্জাতিক নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ যিনি কেইনসীয়ান অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত সেই জোয়ান রবিনসন (Joan Robinson) 'ভোক্তার সার্বভৌম' এই ধারণাটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সব ভোক্তা এক রকম নয়। আয়ের ব্যাপক পার্থক্য ক্রয়ক্ষমতার যে মাত্রায় পার্থক্য তৈরি করে তাতে পছন্দ আর তৃপ্তির সার্বজনীন ধারণাটি কাজ করে না। তাছাড়া বিজ্ঞাপন আর অন্যান্য প্রভাব

ও প্রচারের চাপ এবং তথ্যের ঘাটতির ফলে ভোক্তা যে পছন্দটি করে, তা আসলে তার নয়। শুধু দৃশ্যমান নয়, ভোক্তার মনোজগতের এই নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা বিবেচনায় নিলে বাজার অর্থনীতির প্রচলিত অনেকগুলো অনুমিতির গ্রাহ্যতা ক্ষুণ্ণ হবে। ভোক্তাকে তার সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন সমরূপ (homogeneous) একটি অর্থনৈতিক এজেন্ট হিসেবে বিবেচনা করলে সমাজে শুধু আয় দিয়ে নয় অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের যেসব বৈষম্য বা অসমতা আছে সেগুলোও ঢাকা পড়ে যায়। এর মধ্যে শ্রেণীগত ছাড়াও আছে জাতিগত এবং লিঙ্গীয় বৈষম্য।

সমাজের অসম অবস্থা যে গুরুত্বপূর্ণ তা বাজার অর্থনীতির নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদও উপলব্ধি করেছেন, ‘আমরা একটা কপট সমাজে বাস করি। আমাদের আইন ঘোষণা করে সবার জন্য সমান অধিকার, এক ব্যক্তির এক ভোট, সবার জন্য সমান সুযোগ। আধুনিক গণতন্ত্রের এটা হলো চলতি বুলি। কিন্তু প্রতিদিনের বাজার অর্থনীতির জীবন অন্য কথা বলে। এখানে কিছু মানুষ যখন ক্ষুধার্ত থাকে এবং যখন তাদের কোনো ঘুমানোর জায়গা থাকে না তখন অন্যকিছু মানুষ থাকে বিশাল প্রাসাদে এবং লাখ ডলারের গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।”^৯

চাহিদা ও যোগানের প্রাথমিক ধারণা

আমরা সবাই দিনে রাতে অনেক কিছুরই প্রয়োজন বোধ করি। অনেক কিছু আমাদের দরকার হয় বেঁচে থাকার জন্য, অনেক কিছু দরকার হয় আনন্দ পাবার জন্য। অনেক কিছু আবার দরকার হয় নিজেদের শারীরিক অবস্থার বা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য। আবার অনেক কিছু আমরা চাই নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য। আবার আমরা এমন অনেক কিছু চাই যা এসবেরই বাইরে, মানসিক আশ্রয়-মনের

ছক ১. চাহিদার বহুমাত্রিকতা

প্রয়োজন কেন?	কী কী?
বেঁচে থাকার জন্য	খাদ্য, বস্ত্র, অশ্রয়, ওষুধ, নিরাপত্তা, বিগত বাতাস, বিগত পানি।
আনন্দ পাবার জন্য	গান, নাচ, নটিক, চলচ্চিত্র, ভ্রমণ, বই, ছবি।
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য	যানবাহন, উন্নত আশ্রয়, বস্ত্র, অবসর বৃদ্ধি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, সুস্থ পরিবেশ।
মানসিক উৎকর্ষের জন্য	শিক্ষা, গবেষণা, তথ্য, যোগাযোগ।
মনের আশ্রয়ের জন্য	স্নেহ, আদর, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, ভালোবাসা, সঙ্গ।

৯. “We live in a double-standard society. Our laws proclaim equal right for all, the principle of one person one vote, and equality of opportunity. This is the rhetoric of modern democracy. But daily life in a market economy speaks otherwise. While some people go hungry and have no where to sleep, others live in outplant mansions and drive \$100,000 cars”. Samuelson, op cit, 14th edition, 354

প্রয়োজনে। এই সবগুলো চাওয়া এক নয়, এক প্রকার নয়। কিন্তু এগুলোর কার কী গুরুত্ব, এগুলো আমাদের পক্ষে কীভাবে পাওয়া সম্ভব, মানুষ কোনটি মানুষ হিসেবে সমাজ থেকে পাবার অধিকার রাখে, কোনটিতে সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে সবার প্রবেশাধিকার আছে, ক্রয়ক্ষমতার উপর কোন কোনটি পাওয়া নির্ভর করবে ইত্যাদি বিষয় সবাই একইভাবে দেখেন না। মানুষের প্রাপ্যতা, ক্ষমতা, অধিকার ইত্যাদি নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত।

নিচের ছকে চাহিদার বহুমাত্রিক, বহুমুখী একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা যে ধরনের অর্থনীতিতে বসবাস করি সেখানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মানুষের চাওয়া বা আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা হয় তখনই যখন তার হাতে তা কেনার মতো পয়সা থাকবে। এই অর্থনীতিতে উপরের প্রায় সবগুলো প্রয়োজন মেটানোর জন্যই মানুষ অর্থের সন্ধান করে। আমরা পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখি যে, অর্থের জন্য, ন্যূনতম সম্পত্তির জন্য কীভাবে ভাই-বোনকে, ছেলে বাবা বা মাকে, ভাই-ভাইকে আঘাত করছে, মা বা বাবা অর্থের অভাবে সন্তানকে বিক্রি করে দিচ্ছে! এর পেছনে সেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের অক্ষমতা কিংবা এটি অর্জনের যে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা তার বিষয়গুলোই কাজ করে।

এসব বিষয় নিয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করবো। আপাতত আমরা এখন দৈনন্দিন প্রয়োজন বা দৈনন্দিন চাহিদার দিকে তাকাই। এখানে আমাদের খেয়াল করা দরকার যে, বর্তমানে অর্থশাস্ত্র বলতে প্রধানত যে নয়া ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয় সেটি বর্তমান ‘বাজার অর্থনীতি’কে একটি স্থায়ী, অনৈতিহাসিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখে থাকে। তার ফলে এই কাঠামোতে ব্যষ্টিক বা সামষ্টিক যেভাবেই হোক স্বল্পমোদে নির্দিষ্ট কিছু আচরণকেই সমগ্র বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

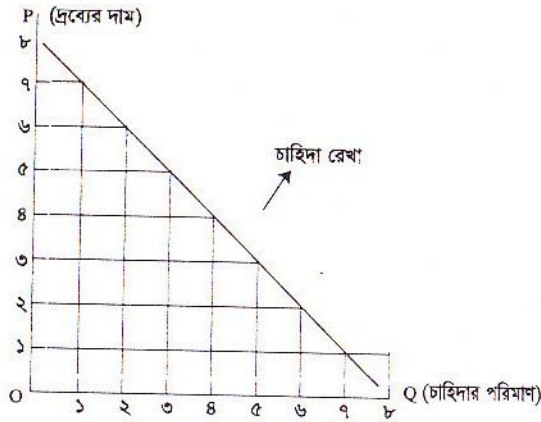
চাহিদা বিধি কী?

এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী যদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে একটি পণ্যের দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিচেনা করলে সাধারণত একটি চিত্র দেখা যায়। তাকে এক কথায় বলা যায় এভাবে, “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে।”

অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, $q_d = f(p)$ এখানে q_d = চাহিদার পরিমাণ, p = দাম।

ছক ২: একটি পণ্যের কাল্পনিক দাম ও চাহিদার চিত্র

দাম	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
চাহিদা	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭



চিত্র ২.১: চাহিদা রেখা

উপরের ছক ও চিত্রে দাম যখন ৮ তখন চাহিদা শূন্য। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা ১ ২ ৩ করে বাড়ছে। এটি হচ্ছে চাহিদার সাধারণ চিত্র, যেখানে রেখা ডানদিকে নিম্নগামী।

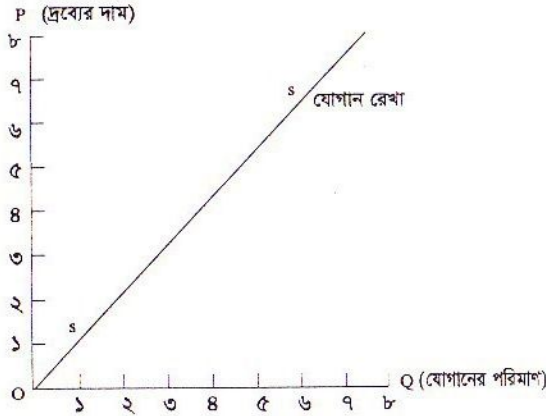
যোগান বিধি কী?

একইভাবে আমরা যদি যোগানের দিকে তাকাই তাহলেও একটি সাধারণ চিত্র পাবো। সেখানে দেখবো: “অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত থাকলে দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, দাম কমলে যোগান কমে।” অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, $q_s = f(p)$ যেখানে q_s = যোগানের পরিমাণ, p = দ্রব্যের দাম।

ছক ৩: একটি পণ্যের কাল্পনিক দাম ও যোগানের চিত্র

দাম	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
যোগান	১০	৯	৮	৭	৫	৩	২	১

ছক অনুযায়ী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যোগানের পরিমাণও বাড়ছে। দামের সঙ্গে যোগানের একমুখী সম্পর্কের কারণে চিত্রে তাই আমরা ডানদিকে উর্ধ্বগামী যোগান রেখা পাচ্ছি।



চিত্র ২.৩: যোগান রেখা

বিধির ব্যতিক্রম

দামের সঙ্গে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক এবং যোগানের একমুখী সম্পর্কই যথাক্রমে চাহিদা বিধি ও যোগান বিধির মূল কথা বলে আমরা জানি। কিন্তু এমন কিছু দ্রব্য বাজারে থাকতে পারে যেগুলোতে এই বিধি কাজ করে না কিংবা সম্পূর্ণ বিপরীত বিধি কার্যকর হয়। চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায় যেসব ক্ষেত্রে সেগুলো হলো নিম্নরূপ:

- * যখন সামাজিক অভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য কোনো কিছু কেনা হয় তখন দাম বৃদ্ধিতে চাহিদা আরও বাড়ে।
- * শেয়ার বাজারের মতো ক্ষেত্রে যখন প্রত্যাশা থাকে আরও দাম বৃদ্ধির, তখন দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে আবার যখন আশঙ্কা থাকে দাম কমার তখন দাম কমলে চাহিদা কমে।
- * যখন কোনো দ্রব্য এমন হয় যার দাম বৃদ্ধি ভোক্তাকে বাধ্য করে অন্য পণ্যের চাহিদা কমিয়ে সেটিকেই আরও বেশি করে কিনতে। আয়ারল্যান্ডের রবার্ট গিফেন এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বলে এ ধরনের দ্রব্যকে ‘গিফেন দ্রব্য’-ও বলা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্রব্যের উদাহরণ হতে পারে চাল। চালের দাম বেড়ে গেলে সীমিত আয়ের মানুষ অন্য আরও দামি দ্রব্য যেমন মাংস বা দুধের ভোগ কমিয়ে আরও বেশি চাল দিয়ে নিজের ভোগ চাহিদা পূরণ করবে।
- * আয় বেড়ে গেলে এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলোর দাম কমলেও তার চাহিদা বাড়বে না। এ ধরনের দ্রব্যকে বলা হয় নিকৃষ্ট দ্রব্য, যেগুলোর চাহিদা আয় বৃদ্ধির

সাথে সাথে কমে আসে। আবার কোনো কোনো পণ্যের দাম যদি বাড়ে তবুও ভোক্তার আয় বাড়লে সেগুলোর চাহিদা বাড়তে পারে।

অবশ্য “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে” শর্তটি চাহিদা ও যোগান বিধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যতিক্রম যেগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো অন্যান্য অবস্থার প্রভাবে। চূড়ান্ত বিচারে, তাই এগুলোকে ঠিক ব্যতিক্রম বলা যায় না।

সারসংক্ষেপ

নয়া ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মতে ভোক্তা হচ্ছে সার্বভৌম, ভোক্তার পছন্দ আর সিদ্ধান্ত তাই তার সার্বভৌম অবস্থান ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সব ভোক্তা একরকম নয়। আয়ের ব্যাপক পার্থক্য ক্রয়ক্ষমতার যে মাত্রায় পার্থক্য তৈরি করে তাতে পছন্দ আর তৃপ্তির সার্বজনীন ধারণাটি কাজ করে না। মানুষের প্রাপ্যতা, ক্ষমতা, অধিকার ইত্যাদি নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভারসাম্য বিন্দু কী?

অর্থশাস্ত্রে এই বিন্দুটি খুঁজে বের করা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেখানে চাহিদা আর যোগান একটি নির্দিষ্ট দামে একটি ভারসাম্যে এসে পৌঁছে। নিচের ছকে আমরা এর একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি। নিচের রেখাতেও এর আরেকটি প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। এগুলো থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় যে, ভারসাম্য বিন্দু ছাড়া আর অন্য সকল বিন্দুতেই চাহিদার তুলনায় যোগান উদ্বৃত্ত হয় নয়তো চাহিদার তুলনায় যোগানের ঘাটতি হয়। একমাত্র ভারসাম্য বিন্দুতেই (p, q) চাহিদা ও যোগান সমান হয়। দ্রব্যের দাম যদি ভারসাম্য দামের উপরে থাকে তাহলে উদ্বৃত্ত যোগানের সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম নিম্নমুখী হবার প্রবণতা থাকে। আবার দ্রব্যের দাম যদি ভারসাম্য দামের নিচে অবস্থান করে তাহলে উদ্বৃত্ত চাহিদার সৃষ্টি হয় যা দ্রব্যের দামকে উর্ধ্বমুখী করে। চিত্র ২.৪-এ এটা দেখানো হয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, চাহিদা ও যোগানের বিধিসম্মত অবস্থানটি সকল সময়েই একটি স্থিতিশীল ভারসাম্য নির্দেশ করে।

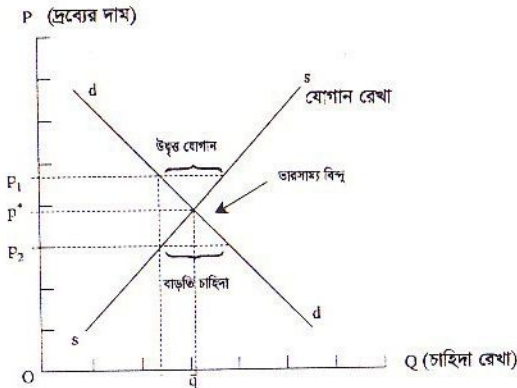
ছক ৪: একটি পণ্যের কাল্পনিক দাম ও চাহিদা যোগানের ভারসাম্যের চিত্র

দাম	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	০
যোগান	১০	৮	৭	৬	৫	৩	২	১	০
চাহিদা	০	১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯

উদ্বৃত্ত যোগান

ভারসাম্য বিন্দু

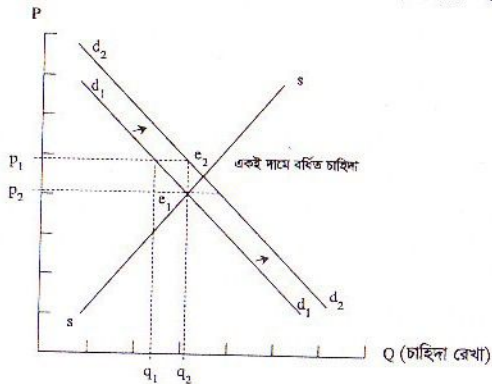
বাড়তি চাহিদা



চিত্র ২.৪ ভারসাম্য বিন্দু

ভারসাম্য পরিবর্তন: চাহিদা

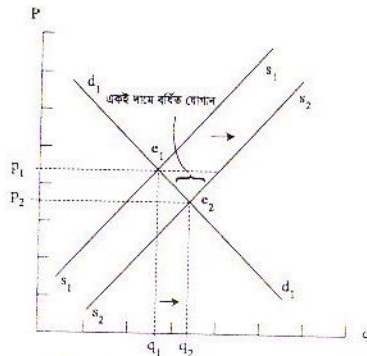
এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই ভারসাম্যের অব্যাহত পরিবর্তনের সম্ভাবনা। দামের সঙ্গে চাহিদার যে উঠানামা আমরা দেখি তাকে আমরা বলি চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন (change in quantity demand)। কিন্তু যখন 'অন্যান্য অবস্থার' প্রভাবে একই দামেই চাহিদার পরিবর্তন হয় তখন তা থেকে আমরা দেখি চাহিদা রেখার স্থানান্তর (shift in demand)। যোগানের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটে (change in quantity supply এবং shift in supply)। এগুলো যখন ঘটতে থাকে তখন ভারসাম্যের মধ্যেও পরিবর্তন অব্যাহত গতিতে ঘটতে থাকে। এগুলো নিচের চিত্রগুলোতে দেখানো হলো।



চিত্র ২.৫: চাহিদার স্থানান্তর (shift in demand)

ভারসাম্য পরিবর্তন: যোগান

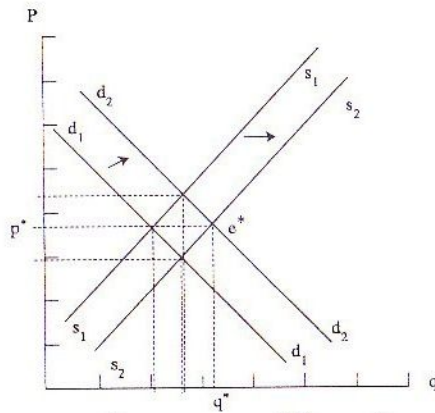
উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, ভোক্তার আয় বাড়ার ফলে চাহিদা রেখা d_1d_1 থেকে d_2d_2 তে স্থানান্তরিত হয়ে এখন পূর্বের ভারসাম্য দাম p_1 -এ বর্ধিত চাহিদা বিরাজ করে। যোগান একই থাকায় দ্রব্যের দাম উর্ধ্বমুখী হয়। চিত্র ২.৪-এ তীরচিহ্নের



চিত্র ২.৬ যোগানের স্থানান্তর

মাধ্যমে দামের উর্ধ্বমুখীতা এবং ভারসাম্য বিন্দু-র পরিবর্তন দেখানো হয়েছে এতে ভারসাম্য বিন্দু e_1 থেকে e_2 তে স্থানান্তরিত হচ্ছে। নতুন ভারসাম্য দাম p_2 এবং পরিমাণ q_2 । যোগান রেখা যখন s_1s_1 থেকে s_2s_2 তে স্থানান্তরিত হচ্ছে তখন ভারসাম্য বিন্দু e_1 থেকে e_2 -তে যাচ্ছে এবং দাম ও পরিমাণ দুটোই নতুন বিন্দুতে স্থিত হচ্ছে। নতুন ভারসাম্য বিন্দু e_2 তে দ্রব্যের দাম p_1 থেকে p_2 তে কমে যাচ্ছে কিন্তু বাজারে পণ্যের বেচাকেনার পরিমাণ q_1 থেকে q_2 তে বেড়ে যাচ্ছে। উদ্ভূত যোগানের সৃষ্টি হলে দ্রব্যের দাম ও পরিমাণের সমন্বয় যেভাবে ঘটে তা চিত্র ২.৫-এ তীরচিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

স্থানান্তরিত রেখাদ্বয়ের ছেদ বিন্দুতে চূড়ান্ত ভারসাম্য নির্ধারিত হবে যেখানে উদ্ভূত চাহিদা অথবা যোগান শূন্য হবে।



চিত্র ২.৭: চাহিদা ও যোগানের বিভিন্ন পর্বে স্থানান্তর

চাহিদা ও যোগান রেখা দুটোই যখন স্থানান্তরিত হচ্ছে তখন পরপর অনেকগুলো ভারসাম্য তৈরি হবার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত ভারসাম্য দাঁড়াচ্ছে e^* তে এবং ভারসাম্য দাম দাঁড়াচ্ছে p^* তে। ভারসাম্য পরিমাণ q^* । মোট কথা, স্থানান্তরিত রেখাদ্বয়ের ছেদ বিন্দুতে চূড়ান্ত ভারসাম্য নির্ধারিত হবে যেখানে উদ্ভূত চাহিদা অথবা বাড়তি যোগান শূন্য হবে।

সাধারণভাবে চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে এই যে নানা ধরনের সম্পর্ক আমরা দেখি সেগুলো বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। এসব ব্যাখ্যায় বিশেষত যখন চাহিদাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয় তখন যেসব বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয় সেগুলো হলো প্রধানত একজন ভোক্তার আচরণকে বিশ্লেষণ করা। কোনো পণ্যের জন্য তার চাহিদা তৈরি, তার পছন্দ এবং তা ক্রয় সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত এগুলোর অনুপুঞ্জ বিশ্লেষণের আরও নানা দিক আছে। তার আগে আমরা দেখি চাহিদা এবং যোগান-এর পেছনে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন ব্যক্তিক ও সামাজিক উপাদান কী কী হতে পারে? পরবর্তী পাঠে আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করছি।

সারসংক্ষেপ

চাহিদা বিধি অনুযায়ী অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। অন্যদিকে, যোগান বিধি অনুযায়ী অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, দাম কমলে যোগান কমে। ভারসাম্য বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান সমান হয়। আর ভারসাম্য বিন্দু ছাড়া অন্য সব বিন্দুতে চাহিদার তুলনায় যোগান উদ্ভূত হয় নয়তো চাহিদার তুলনায় যোগানের ঘাটতি হয়। চাহিদা ও যোগান বিধিতে 'অন্যান্য অবস্থা'র প্রভাবে চাহিদা ও যোগান রেখার স্থানান্তর হয়ে থাকে।

৩

চাহিদার পেছনে কী কী উপাদান কাজ করে

একটি নির্দিষ্ট দামে যে কোনো পণ্যের চাহিদা তৈরির পেছনে ঐ পণ্যের দামের পরে আরও যে কারণগুলো কোনো না কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নরূপ:

- * গড় আয়
- * বাজারের আয়তন
- * সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম
- * পছন্দ বা অগ্রাধিকারের ধরন
- * বিজ্ঞাপন
- * অন্যান্য বিশেষ প্রভাব

আমরা এই বিষয়গুলো নিম্নোক্তরূপে লিখতে পারি।

$$Q_{da}=f(p_a, p_b, \dots, p_z, y, t, m, ad, o)$$

$$Q_{da}=a \text{ পণ্যের চাহিদা}$$

$$p_a=a \text{ পণ্যের দাম}$$

$$p_b, \dots, p_z = \text{সম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের দাম}$$

$$y = \text{গড় আয়}$$

$$t = \text{পছন্দ}$$

$$m = \text{বাজার}$$

$$ad = \text{বিজ্ঞাপন}$$

$$o = \text{অন্যান্য}$$

আমরা যখন চাহিদা বিধিতে চাহিদা ও দামের সম্পর্ক দেখাই তখন অন্য উপাদানগুলো স্থির রয়েছে বা অন্যান্য উপাদানগুলোর প্রভাব আর কার্যকর নেই বলে ধরে নেই। সেজন্য “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে” কথাটি চাহিদা বিধির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো দ্রব্যের চাহিদা তার নিজ দামের উপর নির্ভরশীল: $Q_{da}=f(p_a)$ পূর্বে চাহিদা বিধি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা এই সম্পর্ককে ছক ও চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছি। এখন আমরা “অন্যান্য অবস্থার” গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো আলোচনা করবো।

১. গড় আয়

আমাদের মতো দেশে বেশিরভাগ মানুষের আয় অনেক নিচে, আবার কিছু সংখ্যক মানুষের আয় সেই তুলনায় অনেক বেশি। দুয়ের মধ্যে প্রায় আকাশ-পাতাল তফাৎ।

এই সবকিছু মিলিয়েই গড় আয় হিসাব করা হয়। গড় আয় দিয়ে একটি অর্থনীতির পুরো জনগোষ্ঠীর ভেতরের পার্থক্য বোঝা যাবে না। তবে সাধারণভাবে ক্রয় ক্ষমতার অবস্থা গড় আয়ের স্তর থেকে আঁচ করা যাবে। যেমন বাংলাদেশের মানুষের গড় আয় কম, তা দিয়ে বেশিরভাগ মানুষের খুবই কম আয় এবং সেই কারণে বাজারভেদে পণ্যের প্রতি তাদের খুব কম চাহিদা বোঝা যায়। গড় আয় বাড়লে একটি অর্থনীতিতে অনেক দ্রব্যেরই চাহিদা বেড়ে যায়। যেমন আমাদের বেশিরভাগ মানুষের আয় বাড়লে তারা কাপড় পরবেন, জুতা পরবেন, লেখাপড়া করবেন। তাতে কাপড়, জুতা, কাগজ, কলম ইত্যাদির চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে। যেসব দেশে গড় আয় বেশি সেসব দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদাও বেশি।

২. বাজারের আয়তন

বাজারের আয়তন মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে। যত বেশি সংখ্যক মানুষ ক্রয়ক্ষমতার একটি ন্যূনতম জায়গায় আসতে সক্ষম হবেন ততই বাজারের আয়তন বাড়বে। বাজারের আয়তন নির্ধারণে জনসংখ্যা একটি প্রয়োজনীয় উপাদান কিন্তু যথেষ্ট উপাদান নয়। একটি দেশে জনসংখ্যা বেশি থেকেও বাজারের আয়তন ছোট হতে পারে আবার জনসংখ্যা তুলনায় কম থাকলেও বাজারের আয়তন বড় হতে পারে। যেমন পুরো ইউরোপ মহাদেশের যা জনসংখ্যা তার দ্বিগুণেরও বেশি জনগোষ্ঠী আছে ভারতে, কিন্তু যেহেতু ভারতের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন সেহেতু বাজারের আয়তনের দিক থেকে ভারত ইউরোপের চাইতে ছোট। বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন পনেরো কোটিরও বেশি, কিন্তু বাজারের আয়তনের দিক থেকে বিবেচনা করলে এখানে জনসংখ্যা দুই কোটিও নয়, কারণ এখানে বেশি সংখ্যক মানুষ খুব কম ক্ষেত্রেই বাজার থেকে কেনাকাটার ক্ষমতা রাখেন। সেজন্য মানুষ হিসেবে তারা এদেশে অবস্থান করলেও বাজার অর্থনীতির বিচারে তারা অনুপস্থিত।

৩. সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম

সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম সবসময়ই একটি দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। সম্পর্কিত দ্রব্যাদি হতে পারে বিকল্প দ্রব্য কিংবা সম্পূরক দ্রব্য। বিকল্প দ্রব্যের দাম কমলে একটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বেড়ে যায় তার ফলে এর চাহিদা কমে যায়। একইভাবে বিপরীতটিও সত্য। অর্থাৎ বিকল্প দ্রব্যের দাম বাড়লে ভোক্তার কাছে সেই দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম কমে যায়, ফলে তার চাহিদা বেড়ে যায়। আবার সম্পূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক অন্যরকম। সম্পূরক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে তা পরোক্ষভাবে এই দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি করে। ফলে এর চাহিদাও কমে যায়।

৪. পছন্দ বা অগ্রাধিকারের ধরন

সব সমাজে, সব ধরনের মানুষের একই ধরনের রুচি, পছন্দ বা অগ্রাধিকার থাকে না। মানুষের রুচি বা অরুচি কিংবা পছন্দ বা অপছন্দ নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। অঞ্চলের ভৌগলিক বিন্যাস, খাদ্য প্রাপ্তির ধরন, খাদ্যাভ্যাস, পোশাকের ধরন, রুচি,

ধর্মীয় বিধিনিষেধ, সংস্কার ইত্যাদি নানাকিছু এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। সে কারণে সব অঞ্চলে একই ধরনের দ্রব্যের প্রতি মানুষের ঝোঁক দেখা যায় না। ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন ও বাজারের বিশ্বায়নের ফলে অনেক অভিন্ন দ্রব্যের প্রতি বিশ্বব্যাপী ঝোঁক দেখা যায়, তা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই অঞ্চলের বা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এখনও যথেষ্ট প্রবল। যেমন বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে মাছ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্ন কারণে এখানে গুয়োরের মাংস জনপ্রিয় নয়, অধিকাংশ মানুষের চাহিদা গঠনের ক্ষেত্রে এর দামের উঠানামা তাই কোনো গুরুত্ব বহন করে না। ভারতে যেমন অধিকাংশ মানুষ গরুর মাংস খাওয়া ঠিক মনে করেন না, তাদের ক্ষেত্রে কিংবা বাংলাদেশেরও অনেকে যারা শারীরিক কারণে বা ধর্মীয় কারণে গরুর মাংস খেতে চান না তাদের ক্ষেত্রে গরুর মাংসের দাম বেশি হলো না কম হলো তাতে কিছু আসে যায় না। বাংলাদেশসহ কাছাকাছি অঞ্চলের মেয়েরা শাড়ি পরতে অভ্যস্ত। এখানে শাড়ির দামের উঠানামা ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অন্য অনেক দেশেই শাড়ির দাম কোনোভাবেই ভোক্তাদের জীবনযাপনকে প্রভাবিত করবে না।

৫. বিজ্ঞাপন

প্রচারমাধ্যমের যতই প্রসার ঘটছে ততই বিজ্ঞাপনের প্রভাবও বাড়ছে। এমনিতে প্রয়োজন না থাকলেও বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা অনেক দ্রব্যেরই চাহিদা অনুভব করি। এই চাহিদা পূরণের জন্য অনেক সময় ধারণা করেন ভোক্তারা। বিজ্ঞাপনের এই প্রভাবের কারণে অনেক বিক্রেতা সংস্থাই বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করে।

৬. অন্যান্য বিশেষ প্রভাব

এর মধ্যে রয়েছে কোনো বিশেষ ঘটনা, বিশেষ উপলক্ষ, কোনো রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদি। যেমন বাংলাদেশে যখন ঈদ হয় তখন কেনাবেচা অনেক বেড়ে যায়। রোজার সময় বিশেষ ধরনের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। ক্রিসমাস-কে কেন্দ্র করে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ খ্রিস্টান প্রধান দেশসমূহে ভোগ্যপণ্য, উপহার সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় গড় অবস্থার চাইতে কয়েকগুণ বেশি। বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন বিভিন্ন স্থানে বই-এর মেলা হয় তখন বই এর বিক্রি অনেক বেড়ে যায়, বৈশাখী মেলায় বেড়ে যায় হস্তশিল্প সামগ্রীর বিক্রি। তাছাড়া বর্ষাকালে ছাতা, শীতকালে গরম কাপড়, বিশ্বকাপের সময় খেলোয়াড়দের নিয়ে নানা সামগ্রীর বিক্রি বৃদ্ধির বিষয়টা সকলেই বুঝতে পারেন।

যোগানের পেছনে কী কী উপাদান কাজ করে

আবার অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট দামে যোগানের পরিমাণ নির্ধারণের পেছনে ঐ দাম ছাড়াও অনেকগুলো উপাদান কাজ করে। এগুলো হলো নিম্নরূপ:

* উৎপাদন ব্যয়, উৎপাদন উপকরণের দাম

- * সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম
- * প্রযুক্তিগত অগ্রগতি
- * বাজার
- * সরকারী নীতি
- * বিশেষ প্রভাব

আমরা এই বিষয়গুলো নিম্নোক্তরূপে লিখতে পারি।

$$q_{sa} = f(p_a, c_a, p_b, \dots, p_z, t_n, m, o)$$

q_{sa} = a পণ্যের যোগান

p_a = পণ্যের দাম

c_a = a পণ্যের উৎপাদন ব্যয়

$p_b \dots p_z$ = সম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের দাম

t_n = প্রযুক্তি

g = সরকারী নীতি

o = অন্যান্য বিশেষ প্রভাব।

যোগানের পরিমাণ ও দামের সম্পর্ক নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য অন্যান্য উপাদান স্থির ধরা হয়। বলা হয়, “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো দ্রব্যের যোগান তার নিজ দামের উপর নির্ভরশীল।” অর্থাৎ, $q_{sa} = f(p_a)$ । পূর্বে যোগান বিধি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা এই সম্পর্ককেই ছক ও চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছি। নিচে অন্যান্য উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো।

১. উৎপাদন ব্যয়

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে পণ্য যোগানের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেলে পণ্য উৎপাদন ও সেই কারণে যোগান কমে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায়। আবার পণ্য উৎপাদন ব্যয় কমে গেলে তা অধিকতর লাভজনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয় বলে পণ্য উৎপাদন ও সেই সূত্রে পণ্যের যোগান বেড়ে যাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কোনো পণ্য উৎপাদনের ব্যয় নির্ভর করে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত অনেক বিষয়ের উপর। যেসব উপাদান প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন ব্যয়কে প্রভাবিত করে সেগুলোর মধ্যে আছে:

- * উৎপাদনের কাঁচামাল
- * যন্ত্রপাতির খরচ
- * প্রযুক্তির উৎপাদন ক্ষমতা
- * জ্বালানী যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস
- * ভবনের খরচ (ভাড়া, খাজনা, রক্ষণাবেক্ষণ)
- * প্রশাসনিক খরচ (কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য)
- * শ্রমিকদের মজুরি

তাছাড়া সরাসরি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও পরোক্ষ আরও নানা উপাদান আছে যেগুলো বিভিন্নভাবে উৎপাদন ব্যয়কে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের

বাস্তব অবস্থা থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। এগুলোর মধ্যে আছে:

- * আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং আর্থিক চাপ: অনুমোদনের জটিলতা, ঘুষ, কমিশনের দাবি।
- * মাস্তানদের চাঁদা, সন্ত্রাস।
- * বিদ্যুৎ-এর লোডশেডিং, গ্যাস-এর সরবরাহে জটিলতা।
- * রাজনৈতিক সংঘাত, উণ্ডেজনা, অচলাবস্থা।

২. উৎপাদন উপকরণের দাম

আগেই বলেছি উৎপাদন উপকরণের দাম প্রত্যক্ষভাবে পণ্যের উৎপাদন ও যোগানকে প্রভাবিত করে। উৎপাদন উপকরণের মধ্যে যেমন আছে কাঁচামাল, তেমনি আছে শ্রম, আছে পুঁজি। পাটের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে পাটশিল্পের খরচ বেড়ে যায়। একইসঙ্গে প্রযুক্তিগত স্থবিরতা বা ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা কিংবা অন্যান্য কোনো কারণে শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস ঘটলে ব্যয় বেড়ে যায়, সেটিও উৎপাদন ও যোগানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ব্যাংক বা অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের জটিলতা বা সুদের হার বৃদ্ধির কারণে পুঁজি সংগ্রহের খরচ বেড়ে গেলেও একই রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

৩. প্রযুক্তিগত অগ্রগতি

প্রযুক্তিগত অবস্থা সরাসরি পণ্য উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটি সহজ অর্থ হলো, কম খরচে কম সময়ে কম পরিশ্রমে আরও বেশি উৎপাদনের ক্ষমতা তৈরি হওয়া। এর ফলে যুক্তিসঙ্গত কারণেই একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কমে যায়। এর ফলে আরও বেশি উৎপাদনের শর্ত তৈরি হয়। অন্যদিকে কোনো পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রযুক্তির অগ্রগতি যদি কোনো কারণে সম্ভব না হয়, যদি প্রযুক্তি একই জায়গায় আটকে থাকে তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিকাশ ঘটেছে তার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে এর উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। ফলে এর উৎপাদন ও যোগান লাভজনক থাকবে না। তাছাড়া, একই প্রযুক্তির অধিক দিন ব্যবহারে যন্ত্রেরও ক্ষয় হয়, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাও তাতে কাজ করে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলো এর খুব ভালো দৃষ্টান্ত। এসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়েছিল স্বাধীনতার পরপরই। তারপর থেকে এসব প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিগত কোনো উন্নয়ন ঘটানো হয়নি, এমনকি যে মেশিনপত্র ব্যবহার করা হতো ৩৫ বছর আগে, সেগুলোরও পুনঃস্থাপন করা হয়নি। ব্যবস্থাপনারও কোনো উন্নয়ন করা হয়নি। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে লোকসান।

৪. সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম

চাহিদার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম চাহিদার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। অবশ্য এখানে সম্পর্ক কেমন তার উপর নির্ভর করে ফলফল কেমন হবে। নির্দিষ্ট কোনো পণ্যের যোগানের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব

ফেলে। সম্পর্কিত দ্রব্য যদি বিকল্প হয় তবে তার দাম বৃদ্ধি ঐ পণ্যের যোগান বাড়াবে, ফলে মূল পণ্যের যোগান কমে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে, আবার কোনো সম্পূরক দ্রব্যের দাম যদি বাড়ে তাহলে সাথে সাথে তা এই পণ্যের দামেরও বৃদ্ধি ঘটাবে এবং তাতে তার যোগান বাড়ানোর ক্ষেত্রে উৎপাদকদের উৎসাহিত করবে।

৫. সরকারী নীতি

বাজার অর্থনীতিতে “আদর্শ অবস্থায়” সরকারের কোনো ভূমিকা থাকবার কথা না থাকলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি যে, বাজার অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে সরকারের ভূমিকা সবসময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পনীতি, আমদানী-রপ্তানী নীতি, মুদ্রানীতি কিংবা অবকাঠামো উন্নয়ন বা বিদেশে বাজার তৈরির ব্যবস্থা ইত্যাদি পণ্যের যোগানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

৬. বিশেষ প্রভাব

বিশেষ প্রভাব যেমন চাহিদার গঠন ও মাত্রাকে প্রভাবিত করে তেমনি তা একইভাবে যোগানকেও প্রভাবিত করে। কোনো উৎসব, ধর্মীয় উপলক্ষ বা জাতীয় ঘটনা ধরে যখন নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের প্রতি মানুষের চাহিদা কিছু সময়ের জন্য হলেও বেড়ে যায়, তখন এসব দ্রব্যের উৎপাদক বা যোগানদাররাও এগুলো অধিক হারে উৎপাদন করতে বা যোগান বাড়াতে উৎসাহিত হন। এটা ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশকদের গ্রন্থ প্রকাশ, ঈদের সময় পোশাক বা খাবার যোগান, বৃষ্টির সময় ছাতা, শীতের সময় গরম কাপড় থেকে শুরু করে জনসভা বা মেলা বা ওয়াজ মাহফিলে বাদাম বা শসা বা অন্যকোনো খাবারের দোকানের বৃদ্ধি পর্যন্ত একইভাবে দেখা যায়।

ছক ৫: একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ ও প্রভাব

অন্যান্য সবকিছু অপরিবর্তিত রেখে যেকোনো একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন	চাহিদার উপর প্রভাব	যোগানের উপর প্রভাব
ঐ পণ্যের দাম বৃদ্ধি	চাহিদার পরিমাণ হ্রাস	যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি
ঐ পণ্যের দাম হ্রাস	চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি	যোগানের পরিমাণ হ্রাস
বিকল্প পণ্যের দাম বৃদ্ধি	চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি	যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি
বিকল্প পণ্যের দাম হ্রাস	চাহিদার পরিমাণ হ্রাস	যোগানের পরিমাণ হ্রাস
সম্পূরক পণ্যের দাম বৃদ্ধি	চাহিদার পরিমাণ হ্রাস	যোগানের পরিমাণ হ্রাস (ব্যয় বৃদ্ধির কারণে)
সম্পূরক পণ্যের দাম হ্রাস	চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি	যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি (ব্যয় হ্রাসের কারণে)
পণ্যের উৎপাদন উপকরণের দাম বৃদ্ধি	চাহিদার পরিমাণ হ্রাস (দাম বৃদ্ধির কারণে)	যোগানের পরিমাণ হ্রাস
পণ্যের উৎপাদন উপকরণের দাম হ্রাস	চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি (দাম হ্রাসের কারণে)	যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি
প্রযুক্তির বিকাশ	চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি	যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি
গড় আয় বৃদ্ধি	চাহিদার বৃদ্ধি	যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি

পূর্বের ছকে আমরা দেখছি একটি নির্দিষ্ট পণ্যের এক একটি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে একই সময়ে তার চাহিদা ও যোগানের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে।

উপরের ছকে দেখা যাচ্ছে, দাম-হাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক ও যোগানের একমুখী সম্পর্ক থাকলেও তা কার্যকর হবার পেছনে নানা প্রক্রিয়া কাজ করে। অন্যান্য উপাদানের প্রভাবও এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

দাম ছাড়াও চাহিদা গড় আয়, বাজারের আয়তন, সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম, পছন্দ বা অগ্রাধিকারের ধরন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে যোগান উৎপাদন ব্যয়, উৎপাদন উপকরণের দাম, সম্পর্কিত দ্রব্যাদির দাম, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বাজার, সরকারি নীতি ইত্যাদি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। চাহিদা ও যোগানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, ধর্ম, উৎসব, বিশেষ দিবস অনেকখানি ভূমিকা পালন করে।

উপযোগ

উপযোগ (Utility) বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কোনো কিছু থেকে, দ্রব্য কিংবা সেবা যাই হোক না কেন ভোক্তার তৃপ্তি বা সন্তোষ। ভোক্তার এই তৃপ্তি সবসময় এককরম থাকে না। ভোগ, আয়সহ বিভিন্ন কারণে এর পরিবর্তন হয়। ব্যক্তির একক তৃপ্তি দিয়ে অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ক্রমে অনেক তাত্ত্বিক অগ্রগতি হয়েছে। উপযোগ ধারণার অনেক বিকাশ হয়েছে।

উপযোগ তত্ত্বের বিকাশ

আজকে আমরা যে উপযোগ তত্ত্ব পাই তা দু'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা, বিবর্তিত ও সংশোধিত-সংযোজিত কাঠামো। যতদূর জানা যায়, প্রথম সুইজারল্যান্ডের এক গণিতজ্ঞ Daniel Bernoulli ১৭৩৮ সালে অর্থব্যয়ের সঙ্গে তৃপ্তির যোগ বের করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজ দার্শনিক, Jeremy Bentham (1748-1831), সমাজ বিজ্ঞানে এই তত্ত্বের প্রয়োগ করেন। বস্তুত: তাঁর দার্শনিক ভিত্তির উপরই এটি এখনও টিকে আছে। একে অর্থশাস্ত্রে আরও সুনির্দিষ্ট এবং কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যার নাম খুবই পরিচিত তিনি হলেন, William Stanley Jevons (1835-1885)^{১০}। তাঁর মূল বক্তব্যই ছিল যে, অর্থনৈতিক তত্ত্ব হচ্ছে একজন ভোক্তার “আনন্দ আর বেদনার হিসাব নিকাশ”। তবে তাঁর আগেও জার্মান অর্থনীতিবিদ Herman Heinrich Gossen (1810-1858) এ বিষয়ে অর্থনৈতিক তত্ত্ব দাঁড় করান। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে তিনি বলেন, “চূড়ান্ত মূল্য বলে কিছু নেই। কোনোকিছুর মূল্য নির্ভর করে ব্যক্তি ও বস্তুর উপর। আর এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে উপযোগের উপর। একজন অর্থনৈতিক ব্যক্তির মূল লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ তৃপ্তি অর্জন।” তিনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিধি সূত্রায়ন করেন যেগুলো এককথায় ভোক্তার আচরণ সম্পর্কিত নয়। ক্লাসিকাল তত্ত্বের ভিত্তি। এগুলো হলো প্রথমত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি এবং দ্বিতীয়ত: সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি। Leon Walras-এর

১০ Australian-British-এই তত্ত্বিকের প্রধান কাজ *The Theory of Political Economy*, 1871 (2nd ed. Penguin, 1970), এছাড়া স্বেচ্ছায় এসব ক্ষেত্রে আরও যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাঁরা হলেন: Carl Menger (1840-1921), তাঁর প্রধান কাজ: *Principles of Economics*, 1871 (NY, 1950) এবং Leon Walras (1834-1910) তাঁর প্রধান কাজ: *Elements of Pure Economics*, 1874, (Arwin, 1954)।

সার্বজনীন অর্থনৈতিক ভারসাম্য (general economic equilibrium) পুরো বিশ্লেষণ কাঠামোতেই খুবই উল্লেখযোগ্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। এরপর ভোক্তার আচরণ সম্পর্কিত তত্ত্বকে আরও সুসংগঠিতভাবে উপস্থিত করেন Alfred Marshall, যাঁকে নয়া ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান দিকপাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থশাস্ত্রের বিকাশ ধারার ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে।^{১১} এই সময়টায় ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। সমাজে ততদিনে ব্যক্তির উপস্থিতিও অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একক ব্যক্তি ও একক প্রতিষ্ঠান ধরে বিশ্লেষণ তখন ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটেই নয়া ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রের বিকাশ দ্রুততর হয়।

প্রান্তিক উপযোগ ও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

প্রান্তিক উপযোগের ধারণা একজন ভোক্তার কোনো দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সঙ্গে তাঁর অর্থব্যয়ের সম্পর্ককে দেখায়। এটি দেখায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই দ্রব্য একই দামে কিনতে থাকলে তা থেকে কীভাবে একক প্রতি উপযোগ কমতে থাকে। প্রান্তিক উপযোগ অর্থ হলো প্রাপ্ত অর্থাৎ অতিরিক্ত একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ। একজন ভোক্তার কোনো দ্রব্যের ৪ একক ভোগ করে যদি মোট উপযোগ পায় ২০, ৫ একক ভোগে মোট উপযোগ পায় ২৩, তবে পঞ্চম এককের প্রান্তিক উপযোগ = (৫ এককের মোট উপযোগ) - (৪ একক মোট উপযোগ) = ২৩ - ২০ = ৩।

এ্যাডাম স্মিথ মোট উপযোগের উপর কোনো পণ্যের দাম নির্ভর করে ভেবেছিলেন বলে বাতাস ও হীরার দাম মোট উপযোগ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে অপারগ হন। বাজারে একটি পণ্যের দাম নির্ভর করে আসলে তার প্রান্তিক উপযোগের উপর, মোট উপযোগের উপর নয়। প্রান্তিক উপযোগ বাড়লে তার দুঃপ্রাপ্যতার জন্য। যে কারণে বাতাসের মোট উপযোগ অনেক বেশি হলেও অসীম যোগানের কারণে তার দাম নেই, কিন্তু হীরার মোট উপযোগ কম হওয়া সত্ত্বেও তার দুঃপ্রাপ্যতার কারণে তার প্রান্তিক উপযোগ বেশি, ফলে দামও বেশি।

যে কোনো একটি পণ্য x -এর একটি অংশ ভোক্তা ভোগ করতে গিয়ে যা করতে চাইবে তা হলো তার মোট উপযোগ $u(x)$ এবং তার জন্য ব্যয়ের px (p হলো x -এর একক প্রতি দাম) পার্থক্যকে অর্থাৎ $u(x) - px$ বাড়াতে চেষ্টা করবে। x এর সঙ্গে অন্তরীকরণ (differentiation) করে এবং ফলাফলের সমান ০ ধরে অগ্রসর হলে আমরা পাই $du/dx - p = 0$, অর্থাৎ দাম এবং প্রান্তিক উপযোগ সমান অর্থাৎ $p = du/dx$ । আবার এর দ্বিতীয় অন্তরীকরণ করলে আমরা ঋণাত্মক ফল পাই। অর্থাৎ তা থেকে এটাই পরিষ্কার হয় যে, প্রান্তিক উপযোগ পরিবর্তনের হার অবশ্যই নিম্নগামী।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা একটি পণ্য ক্রমান্বয়ে ভোগ করতে থাকলে

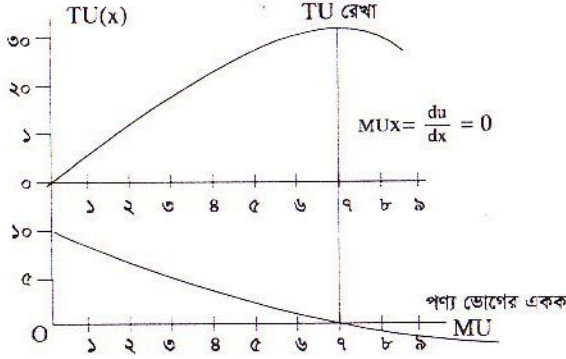
১১. Alfred Marshall: *Principles of Economics*.

আমরা সাধারণভাবে একটি চিত্র পাই। দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা একটি পণ্য ক্রমান্বয়ে ভোগ করতে থাকলে ঐ পণ্য থেকে একক প্রতি প্রাপ্ত উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এই কমা ০ পর্যন্ত যায়, এমনকি তা ঋণাত্মকও হয়। প্রান্তিক উপযোগ ০ হওয়া পর্যন্ত মোট উপযোগ অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট সময়ে ঐ নির্দিষ্ট পণ্য থেকে প্রাপ্ত সম্মিলিত উপযোগ বাড়তে থাকে। কিন্তু একটানা ভোগ করতে থাকলে যখন ভোক্তা ঐ পণ্য থেকে কোনো তৃপ্তিই বোধ করে না, বরঞ্চ বিরক্ত বোধ করে, তখন প্রান্তিক উপযোগ হয়ে যায় ঋণাত্মক। প্রান্তিক উপযোগ যখন ঋণাত্মক হয়ে যায় তখন ঐ পণ্য থেকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত সম্মিলিত মোট উপযোগ আর বাড়ে না বরং এরপর কমতে থাকে। লক্ষ করলে দেখবো, যে এককে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়, সেই এককেই ঐ পণ্য থেকে সব মিলিয়ে মোট উপযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে। এরপর থেকে প্রান্তিক উপযোগ যেহেতু ঋণাত্মক হয়ে যায়, সেহেতু মোট উপযোগ ক্রমান্বয়ে এরপর থেকে কমতে থাকে। পণ্যের একটানা ভোগ চলতে থাকলে ভোক্তা তা থেকে যেভাবে তৃপ্তি পায়, তাই এই যে সাধারণ চিত্র সেটিকেই ‘ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি’ হিসেবে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে।

এর মূল কথাটি আমরা আবার বলতে পারি এইভাবে যে, একজন ভোক্তা যে দামে একটি পণ্য ক্রয় করে তা থেকে কমপক্ষে সেই পরিমাণ উপযোগ আশা করে। প্রথম একক থেকে সে পায় সর্বোচ্চ প্রান্তিক উপযোগ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা ঐ পণ্য ক্রমান্বয়ে ভোগ করতে থাকলে ঐ পণ্য থেকে একক প্রতি প্রাপ্ত উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এই কমা শূন্য পর্যন্ত যায় এমনকি তা ঋণাত্মকও হয়। প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়া পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়তে থাকে, কিন্তু তা একই হারে বাড়েনা, বাড়েনা ক্রমহ্রাসমান হারে। একটি পণ্য ক্রমান্বয়ে ভোগ করতে থাকলে তা থেকে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হবার এই প্রক্রিয়াকে যে বিধি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকেই “ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি” (Theory of Diminishing Marginal Utility) বলা হয়।

ছক ৬: মোট ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক

পণ্যের ক্রমান্বয়ে একক	অতিরিক্ত একক প্রতি প্রান্তিক উপযোগ (MU)	নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের মোট উপযোগ (TU)
০	০	০
১	১০	১০
২	৮	১৮
৩	৬	২৪
৪	৪	২৮
৫	২	৩০
৬	১	৩১
৭	০	৩১
৮	-১	৩০
৯	-৩	২৮



চিত্র ২.৮: মোট ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা

সমপ্রান্তিক উপযোগ (Equi-marginal utility)

একজন ভোক্তা যার আয় নির্দিষ্ট তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও নির্দিষ্ট করবার দরকার হয়। যেসব পণ্য থেকে সে উপযোগ পাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে তাকে বিবেচনা করতে হয় যে অর্থ দিয়ে সে একটি পণ্য কিনছে সেই অর্থের প্রান্তিক উপযোগের বিষয়ও। নির্দিষ্ট আয় এবং নির্দিষ্ট বাজারে একজন ভোক্তা তখনই সর্বোচ্চ তৃপ্তি পাবে যখন কোনো নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়কৃত অতিরিক্ত একক টাকা থেকে যে প্রান্তিক উপযোগ পাবে তা অন্য একটি পণ্য থেকেও একই সমান পেতে পারবে।

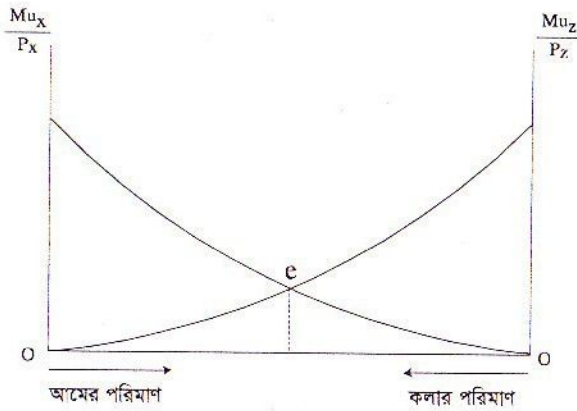
নিচের সূত্র দিয়ে এটি বোঝানো যায়:

আমের (x) প্রান্তিক উপযোগ/আমের দাম = দুধের (y) প্রান্তিক উপযোগ/দুধের দাম = কলার (z) প্রান্তিক উপযোগ/ কলার দাম।

$$\frac{Mu_x}{P_x} = \frac{Mu_y}{P_y} = \frac{Mu_z}{P_z}$$

=আমের প্রান্তিক উপযোগ

একক টাকা প্রতি আমের (x) প্রান্তিক উপযোগ $(\frac{Mu_x}{P_x})$ যদি একক টাকা প্রতি কলার প্রান্তিক উপযোগের $(\frac{Mu_z}{P_z})$ সমান না হয় তবে ভোক্তা ভারসাম্যে পৌঁছতে পারবে না। ধরি $\frac{Mu_x}{P_x} > \frac{Mu_z}{P_z}$ এক্ষেত্রে একজন ভোক্তা আম (x) বেশি ক্রয় করে অথবা কলা (z) কম ক্রয় করে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছতে পারে। e বিন্দুতে ভোক্তার আম ও কলার ভোগের ক্ষেত্রে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিন্দু দেখানো হয়েছে।



চিত্র ২.৯: সমপ্রান্তিক উপযোগ বিন্দু

স্মারসংক্ষেপ

প্রায় দুশ' বছরের বেশি সময় ধরে উপযোগ তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। অ্যাডাম স্মিথ মোট উপযোগের ভিত্তিতেই তাঁর বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছিলেন। পরে প্রান্তিক উপযোগ ধারণার উদ্ভব হয়। প্রান্তিক উপযোগ হলো প্রাপ্ত অর্থাৎ অতিরিক্ত একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ। প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়া পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়ে থাকে, কিন্তু তা একই হারে বাড়ে না, বাড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে। এই প্রক্রিয়াকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলা হয়।

উপযোগ পরিমাণ ও নিরপেক্ষ রেখা

সংখ্যাবাচক ও ক্রমনির্দেশক পদ্ধতি (Cardinal and Ordinal approach)

ভোক্তার আচরণ অর্থাৎ তার পছন্দ বা সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপযোগ পদ্ধতির ব্যবহার দুইভাবে করা হয়। এর একটি হলো একে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা, যার ব্যবহার আমরা দেখি প্রান্তিক উপযোগের ক্রমহাস প্রাপ্তি কিংবা মোট উপযোগের পরিমাণে। সংখ্যা দিয়ে ভোক্তার অসন্তোষ বা তৃপ্তিকে এভাবে প্রকাশকে বলা হয় সংখ্যাবাচক পদ্ধতি (Cardinal Approach)। মার্শালসহ উনিশ শতকের অর্থনীতিবিদরা এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। আমরা গত অধ্যায়ে এই পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করেছি। ক্রমান্বয়ে এই পদ্ধতির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে এবং বিশ শতকের ৩০ দশকের মধ্যে এই ধারণার ব্যাপারে সংশয় ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে বিকল্প পরিমাপ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। অবশ্য উনিশ শতকের শেষ দিকেই ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ F.Y. Edgeworth এ বিষয়ক ধারণার সূত্রপাত করেন এবং বিশ শতকের প্রথম দিকেই V. Pareto একে আরও বিকশিত করেন। এই পদ্ধতি সামনে নিয়ে আসবার ক্ষেত্রে আরও যাদের ভূমিকা প্রধান তারা হলেন: J.R. Hicks, R.G.D Allen প্রমুখ। এর মোদাকথা হলো: সংখ্যা দিয়ে উপযোগ পরিমাণ করা যায় না। উপযোগ পরিমাপের ক্ষেত্রে ক্রমনির্দেশ বা অবস্থানের তুলনামূলক নির্দেশনাই যথাযথ। অর্থাৎ একজন তার তৃপ্তি যখন প্রকাশ করে তখন সে তা কোনো সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে না। সে তার প্রকাশ করে অন্য আরেকটি পণ্য বা সেবা থেকে সে যে তৃপ্তি পায় তার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে। ভোক্তা বলে, “ক-এর চাইতে খ ভালো” বা “খ-এর চাইতে গ আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য”। সংখ্যার পরিবর্তে ভোক্তার তুলনামূলক বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিকেই বলা হয় ক্রমনির্দেশক পদ্ধতি। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে নিরপেক্ষ রেখার মাধ্যমে একজন ভোক্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থা প্রকাশ ও আলোচনাতে।

তিনটি অনুমিতি

ক্রমনির্দেশক পদ্ধতি তিনটি অনুমিতির উপর নির্ভরশীল। এগুলো হলো:

১. দুটো দ্রব্যের সমষ্টি (combination) থেকেই একজন ভোক্তা তার অগ্রাধিকার বা পছন্দ নির্ধারণ করতে পারবে।

২. ভোক্তার রুচি ধারাবাহিক (continuous) এবং সম্পর্কিতভাবে (transitive) অগ্রসর হয়। যেমন কোনো ভোক্তার কাছে যদি খ-এর তুলনায় ক এবং গ-এর তুলনায় খ বেশি পছন্দনীয় হয় তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, গ-এর তুলনায় ক বেশি পছন্দনীয়।
 ৩. ভোক্তার কাছে একটি পণ্যের পরিমাণ, কমের চাইতে অধিক বা নিকৃষ্টের চাইতে উন্নততর, অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- এই ক্রমনির্দেশক পদ্ধতিতেই আমরা পাই নিরপেক্ষ রেখার বিশ্লেষণ কাঠামো।

নিরপেক্ষ রেখা (Indifference Curve)

নিরপেক্ষ রেখা বস্তুতঃ একজন ভোক্তার পছন্দের ছক প্রদান করে। এই রেখা থেকে প্রথমত দুটো পণ্যের সেই সমষ্টিগুলো পাওয়া যায় যে সমষ্টিগুলোতে ভোক্তার উপযোগ সমান।

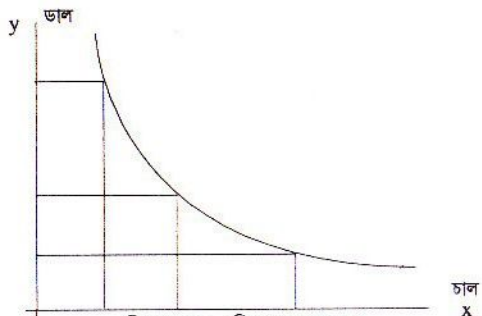
দ্বিতীয়ত এই রেখা থেকে বোঝা যায় একটি পণ্যের এক এককের বদলে অন্য পণ্যের কতটা ভোক্তার কাছে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ এই রেখার মাধ্যমে দুই পণ্যের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার অনুপাত নির্ধারণ করা যায়। আমরা যদি বিভিন্ন পণ্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে সমীকরণের মাধ্যমে দেখাই তাহলে দাঁড়ায়, $u=f(x,y,z,...)$ এবং সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রেখার সমীকরণ হবে $f(x,y,z,...)=k$, যেখানে k হলো ধ্রুবক।

তৃতীয়ত বিভিন্ন আয়ে পণ্য দুটোর বিভিন্ন রেখা নির্ধারণ করা যায়। যা থেকে পছন্দের ধারাবাহিকতার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

চতুর্থত নিরপেক্ষ রেখা একই উপযোগের বিভিন্ন সমষ্টি নির্দেশ করলেও তার সবগুলোর বাজার দাম যেহেতু এক নয়, সেহেতু সবগুলো সমষ্টি ভোক্তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতাকে বোঝার জন্য বাজেট রেখা আছে। নিরপেক্ষ রেখার সঙ্গে বাজেট রেখা মিলিয়ে আমরা পাই ভোক্তার ভারসাম্য বিন্দু। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভারসাম্য বিন্দুও পরিবর্তিত হতে থাকে। এই বিষয়ে আমরা পরে আরও আলোচনা করবো।

নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য

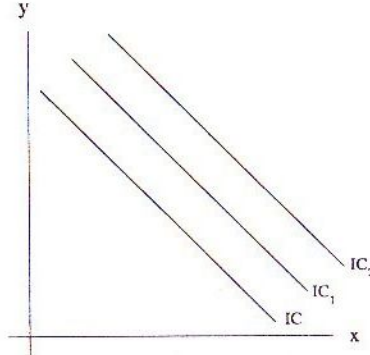
১. নিরপেক্ষ রেখা সবসময়ই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নেমে আসে।
২. এর ঢাল ঋণাত্মক হয়।
৩. নিরপেক্ষ রেখা মূল বিন্দুর দিকে কনভেক্স হয়।
৪. দুটো রেখা যেহেতু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উপযোগ নির্দেশ করে সেহেতু দুটো রেখা কখনোই মিলবে না, ছেদ করবে না।



চিত্র ২.১০: নিরপেক্ষ রেখা

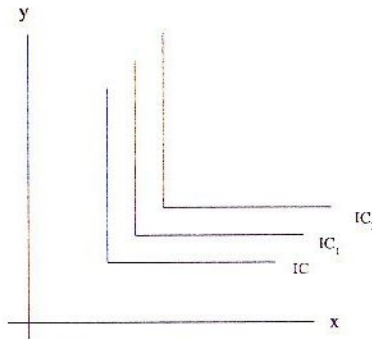
৫. যেহেতু ডান দিকের রেখাগুলো বাঁ দিকের রেখার চাইতে অধিকতর উপযোগ নির্দেশ করে সেহেতু ডান দিকের রেখাগুলো বাঁ দিকের রেখাগুলোর চাইতে উৎকৃষ্ট। কিংবা বাঁ দিকের রেখাগুলো ডানদিকের রেখাগুলোর চাইতে নিকৃষ্ট। উপরের চাল ও ডালের মধ্যে যেসব বিন্যাসে সমান উপযোগ পাওয়া যায় সেসব বিন্যাস বিন্দুকে যোগ করে একটি নিরপেক্ষ রেখা অঙ্কন করা হয়েছে।

বিশেষ ধরনের নিরপেক্ষ রেখা



চিত্র ২.১১: নিখুঁত বিকল্প

এটি হচ্ছে সেই ধরনের দুটো পণ্যের নিরপেক্ষ রেখা যেগুলো একটি অপরটির নিখুঁত বিকল্প। চা-কফি, কলম-পেন্সিল, শাট-ফতুয়া, সিঙ্গারা-পুরি ইত্যাদি এর কাছাকাছি উদাহরণ হতে পারে।



চিত্র ২.১২: নিখুঁত সম্পূরক দ্রব্য

এটি হচ্ছে সেই ধরনের দুটো পণ্যের নিরপেক্ষ রেখা যেগুলো একটি অপরটির নিখুঁত সম্পূরক। জুতার দুই পাটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

নিরপেক্ষ রেখার ঢাল

একজন ভোক্তার উপযোগ অপেক্ষক (Utility function) আমরা লিখতে পারি এভাবে, $u = u(x, y)$

একটি নিরপেক্ষ রেখার উপযোগ সমান থাকে বলে পূর্ণ অন্তরীকরণ করে তার সমান ০ ধরে আমরা পাই—

$$du \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = 0$$

সুতরাং এখান থেকে নিরপেক্ষ রেখার ঢাল পাচ্ছি

$$-\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial y}} = \frac{Mu_x}{Mu_y} = MRS_{xy}$$

এটিই হচ্ছে আয়/পরিবর্তের প্রান্তিক হার।

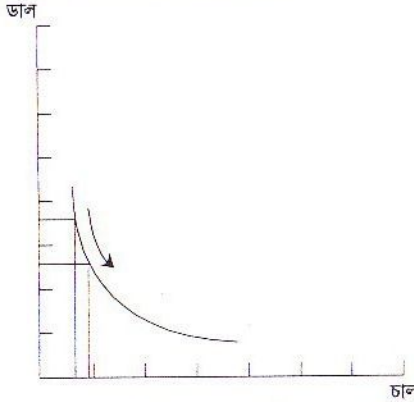
পরিবর্তের প্রান্তিক হার (Marginal rate of Substitution বা MRS)

একজন ভোক্তা দুটো পণ্যের মধ্যে কতগুলো বিনিমাস থেকে একই উপযোগ পাচ্ছে আমরা নিরপেক্ষ রেখার মাধ্যমে তার একটি চিত্র পাই। কিন্তু এই রেখার এই নির্দেশনার মধ্যে আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কও চিহ্নিত করতে পারি। এই রেখায় প্রতিটি বিন্দুই অন্য বিন্দুর চাইতে ভিন্ন একটি বিনিমাস নির্দেশ করে। এই নতুন বিনিমাসটি তৈরি হয় একদিকে একটি পণ্যের ভোগবৃদ্ধির মাধ্যমে অন্যদিকে অন্য আরেকটি পণ্যের ভোগ হ্রাস করবার মাধ্যমে। একটি পণ্যের ভোগবৃদ্ধি এবং অন্য পণ্যের ভোগ হ্রাস আলাদা আলাদাভাবে ঘটে না। একটি পণ্যের ভোগবৃদ্ধি ঘটে আরেকটি পণ্যের ভোগ হ্রাস করে। একটি পণ্যের এক একক পরিবর্তনের সঙ্গে আরেকটি পণ্যের কতটা পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা ভোক্তার আচরণ বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিরপেক্ষ রেখায় এই পরিবর্তের আপেক্ষিক অনুপাতটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। প্রত্যেক বিন্দুতে আমরা এই অনুপাতটি বের করতে পারি। এর মাধ্যমে যেহেতু যখন একটি পণ্যের এক একক পরিবর্তন হচ্ছে তখন আরেকটি পণ্যের কতটা পরিবর্তিত হচ্ছে তা প্রকাশিত হয়, সে কারণে একে বলা হয় পরিবর্তের প্রান্তিক হার। পরিবর্তের প্রান্তিক হারকে একই সঙ্গে নিরপেক্ষ রেখার ঢালও বলা যায়। Baumol-এর ভাষায়, “এটি হলো দুটো পণ্যের মধ্যে ভোক্তার মনস্তাত্ত্বিক বিনিময়ের হার।”^{১২} নিচের ছক থেকে আমরা তিনটি রেখায় দুটো পণ্যের আপেক্ষিক অবস্থান দেখছি। এবং প্রত্যেকটি রেখায় যে সমষ্টিগুলোর বিনিমাস আছে তাতে প্রত্যেকটি বিন্দুতে এক একক পণ্যের পরিবর্তে আরেকটি পণ্যের কত একক পাওয়া যাবে বা হারানো যাবে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়। এটাই পরিবর্তের বা বিকল্পের প্রান্তিক হার।

১২. William J. Baumol: *Economic Theory and Operations Analysis*, 4th edition, 1996, 195

ছক ৭: পরিবর্তের প্রান্তিক হার (পত্রাহ)

নিরপেক্ষ রেখা-১			নিরপেক্ষ রেখা-২			নিরপেক্ষ রেখা-৩		
পণ্য (x)	পণ্য (y)	প্রমাত্র (xy)	পণ্য (x)	পণ্য (y)	প্রমাত্র (xy)	পণ্য (x)	পণ্য (y)	প্রমাত্র (xy)
১	১০		৩	১০		৫	১২	
২	৫	৫	৪	৭	৩	৬	৯	৩
৩	৩	২	৫	৫	২	৭	৭	২
৪	২.৩	০.৭	৬	৪.২	০.৮	৮	৬.২	০.৮
৫	১.৭	০.৬	৭	৩.৫	০.৭	৯	৫.৫	০.৭
৬	১.২	০.৫	৮	৩.২	০.৩	১০	৫.২	০.৩
৭	০.৮	০.৪	৯	৩	০.২	১১	৫	০.২
৮	০.৫	০.৩	১০	২.৯	০.১	১২	১.৬	০.১
৯	০.৩	০.২						
১০	০.২	০.১						



চিত্র ২.১৩: পরিবর্তের প্রান্তিক হার

বিভিন্ন নিরপেক্ষ রেখায় প্রতি একক একটি পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্য কত একক ভোক্তার সমান উপযোগ রক্ষা করে সেটা থেকেই পরিবর্তের প্রান্তিক হার পাওয়া যায়।

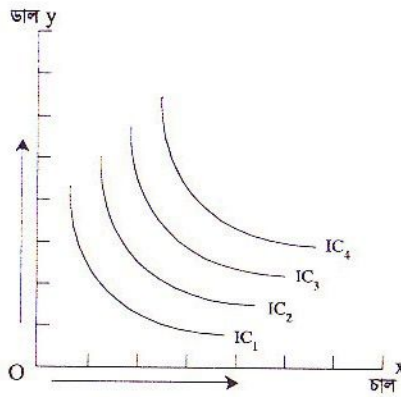
নিরপেক্ষ মানচিত্র (Indifference Map)

বিভিন্ন সময়ে একজন ভোক্তার যেহেতু আয়, রুচি, অগ্রাধিকার ইত্যাদিতে পরিবর্তন আসে সেহেতু তার নির্দিষ্ট দুটো পণ্যের থেকে প্রাপ্ত উপযোগের ক্ষেত্রও এক জায়গায় স্থির থাকে না। ভোক্তাকে তাই একটি নয় অনেকগুলো নিরপেক্ষ রেখার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। এই বিভিন্ন রেখা থেকে প্রকৃতপক্ষে ভোক্তার ক্রম-উন্নত অবস্থানকে নির্দেশ করা যায়। আয় বৃদ্ধির কারণে ভোক্তার নিরপেক্ষ রেখা এভাবে ডানদিকে সরে যেতে পারে। একটি চিত্রে আমরা যখন ভোক্তার এরকম একাধিক নিরপেক্ষ রেখা

উপস্থিত করি তখন তাকে বলা হয় নিরপেক্ষ মানচিত্র।

নিরপেক্ষ মানচিত্রে এই বিভিন্ন নিরপেক্ষ রেখা যখন ভোক্তার বিভিন্ন উপযোগের সমষ্টি সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয় তখন পাশাপাশি আমরা যদি এর সঙ্গে ভোক্তার বাজেট রেখা যোগ করি তাহলে পাই বিভিন্ন আয়ে একজন ভোক্তার ভারসাম্য বিন্দু। যেটি ভোক্তার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দুটো পণ্যের মধ্যে তার পছন্দের পরিবর্তনের ধরনটিকেও পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করে।

নিচের চিত্রে আমরা ভোক্তার বিভিন্ন উপযোগ নির্দেশকারী কয়েকটি নিরপেক্ষ রেখা পাচ্ছি যা থেকে গঠিত হচ্ছে নিরপেক্ষ মানচিত্র।



চিত্র ২.১৪: নিরপেক্ষ মানচিত্র

সারসংক্ষেপ

ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুইভাবে উপযোগ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। এর একটি হলো সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ, অন্যটি হলো পণ্যের উপযোগের তুলনামূলক আলোচনা। নিরপেক্ষ রেখার মাধ্যমে দুই পণ্যের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার অনুপাত নির্ধারণ করা যায়। বিভিন্ন নিরপেক্ষ রেখায় প্রতি একক একটি পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্য কত একক ভোক্তার সমান উপযোগ রক্ষা করে সেটা থেকেই পরিবর্তের প্রান্তিক হার পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

ভোক্তার ভারসাম্য Consumer Equilibrium

প্রদত্ত বাজেট ব্যয়ে ভোক্তা উপযোগ সর্বোচ্চ করতে চায় কিন্তু এই চাওয়া দিয়ে সবসময় কাজ হয় না। বাজার অর্থনীতিতে উপযোগ সর্বোচ্চ করতে গেলে ব্যয়ও বাড়াতে হয়। আবার ব্যয় কমাতে চাইলে দ্রব্য ক্রয় অর্থাৎ উপযোগ বাড়ানো সম্ভব হয় না। সেজন্য ভোক্তার নিজের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে যথাসম্ভব বেশি তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করে। সেটাই উপস্থিত করে ভোক্তার ভারসাম্য বিন্দু। এই ভারসাম্য এক জায়গায় স্থির থাকে না। আয়, দাম, রুচি পরিবর্তন ইত্যাদি দিয়ে ভারসাম্যেরও পরিবর্তন হয়। এই অধ্যায়ে এসব বিষয়ই আলোচনা হবে।

বাজেট রেখা ও ভোক্তার ভারসাম্য

একজন ভোক্তা দুটো পণ্যের আনুপাতিক কি কি বিনিমাস থেকে একই উপযোগ পায় তা আমরা জানতে পারি নিরপেক্ষ রেখা থেকে। কিন্তু এই উপযোগ পেলেও একজন ভোক্তা ইচ্ছা করলেই পণ্য দুটোর যেকোনো বিনিমাসে ভোগ করতে পারে না। কারণ সকল রকম বিনিমাসের বাজার দর একরকম নয়, আর আর ভোক্তার আয়ও সীমাবদ্ধ। বাজেট রেখা নিরপেক্ষ রেখার যে বিন্দুতে স্পর্শ করে সেখানেই আমরা পাই ভোক্তার ভারসাম্য। ভোক্তার আয় যখন বাড়ে তখন তার বাজেট রেখা ডান দিকে স্থানান্তরিত হয়। বাজেট রেখা ডানদিকে সরে গিয়ে স্পর্শ করে ভোক্তার আগের চাইতে উচ্চতর উপযোগ নির্দেশকারী উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখাকে। ভোক্তা উপস্থিত হয় নতুন ভারসাম্যে।

বাজেট রেখায় ভোক্তার সেই আয় নির্দেশ করা থাকে যেটি দিয়ে ভোক্তা ঐ নির্দিষ্ট দুটো পণ্য ক্রয় করে। রেখা খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভোক্তা যদি তার পূর্ণ বাজেট একটি পণ্যের পেছনে খরচ করে তাহলে একটি চূড়ান্ত বিন্দু পাই, আবার অন্য পণ্যের পেছনে পুরো বাজেট খরচ করলে আরেকটি চূড়ান্ত বিন্দু পাই। এর মাঝামাঝি থাকে বিভিন্ন বিন্দু যেখানে দুটো পণ্যের সেসব বিনিমাস ভোক্তা ক্রয় করবে যেগুলো তার বাজেট দিয়ে ক্রয় করা সম্ভব।

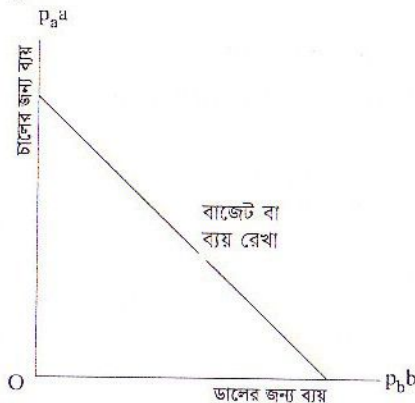
বাজেট রেখার জন্য কয়েকটি শর্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. এটি হবে একটি সরলরেখা।
২. এই রেখার ঢাল হবে ঋণাত্মক।
৩. এর ঢাল হবে দুটো পণ্যের দামের অনুপাতের ঋণাত্মক বিপরীত। অর্থাৎ $\Delta a/\Delta b = p_b/p_a$ যেখানে দুটো পণ্য হলো a এবং b আর p_a এবং p_b হলো

যথাক্রমে পণ্য দুটোর দাম।

৪. দুটো বাজেট রেখায় যখন পণ্যের একই দাম দেখা যাবে কিন্তু মোট ব্যয় দেখা যাবে একটি থেকে আরেকটি বেশি তখন বোঝা যাবে একটির সঙ্গে অন্য রেখা সমান্তরাল।

$$p_a a + p_b b = m$$



চিত্র ৩.১: বাজেট রেখা

এখানে $p_a a$ হল a পণ্যের একক প্রতি দাম এবং মোট এককের সংখ্যার গুণফল, আর $p_b b$ হল b পণ্যের একক প্রতি দাম এবং মোট এককের সংখ্যার গুণফল; পাশাপাশি m হল ভোক্তার মোট ব্যয় বাজেট যা পুরো রেখা জুড়েই অভিন্ন থাকে। এই সমীকরণকে আমরা আরও এগিয়ে নিতে পারি এভাবে:

প্রথমে আমরা পুরো সমীকরণকে p_a দিয়ে ভাগ করি এবং তাকে নিম্নরূপে বিন্যস্ত করি:

$$\frac{p_a a}{p_a} + \frac{p_b b}{p_a} = \frac{m}{p_a}$$

$$\text{অথবা } a = -\frac{p_b b}{p_a} + \frac{m}{p_a}$$

আমরা এখন যদি a কে y , P_b/P_a কে g , b কে x এবং m/p_a কে h ধরি তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়, $y = -gx + h$

যা আসলে একটি নিম্নগামী ঢালসম্পন্ন সরলরেখার সমীকরণ। এখানে সরলরেখার ঢাল হচ্ছে $-P_b/P_a$

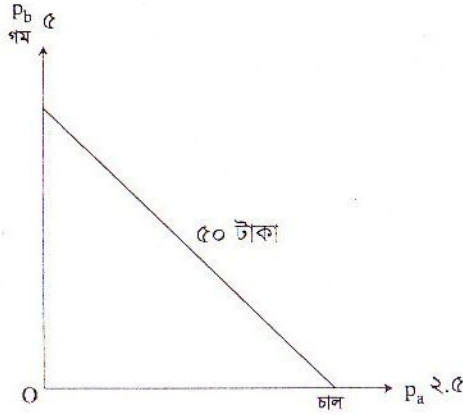
বিভিন্ন বাজেট

নিচে আমরা এক বা একাধিক ভোক্তার বিভিন্ন বাজেট এবং সেই বাজেটগুলিতে বিভিন্ন বিন্যাস লক্ষ্য করি।

দৃশ্য ১: আয় ৫০ টাকায়

চাল/দাম: ২০ টাকা কেজি

গম/দাম : ১০ টাকা কেজি

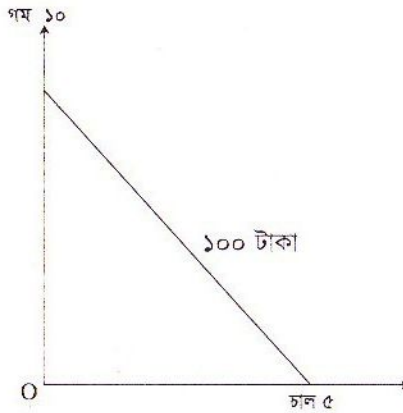


চিত্র ৩.২: ৫০ টাকা বাজেটে বিভিন্ন সম্ভাব্য বিন্যাস

দৃশ্য ২: আয় ১০০ টাকায় দুটো দ্রব্যের পরিমাণ

চাল/দাম: ২০ টাকা কেজি

গম/দাম : ১০ টাকা কেজি



চিত্র ৩.৩: আয় ১০০ টাকায় সম্ভাব্য বিন্যাস

ভোক্তার ভারসাম্য

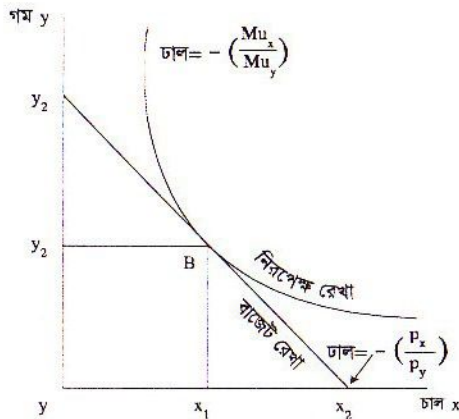
ভোক্তার নিরপেক্ষ রেখার সবগুলো বিন্দুতে সমান উপযোগ থাকলেও তার সবগুলো বিন্যাস ভোক্তা নিজের জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করে না। এর কারণ ভোক্তাকে এগুলো কিনতে হয় এবং কিনতে হলে তার উপযোগ প্রাপ্তির পর প্রধান বিবেচনার বিষয় তার বাজেট। বাজেট এখানে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, নিরপেক্ষ রেখার সবগুলো বিন্দুতে উপযোগ সমান থাকলেও তার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ এক নয়। সুতরাং একই উপযোগ কার্যকরভাবে পাবার জন্য ভোক্তা সেই বিন্যাসটি সন্ধান করবে যে বিন্যাস তার বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রেখায় দেখলে আমরা সেই বিন্যাসটি পাবো নিরপেক্ষ রেখার সেই বিন্দুতে যেখানে বাজেট রেখা নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করেছে। নিচের চিত্রে নিরপেক্ষ রেখা ও বাজেট রেখা থেকে আমরা ভারসাম্য বিন্দু বের করছি। ভারসাম্য বিন্দু e তে নিরপেক্ষ রেখার ঢাল ও প্রদত্ত বাজেট রেখার ঢাল পরস্পর সমান। অর্থাৎ e বিন্দুতে,

$$-\left(\frac{Mu_x}{Mu_y}\right) = -\left(\frac{P_x}{P_y}\right)$$

$$\text{অর্থাৎ } \left(\frac{Mu_x}{Mu_y}\right) = \left(\frac{P_x}{P_y}\right)$$

$$\text{বা, } \left(\frac{Mu_x}{P_x}\right) = \left(\frac{Mu_y}{P_y}\right)$$

পূর্ব অধ্যায়ে এই সম্পর্ককেই আমরা সমপ্রাপ্তিক উপযোগ বিধি বলে উল্লেখ করেছি। e বিন্দুতে ভোক্তা x পরিমাণ চাল ও y পরিমাণ গম ক্রয়ের মাধ্যমে উপযোগ সর্বোচ্চ করে। মার্শাল উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাণের আলোকে যে বিধি বের করেছেন, হিকস এলেনের ordinal বা ক্রমনির্দেশক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা ভোক্তার ভারসাম্য



চিত্র ৩.৪: ভারসাম্য বিন্দু

নির্ধারণে একই বিধির নির্দেশ করলাম। ক্রমনির্দেশক পদ্ধতি উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাপের পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়। উপযোগ বস্তুতঃ মনস্তাত্ত্বিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরপেক্ষ রেখার সাহায্যে ভোক্তার ভারসাম্য নির্ণয় ভোক্তার কথিত যৌক্তিক আচরণের উপর নির্ভর করে।

সারসংক্ষেপ

বাজেট রেখায় ভোক্তার সেই আয় নির্দেশ করা থাকে যা দিয়ে ভোক্তা নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে। বাজেট গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, নিরপেক্ষ রেখার সবগুলো বিন্দুতে উপযোগ সমান থাকলেও তার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ ভিন্ন ভিন্ন হয়। সুতরাং একই উপযোগ কার্যকরভাবে পাবার জন্য ভোক্তা সেই বিন্যাসটি সন্ধান করবে যে বিন্যাস তার বাজেটের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আয়-ভোগ রেখা (Income-Consumption Curve)

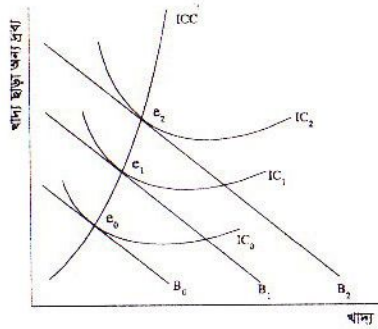
ভোক্তার আয়, তার উপযোগ, বাজারে পণ্যের যোগান এবং তার দাম কোনোকিছুই অপরিবর্তনীয় নয়। সবকিছুর পরিবর্তনকে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিবেচনা করে তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি। এখানে যদি বিভিন্ন নিরপেক্ষ রেখা বিচার করি তাহলে আমরা সেখান থেকে বুঝতে পারি একজন ভোক্তার উপযোগের বিভিন্ন মাত্রা ও তাতে দুটো পণ্যের বিভিন্ন বিন্যাস। আমরা যদি বিভিন্ন সমান্তরাল বাজেট রেখা দেখি সেখান থেকে একজন ভোক্তার সম্ভাব্য আয় পরিবর্তনের সাথে তার ব্যয়ের ইচ্ছার চিত্র পাই।

ভোক্তার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তার বাজেট রেখা ডানদিকে সরে যায় এবং উচ্চতর উপযোগ নির্দেশকারী নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করে। ভোক্তা সেই বিন্দুটি গ্রহণ করলে উপনীত হয় নতুন ভারসাম্যে। ভোক্তার আয় পরিবর্তনের সাথে সাথে তার ভারসাম্য অবস্থান নির্দেশকারী এই বিন্দুগুলোকে আমরা যদি যুক্ত করি তাহলে আমরা আরেকটি রেখা পাই। একেই বলে আয়-ভোগ রেখা। এই রেখা ভোক্তার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তার ভোগের পরিবর্তন এবং উচ্চতর উপযোগ সন্ধানের চিত্রটি নির্দেশ করে। এই রেখা থেকে আমরা বুঝতে পারি ভোক্তা তার আয় পরিবর্তনের সাথে সাথে কী ধরনের ভোগ অনুপাত গ্রহণ করতে অগ্রহী। তার ফলে এই রেখা ভোক্তার আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ করে।

এই আয়-ভোগ রেখার নির্দিষ্ট সম্পর্কেই অনেক সময় এঞ্জেল রেখা বলা হয়। এই রেখা একজন জার্মান পরিসংখ্যানবিদ আর্নস্ট এঞ্জেল (Ernst Engel)-এর (১৮২১-১৮৯৬) নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি ১৫৩ জন বেলজীয় পরিবারের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, একটি পরিবারের আয় যত কম, খাদ্যের পেছনে ব্যয়ের অনুপাত তার তত বেশি। পরবর্তী আরও অনেক গবেষণায় তাঁর এই ফলাফল সমর্থিত হয়েছে। এখান থেকেই আমরা পাই এঞ্জেল বিধি যাতে বলা হয় যে, একটি পরিবারের আয় যত কম হয় তার খাদ্যের পেছনে ব্যয়ের অনুপাত তত বেশি। এখান থেকে কথটি এভাবেও বলা যায় যে, একটি পরিবারের আয় যখন বাড়তে থাকে তখন খাদ্য বা টিকে থাকার সামগ্রীর পেছনে ব্যয়ের অনুপাত কমতে থাকে।

১৮৬০ সালের আগে পরপর কয়েক বছরে প্রথম তিনি প্রাশিয়ায় ফসল যোগান ও দামের উপর এক সমীক্ষা পরিচালনা করেন যা পরবর্তীতে দাম ও যোগানের সম্পর্ক নিয়ে সূত্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

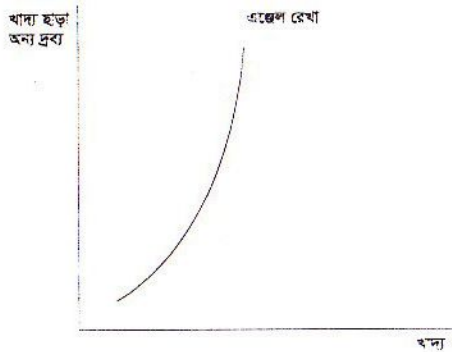
এখানে আমরা একদিকে খাদ্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য ও অন্যদিকে খাদ্য নির্দেশক



চিত্র ৩.৫: আয় ভোগ রেখা

নিরপেক্ষ রেখা ও বাজেট রেখা উপস্থিত করছি। নিরপেক্ষ রেখায় দেখা যাচ্ছে খাদ্য ও খাদ্য ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য বিভিন্ন বিন্যাস থেকে একই উপযোগ কোন রেখায় আছে। এভাবে পরপর তিনটি নিরপেক্ষ রেখা আছে। পরপর তিনটি বাজেট রেখায় দেখানো হয়েছে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের পেছনে পরপর তিনটি বাজেট বিন্যাস। বাজেট রেখায় বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন ব্যয়ের বিন্যাস ভোক্তার পক্ষে খরচ করা সম্ভব। e_0, e_1, e_2 তে তিনটি ভারসাম্য বিন্দু, যা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তার অবস্থান পরিবর্তন নির্দেশ করে। এগুলো যোগ করলেই আমরা পাই আয়-ভোগ রেখা (ICC)।

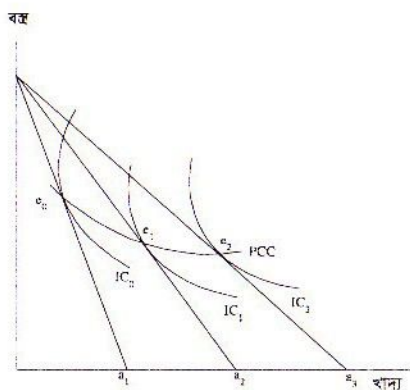
এখানে আমরা দেখছি আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তার খাদ্যের পেছনে ব্যয়ের অনুপাত কমে আসছে। পূর্ববর্তী চিত্র বিশ্লেষণ দিয়েই আমরা এটি দাঁড় করাতে পারি।



চিত্র ৩.৬: এঙ্গেল রেখা

দাম-ভোগ রেখা (Price-Consumption Curve)

আয়-ভোগ রেখায় আমরা দেখেছি, কীভাবে একজন ভোক্তার আয় বৃদ্ধি তার বাজেট রেখাকে সমান্তরালভাবে পরিবর্তিত করে। বাজেট রেখার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে



চিত্র ৩.৭: দাম-ভোগ রেখা

নতুন নতুন নিরপেক্ষ রেখার সঙ্গে তার ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং সেই ভারসাম্য বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা পাই আয়-ভোগ রেখা। এই অবস্থানটি দেখা দেয় তখনই যখন ভোক্তার আয়ের পরিবর্তন ঘটে।

এখন আমরা যদি ভিন্ন একটি পরিস্থিতির কথা চিন্তা করি যেখানে ভোক্তার আয়ের পরিবর্তন হচ্ছে না, কিন্তু কোনো একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হচ্ছে, তাহলে সেখানেও আমরা দেখাবো ভারসাম্য বিন্দুর পরিবর্তন। এক্ষেত্রে একটি পণ্যের দাম কমলে বাজেট রেখা তখন তার দিকে হেলে পড়বে এবং সেই পণ্য আরও বেশি ক্রয় করা সম্ভব হবে। এতে ভোক্তা নতুন একটি ভারসাম্য বিন্দুতে পৌঁছবে। এভাবে প্রত্যেকবার দাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন ভারসাম্য বিন্দুর উদ্ভব ঘটবে। এই ভারসাম্য বিন্দুগুলির যাত্রাপথ থেকে ভোক্তার আরেকটি পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই বিন্দুগুলি যুক্ত করে আমরা যে রেখা পাই তাকেই বলে দাম-ভোগ রেখা। উপরের চিত্রটি থেকে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারি।

চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি খাদ্যের দাম হ্রাস পাবার ফলে বাজেট লাইন ডানদিকে হেলে যাচ্ছে এবং এই বাজেটের মধ্যে অধিক থেকে অধিকতর খাদ্য ক্রয় সম্ভব হচ্ছে। এই অবস্থার কারণে নতুন নতুন ভারসাম্য বিন্দু পাওয়া যাচ্ছে। দাম কমে যাবার ফলে ভারসাম্য বিন্দু e_0 থেকে e_1 ও তারপর e_2 তে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এই বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা পাই দাম-ভোগ রেখা।

সারসংক্ষেপ

আয়-ভোগ রেখা ভোক্তার আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তার ভোগের পরিবর্তন এবং উচ্চতর উপযোগ সন্ধানের চিত্রটি নির্দেশ করে। এর মধ্যে দিয়ে যে পরিবর্তন হয় তার নির্দিষ্ট ধরনই আমরা এঞ্জেল বিধি ও এঞ্জেল রেখা দ্বারা জানতে পারি। দাম-ভোগ রেখা কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সাথে তার ভোগের পরিবর্তন দেখায়।

আয় প্রভাব (Income effect)

দামের পরিবর্তনের প্রভাবে যখন ভোক্তার চাহিদার পরিবর্তন হয় তখন এই পরিবর্তনের পেছনে যে দুটো প্রভাব কাজ করে তা অনেক সময় অনুভব করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন অনুসন্ধান বা গবেষণাতেই দেখা গেছে যে, দামের পেছনে দুটো প্রভাব বিভিন্ন মাত্রায় সক্রিয়। এই প্রভাব দুটোর একটি হলো পরিবর্ত বা বিকল্প প্রভাব (substitution effect)। কারণ সরল দৃষ্টিতেই আমরা দেখি যে, কোনো পণ্যের দামের যখন পরিবর্তন হয় তখন তা তার বিকল্প দ্রব্যের চাহিদার উপর সরাসরি প্রভাব সৃষ্টি করে। যে পণ্যের দাম কমে তার চাহিদা বেড়ে যায় অন্যটির তুলনায়। এটা হয় আপেক্ষিক দাম প্রভাব (relative price effect)-এর জন্য।

দ্বিতীয়টি হলো আয় প্রভাব (Income effect)। কেননা, অন্যদিকে আমরা এটাও দেখি যে, যে কোনো পণ্যের দাম যখন পরিবর্তন হয় তখন ভোক্তার প্রকৃত আয় বাড়ে, দাম বাড়লে ভোক্তার প্রকৃত আয় কমে।

আমরা বিষয়টি সহজভাবে বোঝার জন্য দুটো পণ্য বিবেচনা করি। ধরা যাক, চাল ও গম। দুটোর বিভিন্ন বিন্যাস, যেগুলো থেকে সমান উপযোগ পাওয়া যায়, তা নিরপেক্ষ রেখায় আমরা সহজেই দেখতে পারি। আগেই আমরা দেখলাম, বাজেট রেখার মাধ্যমে এখানে ভোক্তার আর্থিক অবস্থান ও ভারসাম্য অবস্থাও দেখানো হয়। এখন যদি কোনো পণ্যের দাম বাড়ে তাহলে সে পণ্যের চাহিদা কমবে বলে আমরা জানি। কিন্তু এই চাহিদা কমে যাবার পেছনেই সবার অলক্ষ্যে কাজ করবে দুটো প্রভাব: আয় ও পরিবর্ত প্রভাব।

ধরা যাক চালের দাম বেড়েছে। চালের দাম যদি কেজি প্রতি ২২ থেকে ২৫ টাকা হয় তাহলে এর ফলে ভোক্তার একই পরিমাণ চাল কেনার জন্য বেশি টাকা খরচ করতে হবে। অর্থাৎ নিজের পুরনো আয় দিয়ে তার বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ের যে ক্ষমতা ছিল তা চালের দাম বৃদ্ধির ফলে কমে যাবে। আবার অন্যদিকে চালের দাম যদি কমে, ধরা যাক ২৫ টাকা থেকে ২২ টাকা হলে, তাহলে একই পরিমাণ চাল কেনার জন্য ভোক্তাকে আগের চাইতে কম টাকা খরচ করতে হবে। অর্থাৎ নিজের আগের আয় দিয়েই বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ের যে ক্ষমতা তার আগে ছিল, তা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাবে। এভাবে কোনো পণ্যের দাম কমে গেলে বা বেড়ে গেলে, অর্থাৎ দামের ক্ষেত্রে কোনোরকম পরিবর্তন হলে তা ভোক্তার প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাবিত করে। একেই সংক্ষেপে বলে 'আয় প্রভাব'। ভোক্তা তার আয়ের উপর এই প্রভাবের ধরন অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে।

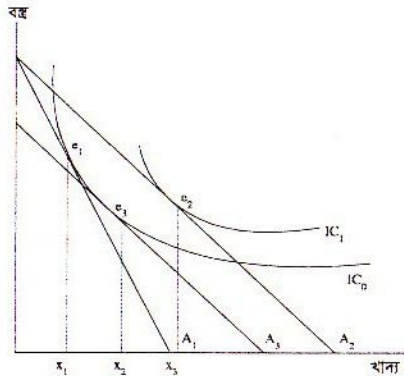
পরিবর্ত প্রভাব (Substitution effect)

কোনো পণ্যের দাম কমলে একজন ভোক্তা কী করবে? সে তখন তা বেশি ভোগ করতে পারে। তাহলে আপেক্ষিকভাবে সেই পণ্যের উপর তার জোর পড়বে বেশি। কিংবা যে পণ্যের দাম বাড়বে তা কমিয়ে ভোক্তা বিকল্প যে পণ্য আছে তা অধিক হারে ক্রয়ের দিকেও যেতে পারে। এভাবে আমরা দেখি কোনো পণ্যের দাম কমলে অন্য পণ্যের বিকল্প হিসেবে তাকে গ্রহণ করে তার ভোগ বৃদ্ধি কিংবা ঐ পণ্যের দাম বাড়লে তার বদলে বিকল্প পণ্যের দিকে গমন একজন ভোক্তার স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে দেখা যায়। দামের পরিবর্তনে বিকল্প পণ্যের দিকে ভোক্তার ঝুঁকে পড়ার প্রভাবকেই সংক্ষেপে বলা হয়: পরিবর্ত প্রভাব।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন চালের দাম বাড়ে তখন ভোক্তা বিকল্প পণ্য, এখানে গমের, ক্রয় বাড়িয়ে এবং চালের দাম কমলে গম ক্রয় কমিয়ে আরও বেশি চাল কিনে পরিস্থিতি মোকাবিলায় চেষ্টা করে। যেকোনো পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও হ্রাস পেলে বিকল্প পণ্যের চাহিদার উপর তার প্রভাবকেই এক কথায় পরিবর্ত প্রভাব বলে। দাম পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট পরিবর্ত প্রভাব সম্পর্কে যারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তারা হলেন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হিক্স (John R. Hicks) এবং রাশিয়ান অর্থনীতিবিদ স্লাটস্কি (Eugene Slutsky)।^{১০}

হিক্স ও স্লাটস্কি ব্যাখ্যা

নিচের চিত্র থেকে হিক্সীয় পদ্ধতিটি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। হিক্স দেখিয়েছেন, কোনো একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনে ভোক্তার উপর যে আয় ও পরিবর্ত



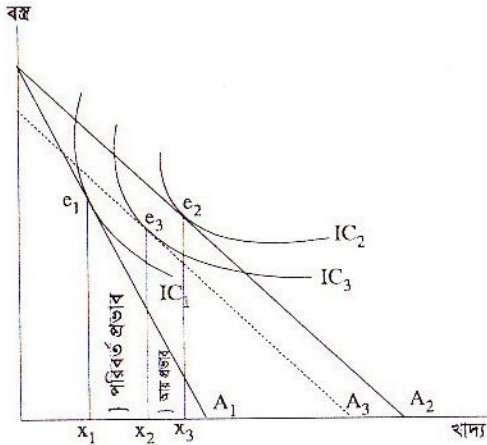
চিত্র ৩.৮: দাম পরিবর্তনের পরিবর্ত ও আয়প্রভাব: হিক্সীয় পদ্ধতি

১০. এ বিষয়ে তাঁদের ব্যাখ্যা প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে John R. Hicks : *Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory*, London, 1946 হচ্ছে এবং Eugene Slutsky: "On the Theory of the Budget of the Consumer", ১৯৫২ প্রবন্ধে।

প্রভাব পড়ে তাতে বাজেট রেখা পরিবর্তিত হয় এবং সে নতুন একটি নিরপেক্ষ রেখার সঙ্গে ভারসাম্যে উপনীত হয়। কিন্তু এই সঙ্গে হিকস এটাও প্রশ্ন তুলছেন যে, যদি দাম পরিবর্তনে প্রকৃত আয়ের উপর কোনো প্রভাব না পড়ে তাহলে কী হবে তাহলে তিনি বলেছেন, ভোক্তা আগের নিরপেক্ষ রেখাতেই অন্য বিন্দুতে ভারসাম্য স্থাপন করবে। নিচের চিত্রে আমরা দেখছি, IC_0 নিরপেক্ষ রেখা ও A_1 বাজেট রেখায় ভারসাম্য বিন্দু ছিল e_1 । খাদ্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বাজেট রেখা A_1 থেকে A_2 -তে উপনীত হয়েছে। ফলে ভোক্তা নতুন নিরপেক্ষ রেখায় উন্নীত হয়েছে। এবং ভারসাম্য বিন্দু সৃষ্টি হয়েছে e_2 -তে। হিকস এখানে বলছেন, যদি খাদ্যের দাম পরিবর্তনে আয়ের উপর প্রভাব শূন্য হয় তাহলে ভারসাম্য বিন্দু e_2 -তে না হয়ে e_3 -তে হবে। যা থেকে শুধু পরিবর্ত প্রভাব পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে আয় প্রভাব যোগ হলেই ভোক্তা e_2 -তে স্থিত হতে পারবে।

এই বিষয়ে স্লাটস্কি বলেছেন, একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে যে আয় ও পরিবর্ত প্রভাব পড়ে তার কারণে বাজেট রেখা বদলে যায় এবং ভোক্তা নতুন নিরপেক্ষ রেখায় ভারসাম্য স্থাপন করে। স্লাটস্কিও আয় ও পরিবর্ত প্রভাবকে আলাদা করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, যদি দাম পরিবর্তনে আয় প্রভাব নেই ধরা হয় তাহলেও পরিবর্ত প্রভাবের কারণেই ভোক্তা নতুন নিরপেক্ষ রেখায় যেতে পারে। নিচের চিত্রে আমরা তা দেখছি।

স্লাটস্কি পরিবর্ত প্রভাবকে আয় প্রভাব থেকে আরও স্পষ্টভাবে আলাদা করে দেখিয়েছেন। খাদ্যদ্রব্যের দাম হ্রাসের ফলে বাজেট রেখা A_1 থেকে A_2 -তে গেল। ভোক্তা নতুন নিরপেক্ষ রেখার সাথে নতুন ভারসাম্য বিন্দু e_2 -তে পৌঁছালো e_1 থেকে।



চিত্র ৩.৯: দাম পরিবর্তনের পরিবর্ত ও আয় প্রভাব: স্লাটস্কীয় পদ্ধতি

এখন এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে থেকে যদি আয় প্রভাব বাদ দেওয়া যায় তাহলেও,

স্লাটস্কির মতে, শুধু পরিবর্ত প্রভাব দিয়েই উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় ভারসাম্য পেতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারসাম্য হবে e_3 বিন্দুতে।

দাম কমলে কোনো দ্রব্যের চাহিদার উপর আয় ও পরিবর্ত প্রভাব কীভাবে পড়বে তা নির্ভর করে দ্রব্যটি কেমন তার উপর। দ্রব্যের ধরনের উপর তার মোট প্রভাবও নির্ধারিত হবে। নিচের ছকে আমরা এর সারসংক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি।

ছক ১: দাম কমলে কোনো দ্রব্যের চাহিদার উপর আয় ও পরিবর্ত প্রভাব

সারসংক্ষেপ

দ্রব্যের ধরন	পরিবর্ত প্রভাব	আয় প্রভাব	মোট প্রভাব
সাধারণ	বাড়বে	বাড়বে	বাড়বে
নিকৃষ্ট (গিফেন নয়)	বাড়বে	কমবে	বাড়বে
গিফেন	বাড়বে	কমবে	কমবে

কোনো পণ্যের দামের ক্ষেত্রে কোনো রকম পরিবর্তন হলে তা ভোক্তার আয় বা ক্রয়ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাবিত করে। একে বলে আয় প্রভাব। অন্যদিকে দামের পরিবর্তনে বিকল্প পণ্যের দিকে ভোক্তার ঝুঁকে পড়ার প্রভাবকে পরিবর্ত প্রভাব বলে। অবশ্য দাম কমলে কোনো দ্রব্যের চাহিদার উপর আয় ও পরিবর্ত প্রভাব কেমন হবে, সেটা নির্ভর করে ঐ দ্রব্যের ধরনের উপর।

চতুর্থ অধ্যায়

চাহিদার মাত্রা ও নমনীয়তা Degree of Demand and Elasticity

‘অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে’ চাহিদার সঙ্গে দামের বিপরীত সম্পর্কের কথা আমরা জানি। কিন্তু দাম পরিবর্তনে চাহিদার এই পরিবর্তন সকল পণ্যের জন্য যেমন এক নয়, সকল আয়গোষ্ঠীর কাছেও দামের পরিবর্তনে একইভাবে চাহিদার পরিবর্তন হয় না। এই বিষয়টি সূক্ষ্ম কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে এটি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আমরা এর বিভিন্ন দিক আলোচনা করবো।

নমনীয়তা (Elasticity)^{১৪}

আমরা সবাই জানি, অন্যান্য সব শর্ত যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে একটি পণ্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়েবে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে আবার একটি পণ্যের দাম

১৪. Elasticity শব্দের অর্থ হিসেবে এখানে আমি ব্যবহার করেছি নমনীয়তা। আমার জানামতে এই শব্দের ব্যবহার প্রথম করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. হরেন্দ্র কান্তি দে। সাধারণভাবে Elasticity শব্দের বাংলা হিসেবে ‘স্থিতিস্থাপকতা’ শব্দটি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা দু’অঞ্চলেই বহুল প্রচলিত। এই শব্দ ব্যবহারে আমি প্রথম আপত্তি শুনি বাংলাদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমানের কাছে। অমর্ত্য সেনও এই শব্দের ব্যবহারে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে লিখিতভাবেই তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘অর্থনীতিতে Elasticity-র ব্যবহার হয় এক জিনিসের প্রভাব অন্য জিনিসের উপর কত তার পরিমাপ হিসেবে। যেমন, দামের প্রভাব চাহিদার পরিমাপের উপর কতটা সে মাপ প্রকাশ করে price elasticity of demand। ইংরেজি Elasticity শব্দের এই অর্থ পদার্থবিদ্যায় Elasticity-র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নূরুজ্জামান বাংলা অর্থনীতিতে পদার্থবিদ্যার অনুগত্যে Elasticity-র অনুবাদ করা হয়েছে ‘স্থিতিস্থাপকতা’। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ অনুবাদ সম্পূর্ণ পরিহার্য। পদার্থবিদ্যার পাঁচটে বড় হওয়ার প্রচেষ্টা অর্থনীতিতে অবশ্য নতুন নয়। যেমন অঙ্কের ব্যবহারে mathematical logic উপেক্ষা করে calculus differential equations-এর সামগ্রিক প্রয়োগ পদার্থবিদ্যার অনুকরণেই অর্থনীতিতে সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু Elasticity-র দুই অর্থের বিশ্লেষণ খুবই আশ্চর্যজনক’ (জীবনযাত্রার অর্থনীতি, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ২২)। অমর্ত্য সেন যে বাংলা শব্দ প্রস্তাব করেছেন সেটি হলো ‘প্রভাব গ্রাহকতা’। কিন্তু আমি মনে করি নমনীয়তা শব্দটি তুলনায় সহজ কিন্তু অর্থের প্রতি যথাধর্ম অনুগত। তবে এই শব্দ আরেকটি ইংরেজি শব্দ flexibility-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। সতর্ক থাকলে এ সমস্যা থেকে দূরে থাক সম্ভব।

কমলে যোগান কমবে এবং দাম বাড়লে যোগান বাড়বে। কিন্তু চাহিদা, যোগান ও দামের এতটুকু সম্পর্ক দিয়েই একদিকে দাম এবং অন্যদিকে চাহিদা ও যোগান এই দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের পুরোটা বোঝা যায় না। কারণ, দাম কমলে সাধারণভাবে সব পণ্যের চাহিদা বাড়লেও দাম কমার হারের সঙ্গে সব জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধির হার এক নয়। আবার দাম বাড়লে সাধারণভাবে সব পণ্যের চাহিদা কমলেও দাম বাড়ার হারের সঙ্গে সব পণ্যের চাহিদা হ্রাসের হার এক নয়। যোগানের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটে। দাম পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের হারের ক্ষেত্রে এই যে বিভিন্ণতা, এক্ষেত্রে একটি পণ্যের সঙ্গে অন্যটির যে পার্থক্য দেখা যায় তা ভোক্তার আচরণ বোঝার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্যই নমনীয়তা বা Elasticity ধারণা ব্যবহার করা হয়। নমনীয়তা দিয়ে তাই পরিমাপ করা হয় দাম বা আয় পরিবর্তনের হারের সঙ্গে ভোক্তার চাহিদা বা যোগান পরিবর্তনের হারের সম্পর্ক, তার নমনীয়তার সম্পর্ক। নির্দিষ্টভাবে যখন দাম এবং চাহিদার মধ্যেই আমরা নমনীয়তার বিশ্লেষণ সীমিত রাখি তখন তাকে নির্দিষ্টভাবে বলা হয় চাহিদার দাম নমনীয়তা (price elasticity of demand)। এছাড়া চাহিদার আয় নমনীয়তা (income elasticity of demand), যোগানের দাম নমনীয়তা (price elasticity of supply) ইত্যাদিভাবেও আমরা নমনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারি।

চাহিদার দাম নমনীয়তা (Price elasticity of demand)

এক কথায়, দামের এক একক পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তনের হার নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমেই আমরা চাহিদার দাম নমনীয়তা বের করতে পারি।

$|e| = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta p/p}$ চাহিদার দাম নমনীয়তার মান ঋণাত্মক হয় বলে আমরা চূড়ান্তভাবে (absolute) মান $|e|$ বিবেচনা করি।

এখানে Q হচ্ছে মূল পরিমাণ এবং ΔQ হচ্ছে এই পরিমাণের পরিবর্তনের পরিমাণ। p হচ্ছে মূল দাম আর Δp হচ্ছে দামের পরিবর্তনের পরিমাণ।

দামের বা আয়ের এক একক পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার বা যোগানের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো নিম্নরূপ:

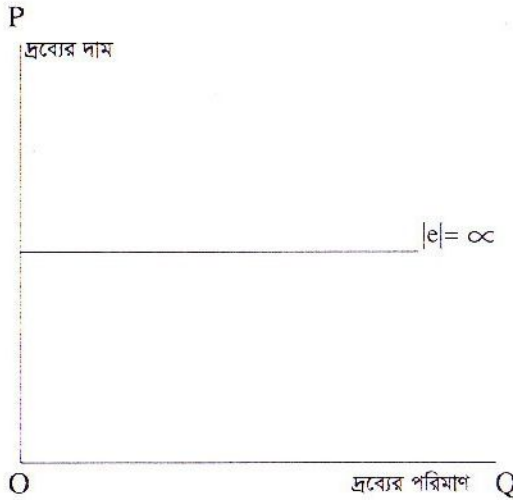
১. চূড়ান্ত নমনীয় (perfectly elastic), $|e| = \infty$
২. নমনীয় (elastic), $|e| > 1$
৩. একক নমনীয় (unit elastic), $|e| = 1$
৪. অনমনীয় (inelastic), $|e| < 1$
৫. চূড়ান্ত অনমনীয় (perfectly inelastic), $|e| = 0$

যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার আমূল বা অসীম পরিবর্তন ঘটে তখন সেই পণ্যকে বলা হয় চূড়ান্ত নমনীয় (perfectly elastic) অর্থাৎ নমনীয়তাকে আমরা যদি e দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আমরা বলতে পারি $|e| = \infty$

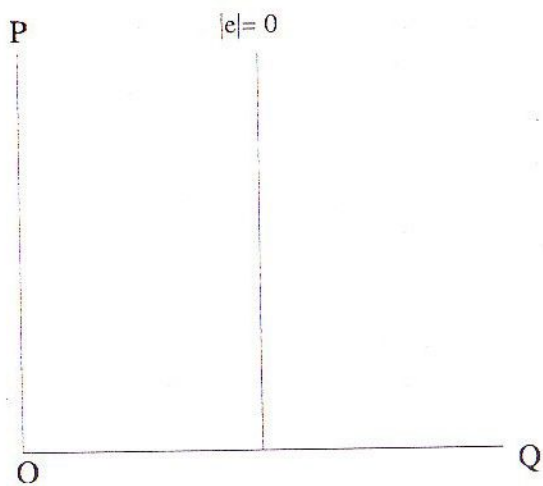
যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এক এককের চাইতে বেশি পরিবর্তন হয় তখন সেই পণ্যের চাহিদাকে বলা হয় নমনীয় (elastic) বা $|e| > 1$ । অর্থাৎ পণ্যের দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ বাড়বে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগের বেশি কমে যাবে। আবার দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ কমবে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগেরও বেশি বাড়বে। যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের ফলে চাহিদারও এক এককই পরিবর্তন হয় তখন সেই পণ্যের চাহিদাকে বলা হয় একক নমনীয় Unit elastic, $|e| = 1$ । অর্থাৎ পণ্যের দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ বাড়বে তখন এর চাহিদাও ১০ ভাগই কমে যাবে কিংবা একই হারে দাম হ্রাসে এর চাহিদাও ১০ ভাগই বাড়বে।

যখন একটি পণ্যের দামের এক এক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এক এককের চাইতে কম পরিবর্তন হয় তখন সেই পণ্যের চাহিদাকে বলা হয় অনমনীয় (inelastic), $|e| < 1$ । অর্থাৎ পণ্যের দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ বাড়বে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগেরও কম কমবে। আবার দাম যখন শতকরা ১০ ভাগ কমবে তখন এর চাহিদা ১০ ভাগের কম বাড়বে।

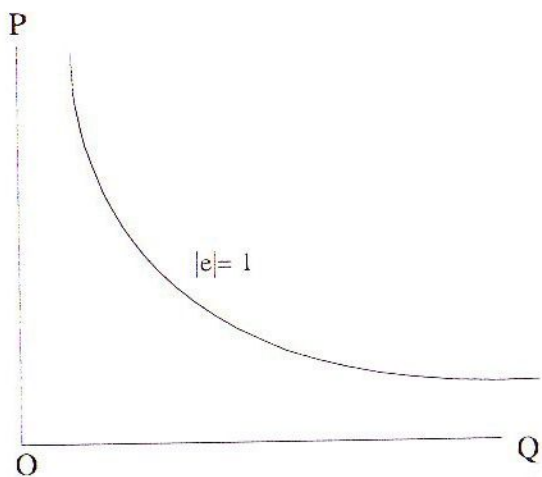
যখন একটি পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কোনোরকম পরিবর্তনই হয় না তখন সেই পণ্যের চাহিদাকে বলা হয় চূড়ান্ত অনমনীয় (perfectly inelastic), $e = 0$ । অর্থাৎ পণ্যের দাম শতকরা যাই বাড়ুক বা কমুক চাহিদার ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাব পড়বে না।



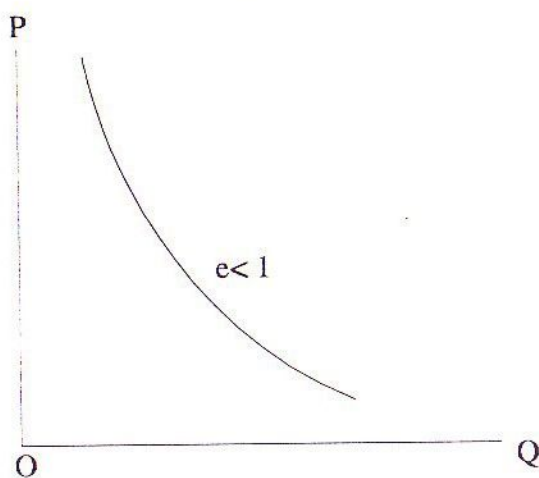
চিত্র ৪.১: চূড়ান্ত নমনীয় চাহিদা রেখা



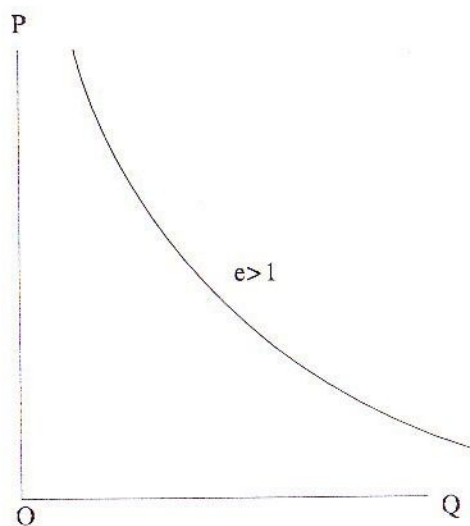
চিত্র ৪.২: চূড়ান্ত অনমনীয় চাহিদা রেখা



চিত্র ৪.৩: একক নমনীয় চাহিদা রেখা

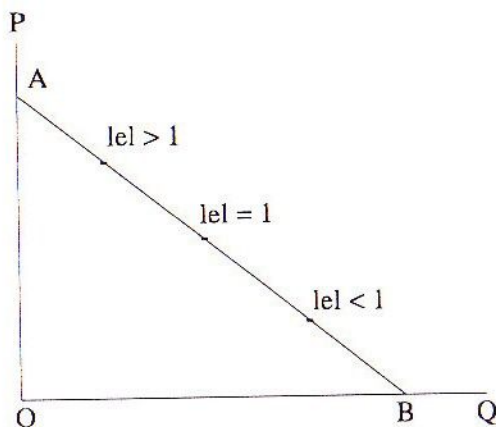


চিত্র ৪.৪: অনমনীয় চাহিদা রেখা



চিত্র ৪.৫: নমনীয় চাহিদা রেখা

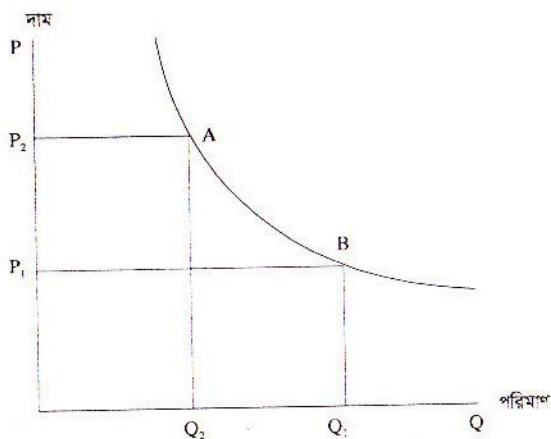
আবার একটি সরলরেখা চাহিদা রেখার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার দাম নমনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। ক্যালকুলাসের ধারণা ব্যবহার করে আমরা এটি সহজেই দেখাতে পারি।



চিত্র ৪.৬: একই রেখায় বিভিন্ন নমনীয়তা

AB চাহিদা রেখার মধ্যবিন্দুতে $|e| = 1$, মধ্যবিন্দুর উপরের অংশের যে কোনো বিন্দুতে $|e| > 1$ এবং মধ্যবিন্দুর নিচের অংশের যেকোনো বিন্দুতে $|e| < 1$. উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্মের আচরণ বিশ্লেষণ চাহিদার দামে নমনীয়তার ধারণার ব্যবহার আমরা পরে দেখবো। রেখাংশ নমনীয়তা (Arc Elasticity) বের করতে গেলে আমরা নিচের সূত্র অবলম্বন করতে পারি। এটি হলো:

$$lel = \frac{(Q_2 - Q_1) / (P_2 - P_1)}{(Q_1 + Q_2) / (P_1 + P_2)}$$



চিত্র ৪.৭: রেখাংশের নমনীয় চাহিদা

এখানে p_1 থেকে p_2 দাম পরিবর্তনে পরিমাণ Q_1 থেকে Q_2 পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনার জন্য এই রেখাংশ পদ্ধতি।

ΔP ও ΔQ যতই $\rightarrow 0$ হতে থাকবে ততই রেখাংশ নমনীয়তা $dQ/dP \cdot P/Q$ অর্থাৎ বিন্দু নমনীয়তায় পরিবর্তিত হতে থাকবে।

নিচের ছকে বিভিন্ন মাত্রার নমনীয়তার মর্মবস্তু ও মোট আয়ের ওপর তার প্রভাব নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ছক ৬: নমনীয়তার ধরন ও তার প্রভাব: সারসংক্ষেপ

চাহিদার নমনীয়তা মাত্রা	নির্দিষ্ট রূপ	সংজ্ঞা	আয়ের উপর প্রভাব
$ e_d > 1$	নমনীয় চাহিদা	পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার এক এককের চাইতে বেশি পরিবর্তন	দাম কমলে বিক্রয়তার আয় বাড়ে
$ e_d = 1$	একক নমনীয় চাহিদা	পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদারও এক একক পরিবর্তন	দাম কমলে আয় একই থাকবে
$ e_d < 1$	অনমনীয় চাহিদা	পণ্যের দামের এক একক পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার এক এককের চাইতে কম পরিবর্তন	দাম কমলে আয় কমবে

সারসংক্ষেপ

নমনীয়তা দাম বা আয় পরিবর্তনের হারের সঙ্গে ভোক্তার চাহিদা বা যোগান পরিবর্তনের হারের সম্পর্ক পরিমাপ করে। চাহিদার দাম নমনীয়তাকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। চূড়ান্ত অনমনীয়, নমনীয়, একক নমনীয়, অনমনীয় ও চূড়ান্ত অনমনীয়। একটি সরল চাহিদা রেখার ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার দাম নমনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হয়।

চাহিদার বিভিন্ন ধরনের নমনীয়তা

চাহিদার নমনীয়তার ধারণার প্রয়োগ সাধারণত দেখা যায় ভোক্তার চাহিদার বাঁচ বোঝার জন্য, কিন্তু, আমরা আগেই বলেছি, এগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার সম্ভব এবং তার ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ভোক্তাদের আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদার মাত্রার পরিবর্তন পরীক্ষা। একে বলা হয়, চাহিদার আয় নমনীয়তা (income elasticity of demand)। এছাড়া আছে চাহিদার আড়াআড়ি নমনীয়তা (cross-elasticity of demand) যেখানে একটি পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে ভোক্তার অন্য পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়। চাহিদার আয় নমনীয়তাকে আমরা সমীকরণের মাধ্যমে লিখতে পারি নিম্নরূপ:

$$e_M = \frac{\Delta Q}{\Delta M} \cdot \frac{M}{Q}$$

এখানে আয় M যার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিমাণের (Q) পরিবর্তনের অনুপাত পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আড়াআড়ি নমনীয়তাকে আমরা সমীকরণের মাধ্যমে লিখতে পারি নিম্নরূপ:

$$e_{xy} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta Q_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}$$

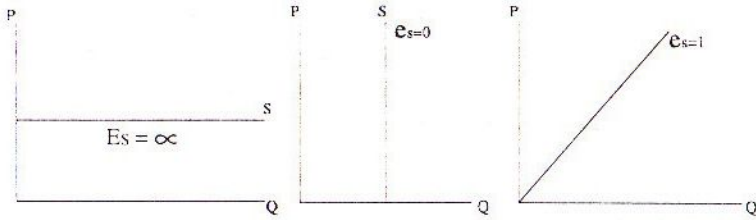
এখানে পণ্য দুটো x ও y ; y পণ্যের দাম পরিবর্তনে x পণ্যের চাহিদার পরিবর্তন নির্দিষ্ট করা হচ্ছে।

যোগানের দাম নমনীয়তা

একইভাবে আমরা যোগানের দাম নমনীয়তাও বের করতে পারি। এর সূত্র হলো:

$$e_s = \frac{\Delta Q_s / Q_s}{\Delta P / P}$$

বিভিন্ন মাত্রার যোগানের দাম নমনীয়তা রেখায় দেখানো যায়।



চিত্র ৪.৭: যোগানের দাম নমনীয়তা

নমনীয়তার বাস্তব চিত্র ও অর্থনীতিতে তার ব্যবহার

যেসব পণ্যের সুলভ এবং উপযুক্ত বিকল্প পাওয়া সম্ভব সেসব পণ্য সাধারণত নমনীয় (elastic) হয় কারণ সেগুলোর দাম বাড়লে ভোক্তাদের পক্ষে খুব সহজেই তার চাহিদা কমিয়ে দিয়ে বিকল্প দ্রব্য ক্রয় সম্ভব। এরকম সহজ ও সুলভ বিকল্প না থাকলে পণ্যের চাহিদা সাধারণত অনমনীয় (inelastic) হয়। কারণ তখন ভোক্তাদের পক্ষে দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদার পরিবর্তন সম্ভব হয় না। নমনীয়তার এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে তার উপর মোট খরচ কত হবে তা নির্ভর করে। কোন ধরনের পণ্যের উপর কর বসালে সরকারের রাজস্ব বাড়বে, আর কোন ধরনের পণ্যের উপর কর বসালে রাজস্ব কমবে তা নির্ভর করে সেসব পণ্যের নমনীয়তার উপর। উৎপাদক বা বিক্রেতাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, এই নমনীয়তার উপরই নির্ভর করে কোন পণ্যের দাম বাড়ালে বিক্রেতার লাভবান হবে, আবার কোন পণ্যের দাম বাড়লে তা তার জন্য ক্ষতিকর হবে। সুতরাং সরকার, উৎপাদক, বিক্রেতা সবাই পণ্যের নমনীয়তা সম্পর্কে ধারণা খুব দরকার।

একজন ভোক্তার জন্য কোন পণ্য অনমনীয় হবে আর কোনটি নমনীয় হবে তা তার আয়সীমা দ্বারাও অনেকখানি প্রভাবিত হয়। আয় কম থাকলে একজন ভোক্তার কাছে একদম নিত্য প্রয়োজনীয় ছাড়া অন্য অনেক কিছুই বিলাসদ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হবে, যেমন: টিভি, পেশাক, ভ্রমণ ইত্যাদি। তার ফলে এসবের যে অনুপাতে দাম বাড়বে তার চাইতে বেশি অনুপাতে এগুলোর চাহিদা কমবে। অর্থাৎ এসব পণ্য ঐ ভোক্তার কাছে উচ্চমাত্রায় নমনীয়। কিন্তু আয় বেশি থাকলে এই একই পণ্য ভোক্তার কাছে প্রয়োজনীয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তখন এসবের যে অনুপাতে দাম বাড়বে সেই অনুপাতে তার চাহিদা কমবে না। অর্থাৎ এসব পণ্য তার কাছে হয়ে উঠবে অনমনীয়। নিচের ছকে আমরা বিভিন্ন ধরনের পণ্যের চাহিদার দাম, আয় ও আড়াআড়ি নমনীয়তা দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে আমরা আরও দেখছি যে, পণ্যের নমনীয়তা এবং তার ধরন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

নিচে একটি নির্দিষ্ট বাজারে বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন নমনীয়তার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

যে পণ্যগুলোর দাম নমনীয়তা ১ এর কম কিন্তু ০-এর বেশি সেগুলোকে আমরা বলছি সাধারণভাবে অনমনীয়। যেগুলো ১-এর বেশি কিন্তু অসীম এর কম সেগুলোকে আমরা বলছি সাধারণভাবে নমনীয়। আড়াআড়ি নমনীয়তা যে দুটো পণ্যে ধনাত্মক সেগুলো বিকল্প অর্থাৎ একটি পণ্যের দাম হ্রাসে অন্যটির চাহিদা কমে। আবার যখন ঋণাত্মক তখন সেগুলো সম্পূরক, কেননা তখন একটি পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে অন্যটির চাহিদা কমে।

ছক ৭: বিভিন্ন ধরনের নমনীয়তার বাস্তব চিত্র

চাহিদার দাম নমনীয়তা			চাহিদার আড়াআড়ি নমনীয়তা			চাহিদার অয় নমনীয়তা		
পণ্য	e	চাহিদার ধরন	পণ্য	e_{xy}	পণ্যের ধরন	পণ্য	e_M	পণ্যের ধরন
গরুর মাংস	০.৯২	অনমনীয়	গরুর মাংস	০.২৮	বিকল্প	মাখন	০.৪২	প্রয়োজনীয়
আলু	০.৩১	অনমনীয়	মাখন, মার্জারিন	০.৬৭	বিকল্প	মার্জারিন	-০.২০	নিকৃষ্ট
চিনি	০.৩১	অনমনীয়	পনির, মাখন	-০.৬১	সম্পূরক	মাংস	০.৩৫	প্রয়োজনীয়
বিদ্যুৎ	১.২০	নমনীয়	চিনি, ফল	-০.২৮	সম্পূরক	বিদ্যুৎ	০.২০	প্রয়োজনীয়
রেস্তোরাঁয়	২.২৭	নমনীয়	কলা	০.২	বিকল্প	রেস্তোরাঁয়	১.৪৮	বিনাসদ্রব্য
খাওয়া			প্রাকৃতিক গ্যাস			খাওয়া		

সূত্র: যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জরিপ থেকে Salvatore অবলম্বনে।^{১৫}

আয় নমনীয়তা যখন ১ এর কম কিন্তু ০-এর বেশি তখন পণ্যকে আমরা বলতে পারি প্রয়োজনীয়, যখন তা ০-এর কম তখন তা নিকৃষ্ট, যখন ১-এর বেশি তখন তা বিনাসদ্রব্য।

সারসংক্ষেপ

চাহিদার অয় নমনীয়তা, যোগানের দাম নমনীয়তা ইত্যাদি ভাবেও নমনীয়তা বিশ্লেষণ করা যায়। কোন ধরনের পণ্যের উপর কর বসালে সরকারের রাজস্ব বাড়বে বা কমবে কিংবা কোন পণ্যের দাম বাড়লে বা কমলে বিক্রেতার মোট আয় কতটা বাড়বে বা কমবে তা নির্ভর করে সেসব পণ্যের নমনীয়তার উপর। তাছাড়া একজন ভোক্তার জন্য কোন পণ্য অনমনীয় বা নমনীয় হবে তা তার আয়সীমা দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

উৎপাদন Production

অর্থশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র উৎপাদন। বাজার অর্থনীতিতে বা পুঁজিবাদী কাঠামোয় উৎপাদন সিদ্ধান্ত ও উৎপাদকের আচরণ বিষয়ক আলোচনা ঠিকভাবে বুঝতে গেলে উৎপাদকের বিভিন্ন উপাদান এবং বিশেষ করে উৎপাদনের সাংগঠনিক রূপ, মালিকানার ধরন, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। এটি প্রথম অধ্যায়ে করা হয়েছে। এরপর কয়েকটি পর্বে উৎপাদন অপেক্ষক, উৎপাদন মাত্রা, উৎপাদনের বিভিন্ন পরিমাপ, উপাদান বিকল্প, ব্যয়, উৎপাদকের ভারসাম্য ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

উৎপাদনের উপাদানসমূহ (Factors of Production)

উৎপাদন করতে গেলে বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত হয়ে বিভিন্নমাত্রায় সেখানে ভূমিকা রাখে। এগুলোকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়:

- * শ্রম
- * মূলধন
- * ভূমি
- * সংগঠন

শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের আদি ও প্রাথমিক উপাদান। মানুষ প্রথম প্রকৃতির সঙ্গে এই শ্রম দিয়েই একটি কাজের সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং উৎপাদন শুরু করেছে। শ্রম মানুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই শ্রমের শক্তি পরিণত হয় পণ্য। উৎপাদন বিকাশের একটি পর্যায়ে মূলধন আসে। যা আরও অন্যান্য উপকরণ ক্রয়, ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে লাগে। মূলধনকে বলা হয় উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ। মার্কসীয় পরিভাষায় এটিও শ্রমেরই আরেকটি রূপ, যাকে বলা হয় মৃতশ্রম।

ভূমি বলতে এমনিতে শুধু ভূমি বোঝায় না। এক সময় ছিল যখন মানুষ শুধু ভূমিতে বা প্রকৃতিতেই কাজ করতো। কিন্তু কালক্রমে কারখানার উদ্ভব হলো, লেনদেন বাড়লো, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হলো। এখন ভূমি বলতে জমি এবং কারখানা সবই বোঝায়। যে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আয়তন যত ছোটই থাকুক না কেন

সেখানে উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ, পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ থাকে। এসব কাজ করতে গিয়ে যে ব্যবস্থাপনা বা সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড়ায়, সেটাকেই সংগঠন বলে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই সবগুলোই কোনো না কোনোভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিভিন্ন উপাদানের বিকাশ ধারা, গুরুত্বের তরতম্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন ধারার মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

সংগঠন ও তার বিকাশ

জানা ইতিহাসের অনেক আগে থেকেই মানুষ উৎপাদন করে আসছে। মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গেই এটি সম্পর্কিত। এই উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ যৌথভাবে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে, পরিকল্পনা করেছে, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে; এগুলোকেই সম্মিলিতভাবে আমরা সংগঠন বলতে পারি।

মানুষের উৎপাদন ক্ষেত্র বা আয়তন, লক্ষ্য, প্রযুক্তি সবকিছুর মধ্যেই বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন এসেছে। তার ফলে পরিবর্তিত হয়েছে সংগঠনও। উৎপাদন ও সংগঠনের পরিবর্তন ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা এর মধ্যে যে দিকগুলো শনাক্ত করতে পারি সেগুলোকে সারসংক্ষেপ করলে পাঁচটি প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায়।

দেখা যাবে উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমে,

১. নিম্ন প্রযুক্তি থেকে উচ্চ প্রযুক্তির দিকে,
২. ক্ষুদ্রায়তন থেকে বৃহদায়তন উৎপাদনের দিকে,
৩. সরল ক্ষুদ্র থেকে জটিল ও বিস্তৃত ব্যবস্থাপনার দিকে,
৪. সরল ও স্থির শ্রম বিভাজন থেকে জটিল ও পরিবর্তনশীল শ্রমবিভাজনের দিকে, এবং
৫. সাধারণ কাজের প্রক্রিয়া থেকে বিশেষায়িত কাজের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

আয়তন, ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা তিন দিক থেকে সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন ধরন আমরা দেখতে পাই। যেমন— সংগঠনের বিভিন্ন আয়তন ও ব্যবস্থাপনা নির্দিষ্ট করতে গেলে আমরা এগুলোকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

প্রথম পর্যায়: উৎপাদনের আয়তন ক্ষুদ্র। এখানে মালিক, শ্রমিক, ব্যবস্থাপক অভিন্ন। যেমন ছোট দোকান বা ক্ষুদ্র কৃষকের খামার বা কুটির শিল্প। এসব ক্ষেত্রে যিনি মালিক তিনিই দিনরাত কাজ করছেন, তিনিই আবার হিসাব রাখছেন কেনাকাটা করছেন, ঘর মেরামত করছেন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্যায়: উৎপাদনের আয়তন আগের তুলনায় একটু বড়। এখানে মালিক ও ব্যবস্থাপক অভিন্ন; কিন্তু শ্রমিক ভিন্ন, নিয়োজিত। যেমন, ক্ষুদ্রশিল্প বা বড় দোকান বা মাঝারি কৃষক।

তৃতীয় পর্যায়: উৎপাদনের আয়তন বৃহৎ। মালিক, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক সকলেই ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, বহুসংখ্যক শাখা যুক্ত ডিপার্টমেন্টাল বা চেইন স্টোর, বৃহৎশিল্প, বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ব্যবস্থাপনা এখানে অনেক ক্ষেত্রে মালিক নির্ভর থাকে না।

চতুর্থ পর্যায়: উৎপাদনের এলাকা আন্তর্জাতিক। উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে মালিক

প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যেমন বহুজাতিক সংস্থা (শেল, লিভার ব্রাদার্স, বাটা)। বহুজাতিক সংস্থায় সারা বিশ্ব জুড়েই শেয়ার হোল্ডাররা ছড়িয়ে থাকেন। বৃহৎ মালিকেরা মুনাফার উল্লেখযোগ্য ভাগ নেন। কিন্তু এছাড়া আর কোনোভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাধারণত তাদের অংশগ্রহণ দেখা যায় না।

উৎপাদনের মালিকানা

পুঁজিবাদী বা বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মালিকানার বিভিন্ন ধরন দেখা যায়। এগুলো হলো:

- একক মালিকানা : যেখানে এক ব্যক্তিই মালিক।
- যৌথ অংশীদারিত্ব : যেখানে একাধিক ব্যক্তি মালিকানার অংশীদার।
- জয়েন্ট স্টক কোম্পানি : যেখানে কিছু ব্যক্তি শুরু করলেও শেয়ারের মাধ্যমে মালিকানার অংশীদারীত্বের বিস্তার ঘটানো হয়।
- সমবায় : যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় যুক্ত থাকে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা : যেখানে রাষ্ট্রই কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক থাকে।
- সামাজিক মালিকানা : যেখানে মালিকানা নির্দিষ্ট থাকে না। যেমন নদী, পাহাড়, খোলা জায়গা, বন। এগুলো সামাজিক মালিকানাধীন সম্পত্তি। এগুলোকে সাধারণ সম্পত্তি বা জনগণের সম্পত্তিও বলা হয়।

সারসংক্ষেপ

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত হয়ে সেখানে ভূমিকা রাখে। এসব উপাদানকে সাধারণত শ্রম, মূলধন, ভূমি ও সংগঠন-এই চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মালিকানা, সংগঠন, প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। পুঁজিবাদী বা বাজার অর্থনীতিতেও উৎপাদন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মালিকানার বিভিন্ন ধরন দেখা যায়।

উৎপাদন অপেক্ষক

উৎপাদন অপেক্ষক হচ্ছে উৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদন উপকরণের সম্পর্ক। সমীকরণ, ছক বা চিত্র দিয়ে আমরা যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে, নির্দিষ্ট উৎপাদন সমষ্টি দিয়ে কতটা সর্বোচ্চ উৎপাদন হতে পারে এটা নির্দেশ করি তখন সেটাকেই বলে উৎপাদন অপেক্ষক। সরলভাবে উৎপাদন অপেক্ষক আমরা লিখতে পারি এভাবে:

$$y=f(x_1, x_2, \dots, x_n, k_1, k_2, \dots, k_m)$$

যেখানে y দিয়ে বোঝানো হচ্ছে উৎপাদন এবং উৎপাদন উপকরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে x এবং k ; x হলো সকল পরিবর্তনীয় উৎপাদন উপকরণ এবং k হলো সকল অপরিবর্তনীয় উৎপাদন উপকরণ। আমরা সহজভাবে যদি একটি কৃষি খামারের উৎপাদন অপেক্ষক লিখি তাহলে সেখানে কমপক্ষে একটি স্থির উপাদান ভূমি এবং একটি পরিবর্তনীয় উপাদান দিয়ে তার কাঠামো দাঁড় করাতে পারি। অর্থাৎ এখানে হবে, $y=f(l,k)$

যেখানে l হলো শ্রম এবং k হলো ভূমি। এবং এই দুটো উপাদান নিয়ে আমরা একটি কাল্পনিক ছকও দাঁড় করাতে পারি যেখান থেকে আমরা গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করতে পারি।

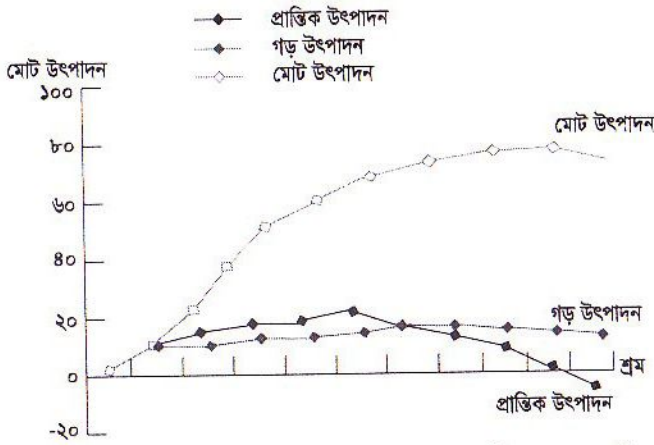
ছক-১: শ্রমের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা

ভূমি (x)	শ্রম (l)	মোট উৎপাদন (y)	শ্রমের গড় উৎপাদন (y/l)	শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন (dy/dl)
১	০	০	০	-
১	১	৪	৪	৪
১	২	১৪	৭	১০
১	৩	২৫.৫	৮.৫	১১.৫
১	৪	৪০	১০	১৪.৫
১	৫	৬০	১২	২০
১	৬	৭২	১২	১২
১	৭	৭৭	১১	৫
১	৮	৮০	১০	৩
১	৯	৮১	৯	১
১	১০	৭৫	৭.৫	-৬

উৎপাদনশীলতা : মোট, গড় ও প্রান্তিক

নিচের ছকে আমরা দুটো উৎপাদন বিবেচনা করেছি। এর মধ্যে একটিকে ধরা হয়েছে স্থির (ভূমি) এবং অন্যটিকে ধরা হয়েছে পরিবর্তনীয় (শ্রম)। ভূমি স্থির রেখে শুধুমাত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মোট উৎপাদনে যে পরিবর্তন হচ্ছে সেখান থেকে আমরা খুব সহজেই শ্রমের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বের করতে পারি।

এই ছকের ভিত্তিতে আমরা রেখা টানতে পারবো যেখানে থেকে আমরা মোট, গড় ও প্রান্তিক হিসাবের সম্পর্ক আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো।



চিত্র ৫.১: শ্রমের গড়, মোট ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার রেখাচিত্র

ছকে দেখা যাচ্ছে শ্রম নিয়োগ করার প্রক্রিয়ায় এক পর্যায়ে পর্যন্ত মোট উৎপাদন বেড়েছে, তারপর তা কমা শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন বেড়েছে ৫ একক পর্যন্ত তারপর প্রান্তিক উৎপাদন কমা শুরু হয়েছে। প্রান্তিক উৎপাদন শুরু হয়ে ঋণাত্মক হয়েছে ৯ এককের পর যখন মোট উৎপাদন কমা শুরু হয়েছে। গড় উৎপাদন কমা শুরু হয়েছে ৬ একক থেকেই।

উৎপাদন হতে থাকলে তা কীভাবে বাড়ছে বা কমছে তা বোঝার জন্য গড় উৎপাদনশীলতা, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। মোট উৎপাদন এবং নির্দিষ্ট উৎপাদন উপকরণ এককের অনুপাতকে আমরা ঐ উপকরণের গড় উৎপাদনশীলতা (Average Productivity) বলে থাকি। অন্যদিকে যেকোনো একটি উৎপাদন উপকরণের একক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তা হলো সেই উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (Marginal Productivity)। উপরের ছকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রমের ব্যবহার যত বাড়ছে ততই একটি পর্যায়ে পর্যন্ত উৎপাদনও বাড়ছে। একটি পর্যায়ে গিয়ে, উপরের ছকে ১০ম একক থেকে, শ্রমের ব্যবহার বাড়ালে আর মোট উৎপাদন বাড়েনা, বরং কমতে থাকে।

শ্রমের ব্যবহার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপাদন বাড়ুক বা কমুক তা থেকে শ্রমের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বের করা যায়। প্রত্যেকটি স্তরে উৎপাদনকে শ্রমের একক দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেতে পারি গড় উৎপাদনশীলতা (y/l)। এক্ষেত্রে আমরা যদি প্রত্যেকটি এককের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপাদনে কী পরিবর্তন হলো সেটা হিসাব করি, তাহলে সেখানে পাবো শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (dy/dl)।

উৎপাদন মাত্রা (Production scale)

উৎপাদন মাত্রা বলতে বোঝায় উৎপাদন উপকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক। উৎপাদন মাত্রা তিন রকমের হতে পারে।

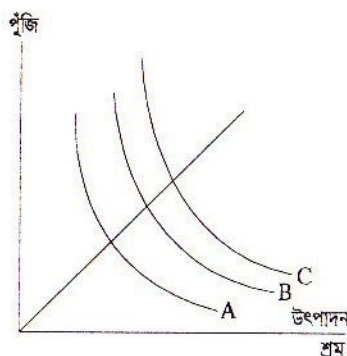
প্রথমত: ক্রমবর্ধমান উৎপাদন মাত্রা (Increasing Return to Scale);

দ্বিতীয়ত: ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন মাত্রা (Decreasing Return to Scale); এবং

তৃতীয়ত: অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রা (Constant Return to Scale)

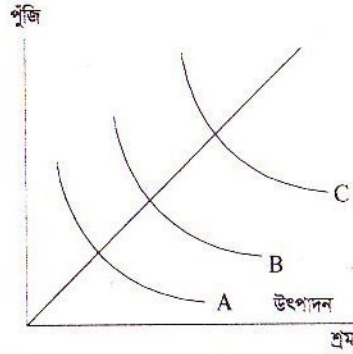
এখানে আমরা উৎপাদনের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করছি শ্রম ও পুঁজি, এবং দুটোই পরিবর্তনীয়। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন মাত্রা (Increasing return to scale) বলতে বোঝায় উৎপাদন উপকরণ এবং উৎপাদনের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক যেখানে সবগুলো উৎপাদন উপকরণ এক একক বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন এক এককের চাইতেও বেশি বেড়ে যায়। যেমন কোনো ক্ষেত্রে শ্রমই একমাত্র পরিবর্তনীয় উৎপাদন উপকরণ। যদি দেখা যায় এক একক শ্রম বাড়ানোর ফলে মোট উৎপাদন এক এককের বেশি বেড়ে গেছে তাহলে আমরা বলবো সেখানে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন মাত্রার অবস্থা বিরাজমান রয়েছে।

এখানে চিত্রে আমরা শ্রম ও পুঁজির সম্মিলিত প্রভাব লক্ষ্য করছি।



চিত্র ৫.২: ক্রমবর্ধমান উৎপাদন মাত্রা

চিত্রে দেখানো হয়েছে উৎপাদন দ্বিগুণ করতে উৎপাদন উপকরণ ক্রমেই কম প্রয়োজন হচ্ছে অর্থাৎ এক একক উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক থেকে অধিকতর উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে।

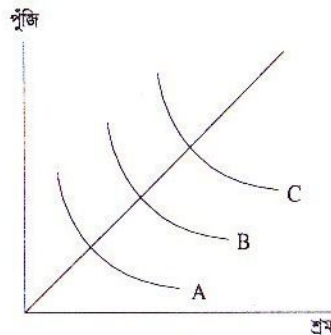


চিত্র ৫.৩: ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন মাত্রা

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন মাত্রা (Decreasing Return to Scale) বলতে বোঝায় উৎপাদন উপকরণ এবং উৎপাদনের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক যেখানে সবগুলো উৎপাদন উপকরণ এক একক বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন এক এককের চাইতে কম বাড়ে। অর্থাৎ এখানে শ্রম ও পুঁজির এক একক পরিবর্তনে উৎপাদন বাড়লেও তা এক এককের তুলনায় কম। এরকম অবস্থাকেই আমরা বলি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন মাত্রা।

চিত্রে দেখানো হয়েছে, উৎপাদন দ্বিগুণ করতে আগের চাইতে বেশি উৎপাদন উপকরণ প্রয়োজন হচ্ছে। অর্থাৎ এক একক উৎপাদন উপকরণের বৃদ্ধিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমহ্রাসমান হারে।

অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রা (Constant Return to Scale) বলতে বোঝানো হয় এখানে উৎপাদন উপকরণ এবং উৎপাদনের মধ্যে এমন সম্পর্ক যেখানে সবগুলো উৎপাদন উপকরণ এক একক বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন কেবল এক এককই বাড়ে। অর্থাৎ কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এমন দেখা যায় যে, শ্রম ও পুঁজি বা অন্য কোনো উপাদান উপকরণ যে হারে বৃদ্ধি পায় উৎপাদনও সেই একই হারে বাড়ে। এই রকম অবস্থাকে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রা।



চিত্র ৫.৪: অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রা

চিত্রে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদন দুই-এর বৃদ্ধি একইভাবে ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন মাত্রা থেকে আমরা উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তি, কাম্য উৎপাদনের স্তর ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারি।

সারসংক্ষেপ

উৎপাদন অপেক্ষক হচ্ছে উৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদন উপকরণের সম্পর্ক। মোট উৎপাদন এবং নির্দিষ্ট উৎপাদন উপকরণ এককের অনুপাতকে ঐ উপকরণের গড় উৎপাদনশীলতা বলে। অন্যদিকে যে কোনো একটি উৎপাদন উপকরণের একক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তা হলো সেই উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা। উৎপাদন মাত্রা বলতে বোঝায় উৎপাদন উপকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক। উৎপাদন মাত্রা তিন ধরনের হতে পারে: ক্রমবর্ধমান, ক্রমহাসমান ও অপরিবর্তনীয়।

উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখা বা সমউৎপাদন রেখা

বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এমন একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করি যেখানে উৎপাদনের উপাদান মাত্র দুটো: শ্রম এবং পুঁজি। আর দুটো উপাদানই পরিবর্তনীয়। মনে রাখুন, যেখানে দুটো উপাদানই পরিবর্তনীয় সেখানে আমরা দীর্ঘমেয়াদের পরিস্থিতিই বিবেচনা করছি। এরকম একটি অবস্থায় আমরা এমন কিছু পরিস্থিতি পেতে পারি যখন শ্রম ও পুঁজির বিভিন্ন বিন্যাসে উৎপাদক একই পরিমাণ উৎপাদন করেছে। যে রেখায় আমরা একই উৎপাদনের জন্য শ্রম ও পুঁজির বিভিন্ন সমাবেশ বা সংবিন্যাস পাই সেই রেখাকেই সমউৎপাদন রেখা বলা হয়। এটি যেহেতু ভোগকারীর নিরপেক্ষ রেখার মতো উৎপাদকের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করে সেহেতু একে উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখাও বলা যায়। উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখার মতো একই গুণাবলী এই রেখার মধ্যেও দেখা যায়। যেমন:

১. এই রেখাগুলো ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়।
২. এগুলো কেন্দ্রের দিকে উত্তল হয়।
৩. একটি সমউৎপাদন রেখা কখনো অন্যটিকে ছেদ করে না। এবং
৪. ডানদিকের রেখাগুলো বাঁ দিকের রেখাগুলোর চাইতে উচ্চতর উৎপাদন নির্দেশ করে।

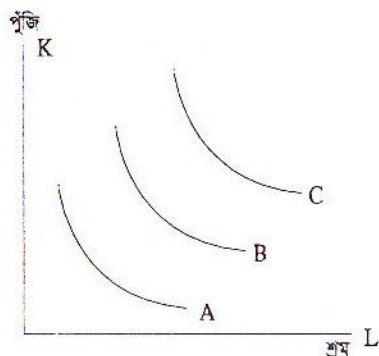
নিচের ছকের তিনটি সমউৎপাদন রেখায় শ্রম ও পুঁজির সম্ভাব্য বিন্যাস দেয়া হলো। এ থেকে আমরা আবার উপাদান বিকল্পের প্রান্তিক হারও (Marginal Rate of Technical Substitution, MRTS) বের করতে পারি।

ছক ২ : উৎপাদকের নিরপেক্ষ রেখা বা সমউৎপাদন রেখা (Iso-product curve)

সমউৎপাদন রেখা-১		সমউৎপাদন রেখা-২		সমউৎপাদন রেখা-৩	
শ্রম	পুঁজি	শ্রম	পুঁজি	শ্রম	পুঁজি
২	১১	৪	১৩	৬	১৫
১	৮	৩	১০	৫	১২
২	৫	৪	৭	৬	৯
৩	৩	৫	৫	৭	৮
৪	২.৩	৬	৪.২	৮	৬.২
৫	১.৮	৭	৩.৫	৯	৫.৫
৬	১.৬	৮	৩.২	১০	৫.৩
৭	১.৮	৯	৩.৫	১১	৫.৫

অপর পৃষ্ঠার ছকের ভিত্তিতে আমরা নিচের রেখায় বিভিন্ন সমউৎপাদন রেখা লক্ষ্য করি।

নিচের রেখাগুলো থেকে আমরা পরীক্ষার দেখতে পারছি যে, প্রত্যেকটি সমউৎপাদন রেখায় অনেকগুলো বিন্যাস আছে। বিভিন্ন বিন্দুতে শ্রম ও পুঁজি বিভিন্ন মাত্রায় একেকটি বিন্যাস তৈরি করেছে। কিন্তু এর প্রত্যেকটি বিন্যাস থেকে উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে একই পরিমাণ।



চিত্র ৫.৫: সমউৎপাদন রেখা

উপাদান বিকল্পের প্রান্তিক হার

উপাদান বিকল্পের প্রান্তিক হার বা Marginal Rate of Technical Substitution (MRTS) বলতে বোঝায় এমন একটি অনুপাত যা দিয়ে দুটো উৎপাদন উপাদানের (এখানে শ্রম ও পুঁজি) একটির একক পরিবর্তনের ফলে অন্যটির পরিবর্তনের মাত্রা বোঝায়।

নিচের সারণীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক একক শ্রম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতটা পুঁজি পরিবর্তিত হয়। একে আবার MP_L/MP_K অর্থাৎ যথাক্রমে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার অনুপাত হিসেবেও দেখানো যায়।

গাণিতিকভাবে এটা আমরা দেখতে পারি এভাবে,

$$Q = f(L, K)$$

$$MP_K = -\frac{\partial Q}{\partial L} = f_L$$

$$MP_L = -\frac{\partial Q}{\partial K} = f_K$$

সমউৎপাদন রেখা Q কে পূর্ণ অন্তরীকরণ করে আমরা পাই

$$f_L dL + f_K dK = 0$$

$$-\frac{dK}{dL} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{f_L}{f_K}$$

ছক ৩: উৎপাদন বিকল্পের প্রান্তিক হার

সমউৎপাদন রেখা-১			সমউৎপাদন রেখা-২			সমউৎপাদন রেখা-৩		
শ্রম	পুঁজি	প্রান্তিক হার (MRTS _{L,K})	শ্রম	পুঁজি	প্রান্তিক হার (MRTS _{L,K})	শ্রম	পুঁজি	প্রান্তিক হার (MRTS _{L,K})
১	৮		৩	১০		৫	১২	
২	৫	৩.০	৪	৭	৩.০	৬	৯	৩.০
৩	৩	২.০	৫	৫	২.০	৭	৭	২.০
৪	২.৩	.৭	৬	৪.২	.৮	৮	৬.২	.৮
৫	১.৮	.৫	৭	৩.৫	.৭	৯	৫.৫	.৭
৬	১.৬	.২	৮	৩.২	.৩	১০	৫.৩	.২
৭	১.৮		৯	৩.৬		১১	৫.৫	

উপরের রেখা থেকে আমরা একই উৎপাদনের জন্য উৎপাদন উপকরণগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সমাবেশ দেখছি। এখানে আরও দেখতে পাচ্ছি যে, যে কোনো একটি উপকরণের এক একক পরিবর্তনের সাথে অন্য এককে কী পরিবর্তন হচ্ছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে উপস্থিত করে। সেটি হলো, এখান থেকে আমরা এমন একটি অনুপাত পাই, যেখান থেকে একটি উপকরণ এক একক পরিবর্তনের ফলে অন্য এককের পরিবর্তনের প্রবণতা পাওয়া যায়। এটি একটির এক এককের বদলে অন্যটির চাহিদাকেও উপস্থিত করে। এই হারকেই বলে উৎপাদন বিকল্পের প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Technical Substitution বা MRTS)। এটি ভোক্তার পণ্য বিকল্পের প্রান্তিক হারের (Marginal Rate of Substitution) অনুরূপ।
এখানে

$$MRTS_{Lk} = \frac{M_{pl}}{M_{pk}}$$

সমব্যয় রেখা (Iso cost curve)

সমব্যয় রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যার প্রতিটি বিন্দুতে শ্রম ও পুঁজি বাবদ ব্যয়ের সেই বিন্যাসগুলো আছে যাতে মোট ব্যয় প্রতিটি বিন্দুতে সমান। এটিকে আরেক ভাষায় বলা যায়, উৎপাদনকারীর বাজেট লাইন। এই রেখা উৎপাদনকারীর ব্যয়সীমা দেখায়। এর ঢাল দেখানো যায় শ্রমের দাম ও পুঁজির দামের অনুপাত হিসাবে, এইভাবে:

$$-P_L/P_K$$

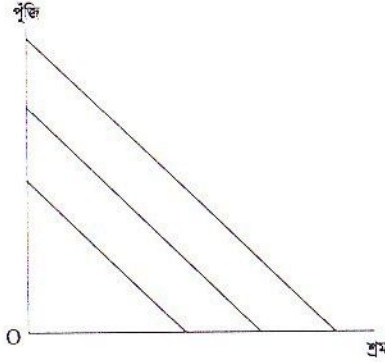
যেখানে P_L হলো শ্রমের দাম এবং P_K হলো পুঁজির দাম। উৎপাদন ব্যয় হলো।

$$C = P_K K + P_L L + b$$

পূর্ণ অন্তরীকরণ করলে $-\frac{dK}{dL} = \frac{P_L}{P_K}$ । এটিই সমব্যয় রেখার ঢাল।

অপরপৃষ্ঠায় সমব্যয় রেখা দেখানো হলো। খেয়াল করলে দেখা যাবে, রেখার এক প্রান্ত দেখায় পুরো টাকা খরচ করলে কতটা শ্রম পাওয়া যাবে এবং আরেক প্রান্ত দেখায়

পুরো টাকা খরচ করলে কতটা পুঁজি পাওয়া যাবে। রেখার বাকি অংশে বিভিন্ন অনুপাতে একটি উপাদানের পরিবর্তে আরেকটি উপাদান ব্যবহারের খরচ দেখানো হয়।



চিত্র ৫.৬: সমব্যয় রেখা

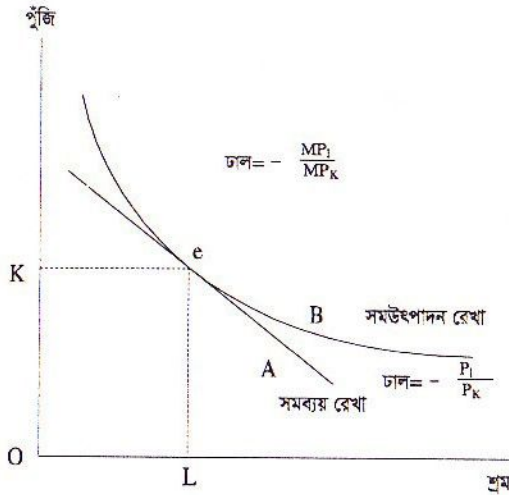
একজন উৎপাদকের জন্য দুটো উপকরণ ব্যবহার করে কতটা উৎপাদন হচ্ছে সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিন্যাসে তার ব্যয় কতটা হবে সেটাও। একই পরিমাণ উৎপাদনে যেহেতু বিভিন্ন উপকরণ বিন্যাসের কারণে বিভিন্ন খরচ হয় সেহেতু কোন বিন্যাসে উৎপাদন ব্যয় সবচাইতে কম সেই তথ্যটি উৎপাদনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা পরের পর্বে আলোচনা করেছি।

সারসংক্ষেপ

যে রেখায় একই উৎপাদনের জন্য শ্রম ও পুঁজির বিভিন্ন সমাবেশ পাওয়া যায়, সেই রেখাকে সমউৎপাদন রেখা বলা হয়। উপাদান বিকল্পের প্রান্তিক হার বলতে বোঝায় এমন একটি অনুপাত যা দিয়ে দুটো উৎপাদন উপাদানের একটির একক পরিবর্তনের ফলে অন্যটির পরিবর্তনের মাত্রা বোঝায়। অন্যদিকে সমব্যয় রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যার প্রতিটি বিন্দুতে শ্রম ও পুঁজি বাবদ ব্যয়ের সেই বিন্যাসগুলো আছে যাতে মোট ব্যয় প্রতিটি বিন্দুতে সমান।

উৎপাদকের ভারসাম্য

উৎপাদকের ভারসাম্য বিন্দু হিসেবে আমরা সেই বিন্দুকে নির্দেশ করতে পারি যেখানে নির্দিষ্ট ব্যয়সীমার মধ্যে উৎপাদক সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এখানে উৎপাদক শ্রম ও পুঁজির পেছনে তার যে ব্যয় হচ্ছে এবং শ্রম ও পুঁজির নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদক তার যে আয় হচ্ছে এই দুই এর মধ্যে সর্বোচ্চ কাম্যবিন্দুতে নিজের ভারসাম্য খুঁজবে।



চিত্র ৫.৭: উৎপাদকের ভারসাম্য

উপরের চিত্রের ভারসাম্য বিন্দুর এই অবস্থানটি নিচের সমীকরণ থেকেও আমরা বুঝতে পারি। এখান থেকে আমরা দেখছি যে, শ্রম ও পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার অনুপাত এবং শ্রম ও পুঁজির দামের অনুপাত সমান। অর্থাৎ উৎপাদক শ্রম ও পুঁজি যে দামে কিনছে তা সেগুলোর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান। তার মানে, এই দু'টি উৎপাদন উপকরণ উৎপাদকের জন্য এই নির্দিষ্ট অনুপাতে লোকসানের কারণ হবে না। e বিন্দুতে সম-উৎপাদন রেখার ঢাল এবং সমব্যয় রেখার ঢাল পরস্পর সমান; অর্থাৎ

সম-উৎপাদন ও সমব্যয় রেখার স্পর্শক বিন্দুতে উৎপাদকের ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। এখানে উৎপাদক L একক শ্রম ও K একক পুঁজি ব্যবহার করে Q পরিমাণ উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে।

ভারসাম্যের সূত্র তাই দাঁড়াবে এ রকম—

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{P_L}{P_K} \text{ অথবা, } \frac{MP_L}{P_L} = \frac{MP_K}{P_K}$$

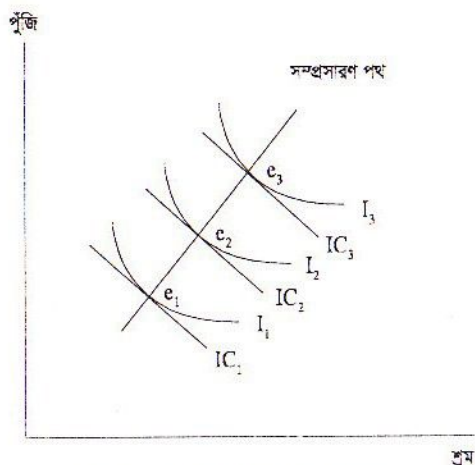
অর্থাৎ উৎপাদন উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও দামের অনুপাত সমান হলেই সেখানে উৎপাদকের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে বলে সূত্রায়ন পাওয়া যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, এখানে ধরে নেয়া হয়েছে যে, “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে” কিংবা “অন্যান্য অবস্থা এই সম্পর্কে প্রভাবিত না করবার অবস্থায় থাকবে”।

শ্রম ও পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার অনুপাত সেগুলোর দামের অনুপাতের সমান, এই সমীকরণ থেকে আমরা আরেকটি সমীকরণ টানতে পারি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও শ্রমের দামের অনুপাত পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও পুঁজির দামের অনুপাতের সমান।

ভারসাম্য বিন্দুর অন্য আরেকটি দিকও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিন্দুতে শ্রম ও পুঁজির উৎপাদনশীলতার এবং সেইসঙ্গে শ্রম ও পুঁজির দামের অনুপাত, যাকে একই সঙ্গে উপাদান বিকল্পের প্রান্তিক হারও বলা হয় তা সমান হয়। অর্থাৎ—

$$MRTS_{L,K} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{P_L}{P_K}$$

উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ



চিত্র ৫.৮: উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ

একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ক্রমাগতভাবে উচ্চতর পর্যায়ে উৎপাদনকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এতে তার সমউৎপাদন রেখা ক্রমান্বয়ে ডান দিকে সরে যায়। তার ফলে তাকে নতুন নতুন সমব্যয় রেখার সাথে ভারসাম্য স্থাপন করতে হয়। খেয়াল করলে আমরা দেখবো, এই ভারসাম্য বিন্দুগুলো উৎপাদকের জন্য ক্রমশ উচ্চতর উৎপাদন পর্যায়ে যাবার গতিমুখ নির্দেশ করছে। তাই আমরা যদি এইসব ভারসাম্য বিন্দু যোগ করি তাহলে এমন একটি রেখা পাবো যাকে আমরা বলতে পারি উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ (Production Expansion Path)। নিচের চিত্রে আমরা এটাই পরিষ্কারভাবে দেখছি।

উপরের চিত্রে আমরা দেখছি, শ্রম ও পুঁজির অনুপাত পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদক ক্রমান্বয়ে অধিক থেকে অধিকতর উৎপাদনের দিকে যাচ্ছে। সমউৎপাদন রেখা ও সমব্যয় রেখাগুলোর ভারসাম্য বিন্দুগুলো (e_1, e_2, e_3) যোগ করে আমরা পাচ্ছি উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ।

সারসংক্ষেপ

তাত্ত্বিক কাঠামোতে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রম ও পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার অনুপাত এবং শ্রম পুঁজির দামের অনুপাত যেখানে সমান, সেখানে উৎপাদকের ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। সম উৎপাদন রেখা ও সমব্যয় রেখাগুলোর ভারসাম্য বিন্দুগুলো যোগ করে উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ পাওয়া যায়।

কব ডগলাস উৎপাদক অপেক্ষক (Production Function)

একটি দ্রব্য উৎপাদন নিয়ে যে উৎপাদন অপেক্ষক তাকে আরেকভাবে বলা হয় কব ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক। কারণ এর বাস্তব ব্যবহার নিয়ে সি. ডব্লিউ. কব এবং পি. এইচ. ডগলাস ১৯২৮ সালে এই বিষয়ে প্রথম সূত্রায়ন করেন।^{১৬} উৎপাদন অপেক্ষক আলোচনা করতে গেলে এই নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন অপেক্ষককে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। এটি উৎপাদন উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা নির্ধারণ বা ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদনের সম্পর্ক বিশ্লেষণে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা হলো নিম্নরূপ:

$$Q = AL^\alpha K^\beta$$

এখানে Q হলো উৎপাদন, L এবং K হলো যথাক্রমে শ্রম ও পুঁজি। A , α এবং β হলো ধনাত্মক প্যারামিটার। α দিয়ে পুঁজি স্থির রেখে শ্রমের এক শতাংশ বৃদ্ধিতে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা বোঝা যাবে। একইভাবে β দিয়ে শ্রম স্থির রেখে পুঁজির এক শতাংশ বৃদ্ধিতে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা বোঝা যাবে। সে কারণেই আমরা বলতে পারি যে, α ও β হচ্ছে যথাক্রমে শ্রম ও পুঁজির উৎপাদন নমনীয়তা (elasticity)।

ছক ৪: শ্রমের মোট গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন

শ্রম	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
০	০
১	২০	২০	২০
২	২৮.২৮	১৪.১৪	৮.২৮
৩	৩৪.৬৪	১১.৫৫	৬.৩৬
৪	৪০.০০	১০.০০	৫.৩৬
৫	৪৪.৭২	৮.৯৪	৪.৭২

১৬. C.W. Cobb and P.H. Douglas: "A Theory of Production", The American Economic Review, 1928, Supplement. P.H. Douglas: "Are there Laws of Production?" The American Economic Review, 1948

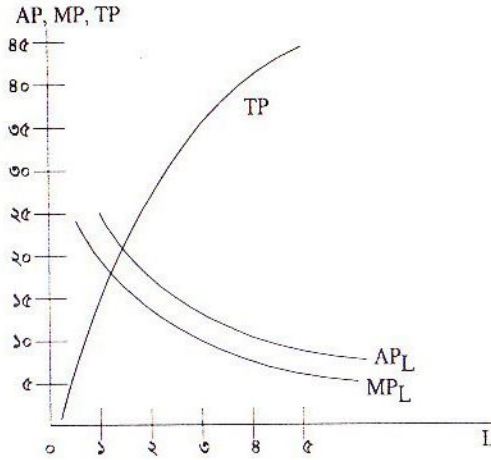
সেই কারণে যখন,

$\alpha + \beta = 1$ হয় তখন তা অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রা, যখন

$\alpha + \beta > 1$ হয় তখন তা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন মাত্রা এবং যখন

$\alpha + \beta < 1$ হয় তখন তা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন মাত্রা প্রকাশ করে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে কব-ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক এর ক্ষেত্রে $e_{LK}=1$



চিত্র. ৫.৯: কব-ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক-এ শ্রমের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা

এখানে উপরের ছক অনুযায়ী পুঁজি ৪ একক-এ স্থির রেখে শ্রমের একক বৃদ্ধি মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

নিচের ছকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পে ও পুঁজির উৎপাদন নমনীয়তা এবং তা থেকে উৎপাদন মাত্রার একটি চিত্র উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ছক ৫: বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পে শ্রম ও পুঁজির আপেক্ষিক অবস্থা

শিল্প	দেশ	α	β
১। টেলিফোন	কানাডা	.৭০	.৪১
২। গ্যাস	ফ্রান্স	.৮৩	.১০
৩। রাসায়নিক দ্রব্য	ভারত	.৮০	.৩৭
৪। বিদ্যুৎ	ভারত	.২০	.৬৭
৫। শিল্প যন্ত্রাংশ	যুক্তরাষ্ট্র	.৭১	.২৬
৬। খাদ্য	যুক্তরাষ্ট্র	.৭২	.৩৫
৭। যোগাযোগ	সেভিয়েত ইউনিয়ন	.৮০	.৩৮

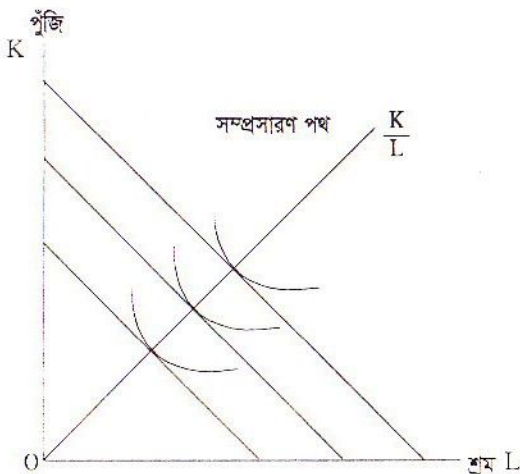
ছক ৬: বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন মাত্রা

শিল্প	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
$\alpha + \beta$	১.১১	০.৯৩	১.১৭	০.৮৭	০.৯৬	১.০৭	১.১৮
উৎপাদন মাত্রা	ক্রমবর্ধমান	ক্রমহ্রাসমান	ক্রমবর্ধমান	ক্রমহ্রাসমান	ক্রমহ্রাসমান	ক্রমবর্ধমান	ক্রমবর্ধমান

উৎস: Domonick Salvatore: *Microeconomics Theory*, 3rd ed.

ইউলার তত্ত্ব

উৎপাদন অপেক্ষক যখন সরল একক দ্রব্যের সম্পর্ক (linear homogeneous) নির্দেশ করে $Q=f(L,K)$ এবং অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রা দেখায় তখন আমরা এভাবে তা প্রকাশ করতে পারি: $Q=MP_L \cdot L + MP_K \cdot K$ । এখানে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী প্রতিটি উৎপাদন উপকরণ তার যে মূল্য পায় তার যোগফল মোট উৎপাদনের সমান। এর ফলে কোনো উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি থাকে না। এটিই ইউলার তত্ত্ব (Eulers Theorem) হিসেবে বিশেষভাবে খ্যাত। এটি গণিতবিদ Leonhard Euler প্রবর্তিত বলে তাঁর নামে পরিচিত। নয়া ক্লাসিকাল বিতরণ তত্ত্বেই এর উল্লেখ পাওয়া যায় বেশি।



চিত্র ৫.১০: কব-ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক এ সম্প্রসারণ পথ

উপরের চিত্রে কব-ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রা (Constant return to scale) অর্থাৎ $\alpha + \beta = 1$, প্রদর্শন করছে।

ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণ

আমরা এই পর্যন্ত এক পর্যায়ের ভোক্তার আচরণ ও তারপর উৎপাদকের আচরণ নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করেছি। খেয়াল করলে দেখা যাবে, ভোক্তা ও উৎপাদকের

আচরণ সম্পর্কিত এই তত্ত্বসমূহের মধ্যে এক ধরনের সাম্যজ্য আছে। ভোক্তা এবং উৎপাদকের ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সাম্যজ্য তৈরি হয়েছে বিশ্লেষণের অভিন্ন কঠামোর জন্য। আমরা দেখছি যে, একজন ভোক্তা ও একজন উৎপাদক, একটি পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে একক পণ্য ভোগ বা উৎপাদন, ভোক্তার জন্য উপযোগ বা উৎপাদকের জন্য মুনাফাকে লক্ষ্য বিবেচনা করে যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সেটাই বর্তমান 'মূলধারার' বা নয়া ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রের কেন্দ্রীয় বিষয়। নিচের ছকে তারই তুলনামূলক অবস্থান উপস্থিত করা হয়েছে।

ছক ৭: ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণের তুলনা

ভোক্তার আচরণ	উদ্যোক্তার আচরণ
১. অর্থনৈতিক এজেন্ট : ভোক্তা	১. অর্থনৈতিক এজেন্ট: উদ্যোক্তা
২. দ্রব্য: x ও y	২. উৎপাদন উপকরণ: L ও K
৩. উপযোগ অপেক্ষক $u(x,y)$ দিয়ে সন্তুষ্টি বোঝানো হয়।	৩. উৎপাদক অপেক্ষক $f(L,K)$ দিয়ে প্রযুক্তির অবস্থা বোঝানো হয়
৪. গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের বিষয়: প্রান্তিক উপযোগ (MU_x, MU_y)	৪. গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের বিষয়: প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L, MP_K)
৫. ভোক্তার সমান উপযোগ রেখা: নিরপেক্ষ রেখা	৫. উৎপাদকের সমউৎপাদন রেখা
৬. পণ্য বিকল্পের প্রান্তিক হার (MRS_x for y)	৬. উপাদান বিকল্পের প্রান্তিক হার ($MRTS_L$ for K)
৭. নিরপেক্ষ রেখার ঢালের অনপেক্ষ মান = MRS_x for $y = \Delta Y/\Delta X = MU_x/MU_y = \dots$	৭. সমউৎপাদন রেখার ঢালের অনপেক্ষ মান = $MRTS_L$ for $K = \Delta K/\Delta L = MP_L/MP_K$
৮. দ্রব্য বাজারে ভোক্তার দাম গ্রহণকারী	৮. উৎপাদন উপকরণ বাজারে উৎপাদকের দাম গ্রহণকারী
৯. বাজেট রেখা: $(P_x X) + (P_y Y) = M$	৯. সমব্যয় রেখা: $(P_L L) + (P_K K) = C$
১০. একটি নির্দিষ্ট আয়ে ভোক্তা চেষ্টা করে উপযোগ সর্বোচ্চ করতে।	১০. একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন করে উৎপাদক চেষ্টা করে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে।
১১. ভারসাম্য: $P_x/P_y = MU_x/MU_y$	১১. ভারসাম্য: $P_L/P_K = MP_L/MP_K$

সূত্র: G.S. Maddala, Ellen Miller: *Microeconomics*

সারসংক্ষেপ

এক দ্রব্য উৎপাদন নিয়ে যে উৎপাদন অপেক্ষক তাকে আরেকভাবে বলা হয় কব ভগলাস উৎপাদন অপেক্ষক। এই অপেক্ষক $e_{LK}=1$ যেখানে L ও K হলো যথাক্রমে শ্রম ও পুঁজি। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে একক পণ্য ভোগ বা উৎপাদন, উদ্যোক্তার মুনাফাকে লক্ষ্য করে যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, সেটাই নয়া ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রের কেন্দ্রীয় বিষয় হবার ফলে ভোক্তা ও উদ্যোক্তার আচরণ বিশ্লেষণের কঠামোটি অভিন্ন উপাদান নির্দেশ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উৎপাদন ব্যয় Production Cost

সকল বাজারে এমনকি সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই উৎপাদন সিদ্ধান্তের পেছনে ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। কিন্তু যেকোনো দ্রব্য উৎপাদনে যে ব্যয় হয় তার সবটুকু সাধারণ হিসাবের আওতায় আসে না। তাছাড়া ব্যয়ের গতিপ্রবাহ বিশ্লেষণে বিশেষ কিছু পদ্ধতিও অবলম্বন করা প্রয়োজন হয় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। এই অংশে ব্যয় বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক আলোচনা করা হয়েছে।

উৎপাদন ও ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

একজন উৎপাদকের সামনে সাধারণভাবে লক্ষ্য থাকে তিনটি: সর্বোচ্চ উৎপাদন, সর্বোচ্চ মুনাফা, সর্বনিম্ন ব্যয়। এর মধ্যে সবগুলো একসঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায় না। দেখা যায়, যেখানে সবচেয়ে বেশি মুনাফা হয় সেটা সর্বোচ্চ উৎপাদনের বিন্দু নয়। উৎপাদককে এর মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে হয়। নিচে উৎপাদনের সর্বোচ্চকরণ ও ব্যয় সর্বনিম্নকরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হচ্ছে।

একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান কতটা উৎপাদন করবে, কোন পর্যায়ে গিয়ে উৎপাদন আরো বাড়াবে কিংবা কোন পর্যায়ে কমাতে বা কমাতে বাধ্য হবে তার অনেকখানি নির্ভর করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যয় কী দাঁড়াচ্ছে তার উপর। কেননা ব্যয় এবং উৎপাদনের পরিমাণের যথাযথ বিন্যাসের উপরই নির্ভর করে সর্বোচ্চ মুনাফা। এই বিন্যাস ঠিকমতো দাঁড় করতে না পারলে অনেক সময়ই লোকসানের মধ্যে পড়তে হয়।

ছক ১: উৎপাদন ও ব্যয়

লক্ষ্য: উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ	লক্ষ্য: ব্যয় সর্বনিম্নকরণ
যেসব শর্ত দেয়া আছে:	যেসব শর্ত দেয়া আছে:
১. উপকরণ দাম	১. উৎপাদন উপকরণ দাম
২. মোট ব্যয় বা বাজেট সীমা	২. মোট উৎপাদনের লক্ষ্য
ফলাফল: সর্বোচ্চ উৎপাদন	ফলাফল: সর্বনিম্ন ব্যয়

ব্যয়ের বিভিন্ন ধরন

সাধারণত উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হিসেবে যে ব্যয় বিবেচনা করা হয় তাকে বলে প্রকাশ্য ব্যয় (Explicit Cost)। তার বাইরে আরও অনেক রকম ব্যয় তার থাকতে পারে, যেগুলোকে বলা যায় অপ্রকাশ্য ব্যয় (Implicit Cost)।

তাহাড়া আমাদের দেশের মতো দেশগুলোতে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে কিংবা এমন অনেক কৃষি খামার আছে যেখানে ব্যয় হিসাব করবার সময় নিজেদের পরিবারের শ্রমসময়ের ব্যয়ও হিসাব করা হয় না। তার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে মূল্যফার হিসাব অনেকখানি ফাঁকা থাকে। যাকে মনে হচ্ছে লাভজনক তা আসলে হয়তো লাভজনক নয়। এধরনের ব্যয়কে বলা যায় গুপ্ত ব্যয় (Hidden Cost)। এছাড়াও গুপ্ত ব্যয়ের মধ্যে আরো এমন ব্যয় থাকতে পারে যেগুলো প্রকাশ্য ব্যয় হিসাবে ধরা হয় না। এর মধ্যে ঘৃষ, চাঁদা ইত্যাদি থাকতে পারে।

যে কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে ব্যয় হয় তার একটি হচ্ছে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকের ব্যক্তিগত ব্যয় (Private Cost), কিন্তু এর বাইরে আরেকটি ব্যয় সাধারণত হিসাবের মধ্যে আনা হয় না যা হলো সামাজিক ব্যয় (Social Cost)। সামাজিক ব্যয় স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে পুরো সমাজের উপরই বর্তায়। পরিবেশসহ সমাজের সকল মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী সকল ফলাফলই এর অন্তর্ভুক্ত। অনেক ধরনের উৎপাদন আছে যেগুলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মালিকের জন্য খুবই লাভজনক কিন্তু তা সমাজের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করে। খেয়াল করলে দেখা যাবে বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে লাভজনক হবার কারণে সেসব খাতেই বিনিয়োগ সবচাইতে বেশি যেগুলোর সামাজিক ব্যয় অনেক বেশি। এসবের মধ্যে আছে সমরাস্ত্র উৎপাদন, মাদকদ্রব্য ব্যবসা ও উৎপাদন, উদ্ভেজক হিংসাত্মক প্রকাশনা বা চলচ্চিত্র নির্মাণ, বর্জ্য সৃষ্টিকারী শিল্প ইত্যাদি।

অপ্রকাশ্য ব্যয়ের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধরন হলো: সুযোগ বর্জন ব্যয় (Opportunity Cost)। সুযোগ বর্জন ব্যয়কে বিকল্প কাজের মূল্য হিসেবেও বর্ণনা করা যায়। যে কোনো কাজে ব্যবহৃত মানবিক বা ব্যক্তিগত সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় হলো সেই কাজ যা এই কাজ না করলে করা সম্ভব ছিল। যেমন, সামরিক খাতে বা প্রশাসনিক খাতে যে ব্যয় হয় তাকে সঠিকভাবে হিসাব করলে সেই সম্পদ দিয়ে কত বিদ্যালয় বা হাসপাতাল নির্মাণ করা যেত, সেটাই সামরিক বরাদ্দের সুযোগ ব্যয়।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের অসামঞ্জস্য

ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বা বৈপরীত্য বাজার অর্থনীতিতে প্রায়ই দেখা যায় তার সমাধান হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে কর বা ভর্তুকির প্রস্তাবনাও অর্থশাস্ত্রে খুবই পরিচিত বিষয়। এরকম প্রস্তাবনা বোঝার সুবিধার জন্য নিচের ছকটিতে এর সারসংক্ষেপ দেয়া হলো:

এখানে,

Marginal Social Cost (MSC) = প্রান্তিক (বা অতিরিক্ত একক উৎপাদনের জন্য)

সামাজিক ব্যয়।

Marginal Private Cost (MPC)= প্রান্তিক (বা অতিরিক্ত একক উৎপাদনের জন্য) ব্যক্তিগত ব্যয়।

Marginal Social Benefit (MSB)= প্রান্তিক (বা অতিরিক্ত একক উৎপাদন থেকে) সামাজিক লাভ।

Marginal Private Benefit (MPB)= প্রান্তিক (বা অতিরিক্ত একক উৎপাদন থেকে) ব্যক্তিগত লাভ।

অবশ্য কোয়স নামে এক অর্থনীতিবিদ বলেছেন, কর আরোপ বা ভর্তুকি দিতে সরকার যা করবেন তাতে আরও ব্যয় বাড়বে। তাঁর মতে যারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তারা সরাসরি নিজেরা ভূমিকা পালন করলেই তা অধিকতর কার্যকর হবে। তাঁর ধারণা পরে কোয়স তত্ত্ব (Coase Theorem) নামে পরিচিতি লাভ করে।

ছক ২: ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়

অবস্থা	কর বা ভর্তুকি কাকে	কর বা ভর্তুকির পরিমাণ
$MSC > MPC$	উৎপাদকের উপর কর	$MSC - MPC$
$MSC < MPC$	উৎপাদককে ভর্তুকি	$MPC - MSC$
$MSB > MPB$	ভোক্তাদের উপর কর	$MPB - MSB$
$MSB < MPB$	ভোক্তাদের ভর্তুকি	$MSB - MPB$

সারসংক্ষেপ

একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান কতটা উৎপাদন করবে, কোন পর্যায়ে গিয়ে উৎপাদন আরো বাড়াবে কিংবা কোন পর্যায়ে কমাতে বা কমাতে বাধ্য হবে তার অনেকখানি নির্ভর করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যয় কী পরিমাণ হচ্ছে তার উপর। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ও বাইরে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হয়। যেমন প্রকাশ্য ব্যয়, সামাজিক ব্যয় ইত্যাদি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়-এর অসমঞ্জস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়

মুনাফাভিত্তিক ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনীতিতে উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য এবং ব্যক্তিগত মোট ব্যয়কে (Total Cost, TC) আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি: স্থির ব্যয় (Fixed cost, FC) ও পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost, VC)।

স্থির ব্যয় হচ্ছে নির্দিষ্ট মেয়াদে মোট ব্যয়ের সেই অংশ যেটি উৎপাদন কমানো বা বাড়ানোর সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে: অফিস বা কারখানা ভূমি ভাড়া, ভবন নির্মাণ, যন্ত্র ক্রয় বা ভাড়া, ঋণের সুদ, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি। পরিবর্তনীয় ব্যয় হচ্ছে মোট ব্যয়ের সেই অংশ যেটি উৎপাদন কমানো বা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ মোট ব্যয় (TC) = স্থির ব্যয় (FC) + পরিবর্তনীয় ব্যয় (VC)।

স্বল্পমেয়াদ ও দীর্ঘমেয়াদ (Short Run and Long Run)

মোট ব্যয়ের মধ্যে স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয় হিসেবে বিভাজন কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদেই প্রযোজ্য, দীর্ঘমেয়াদে নয়। কারণ অর্থশাস্ত্রে স্বল্পমেয়াদ বা দীর্ঘমেয়াদ বলতে নির্দিষ্ট কোন সময় বোঝায় না। এটি বস্তুত উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবস্থানকেই নির্দেশ করে। যেমন: স্বল্পমেয়াদ বা Short run বলতে কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের এমন একটি সময়কালকে বোঝানো হয় যখন সেখানে উৎপাদন পরিকল্পনা, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি অপরিবর্তিত থাকে। সে কারণে স্বল্পমেয়াদে স্থির ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আবার দীর্ঘমেয়াদ বা Long run বলতে কোন উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের এমন একটি সময়কালকে বোঝানো হয় যখন সেখানে উৎপাদন পরিকল্পনা, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি সবকিছুই পরিবর্তিত হয়। তার ফলে দীর্ঘমেয়াদে স্থির ব্যয় বলে কিছু নেই।

সর্বনিম্ন ব্যয়বিধি (Least Cost Rule)

যে কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করতে গিয়ে মোটামুটি তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রাখে: ব্যয় সর্বনিম্নকরণ, মুনাফা সর্বোচ্চকরণ এবং উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ। কিন্তু এই তিনটি লক্ষ্য একই সঙ্গে পূরণ করা কঠিন। সে কারণে এর মধ্যে বাছাই করে নিতে হয়।

সর্বনিম্ন ব্যয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করবার জন্য এমনভাবে উৎপাদন উপকরণ ক্রয় করা উচিত যাতে তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তার দামের সমান হয়।

এভাবে বিন্যস্ত হলে, উদাহরণ হিসেবে, শ্রম এবং বিদ্যুৎ ধরলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও তার একক প্রতি দামের অনুপাত এবং বিদ্যুৎ এর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও তার একক প্রতি দামের অনুপাত সমান হবে:

শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন/শ্রমের একক প্রতি দাম = বিদ্যুতের প্রান্তিক উৎপাদন/বিদ্যুতের একক প্রতি দাম = ...।

স্যামুয়েলসন এই দুটো উপাদানের উদাহরণ তেনে দেখিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন বিন্যাস থেকে সর্বনিম্ন ব্যয় অনুসন্ধান করা যায়। ধরা যাক দুটো বিন্যাস (১) ৫ একক বিদ্যুৎ + ৫ একক শ্রম এবং (২) ৭ একক বিদ্যুৎ + ৩ একক শ্রম থেকে একই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যয়ের দিকে দেখলে দুটো বিন্যাসে দু'রকম ব্যয় পাওয়া যাবে। এক একক বিদ্যুতের দাম ৫ টাকা এবং এক একক শ্রমশক্তির দাম ২ টাকা ধরলে

বিন্যাস ১: $5 \times 5 + 5 \times 2 = 35$ টাকা এবং

বিন্যাস ২: $7 \times 5 + 3 \times 2 = 37$ টাকা লাগবে।

অর্থাৎ একই উৎপাদন প্রদানকারী বিন্যাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানকে খুঁজে বের করতে হয় সর্বনিম্ন ব্যয়ের বিন্যাস। একেই বলে সর্বনিম্ন ব্যয়বিধি (Least Cost Rule)।

খরচের মাত্রা (Economies of Scale)

আমরা এর আগে উৎপাদন মাত্রা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এই উৎপাদন মাত্রার সাথে সম্পর্কিত এবং সামগ্রিক উৎপাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আরেকটি যে ধারণার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া দরকার সেটি হলো: খরচের মাত্রা। খরচের মাত্রা বলতে বোঝায় উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খরচের ক্ষেত্রে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটি। খরচের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া কী হবে অর্থাৎ উৎপাদন বাড়ালে খরচ বাড়বে না কমবে, বাড়লে কী হারে বাড়বে ইত্যাদি অনেক কিছু উপর নির্ভর করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি, উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সহ বহিঃস্থ নানা ধরনের শর্তাবলী ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

যদি দেখা যায় উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় কমে আসছে, তাহলে বলতে হবে মাত্রাভুক্ত ব্যয় (Economies of Scale) হচ্ছে আর যদি দেখা যায় উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে তাহলে তাকে আমরা বলতে পারি মাত্রাবিহীন ব্যয় (Diseconomies of Scale) যতক্ষণ এই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবেই থাকে ততক্ষণ এগুলো যথাক্রমে অভ্যন্তরীণ মাত্রাভুক্ত ব্যয় (Internal Economies of Scale) ও অভ্যন্তরীণ মাত্রাবিহীন ব্যয় (Internal Diseconomies of Scale) বলতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উৎপাদন ব্যয় সবসময় অভ্যন্তরীণ শর্তের উপর নির্ভর করে না। বহিঃস্থ অনেক কারণ কখনো উৎপাদন ব্যয় কমায়, কখনো উৎপাদন ব্যয় বাড়ায়।

যেমন, কোথাও যদি যোগাযোগ ও পরিবহন-এর উন্নয়ন হয় তাহলে খুবই সম্ভব যে, সেই স্থানের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় কমে আসবে। আবার কোথাও যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে যোগাযোগ ও পরিবহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়

কিংবা যদি কোথাও সম্ভ্রাস বা চাঁদাবাজি বাড়তে থাকে তাহলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। বহিঃস্থ কারণে যদি কোনো উৎপাদনের ব্যয় কমে আসে তাহলে তাকে আমরা বলতে পারি বহিঃস্থ মাত্রাভুক্ত ব্যয় (External Economies of Scale) এবং একইভাবে যদি বহিঃস্থ কারণে কোনো উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে যায় তাহলে তাকে আমরা বলতে পারি বহিঃস্থ মাত্রাভুক্ত ব্যয় (External Diseconomies of Scale)।

সারসংক্ষেপ

স্বল্পমেয়াদ বলতে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের এমন একটি সময়কালকে বোঝায় যখন সেখানে উৎপাদন পরিকল্পনা, প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি অপরিবর্তিত থাকে। দীর্ঘমেয়াদে এসব কিছুই পরিবর্তিত হয়। ব্যয় সর্বনিম্নকরণ, মুনাফা সর্বোচ্চকরণ এবং উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ— এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু সবগুলো লক্ষ্য একইসঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায় না বলে এর মধ্যে বাছাই করে নিতে হয়।

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়

ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাস বিচার করতে গেলে মোট ব্যয়ের গতিবিধি পর্যালোচনাই যথেষ্ট নয়। ব্যয়-এর প্রবণতা ঠিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে আরও একটি দিক নিয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার। এগুলো হলো গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সম্পর্কে ধারণা এবং দুটোর পারস্পরিক সম্পর্ক।

গড় ব্যয় (Average Cost) বলতে মোট ব্যয়ের সঙ্গে মোট উৎপাদনের অনুপাতকে বোঝায়। আর প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost) বলতে অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাকে বোঝায়। অর্থাৎ এই হিসাব থেকে আমরা বুঝতে পারি কোন পর্যায়ে অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত কত খরচ হচ্ছে।

নিচের ছকে একটি কাল্পনিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন এককের উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে উৎপাদনের স্থির ব্যয়, পরিবর্তনীয় ব্যয়, প্রান্তিক গড় ব্যয় ইত্যাদি দেখানো হয়েছে।

এখানে দেখতে পাচ্ছি, উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু স্বল্পমেয়াদে স্থির ব্যয়, যেহেতু স্থির, সুতরাং অপরিবর্তিত থাকছে। পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়ছে, সেহেতু মোট ব্যয়ও বাড়ছে। প্রান্তিক ব্যয় কিছুদূর পর্যন্ত কমে তারপর বাড়ছে। গড় স্থির ব্যয় কমছে, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় কিছুদূর কমে আবার বাড়ছে। গড় ব্যয় কমে আবার বাড়ছে।

ছক ৩: ব্যয়ের বিভিন্ন দিক ও ব্যাখ্যা

পরিমাণ (Q) (১)	স্থির ব্যয় (FC) (২)	পরিবর্তনীয় ব্যয় (VC) (৩)	মোট ব্যয় (TC=FC+VC) (৪)=(২)+(৩)	প্রান্তিক ব্যয় (MC) (৫)	গড় ব্যয় (AC=TC/Q) (৬)=(৪)/(১)	গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (AVC=VC/Q) (৭)=(৩)/(১)	গড় স্থির ব্যয় (APC=FC/Q) (৮)=(২)/(১)
০	৩৫	-	৩৫	-	-	-	-
১	৩৫	২৪	৫৯	৫৯-৩৫=২৪	৫৯/১=৫৯	২৪/১=২৪	৩৫/১=৩৫
২	৩৫	৪০	৭৫	৭৫-৫৯=১৬	৭৫/২=৩৭	৪০/২=২০	৩৫/২=১৭
৩	৩৫	৬০	৯৫	৯৫-৭৫=২০	৯৫/৩=৩২	৬০/৩=২০	৩৫/৩=১২
৪	৩৫	৮৫	১২০	১২০-৯৫=২৫	১২০/৪=৩০	৮৫/৪=২১	৩৫/৪=৯
৫	৩৫	১১৫	১৫০	১৫০-১২০=৩০	১৫০/৫=৩০	১১৫/৫=২৩	৩৫/৫=৭
৬	৩৫	১৫৫	১৯০	১৯০-১৫০=৪০	১৯০/৬=৩২	১৫৫/৬=২৬	৩৫/৬=৬
৭	৩৫	২১০	২৪৫	২৪৫-১৯০=৫৫	২৪৫/৭=৩৫	২১০/৭=৩০	৩৫/৭=৫
৮	৩৫	২৯৫	৩৩০	৩৩০-২৪৫=৮৫	৩৩০/৮=৪১	২৯৫/৮=৩৭	৩৫/৮=৪

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেখি, যতক্ষণ প্রান্তিক ব্যয় (MC) গড় ব্যয় (AC)-র নিচে থাকে, ততক্ষণ এটি (AC)-কে নিচে টানতে থাকে অর্থাৎ ততক্ষণ AC-কমতে থাকে। যখন MC, AC-র সমান হয়ে যায়, AC তখন কমেও না কিংবা বাড়েও না, তখন এটি থাকে নিম্নতম পর্যায়ে। MC যখন AC-এর উপর থাকে এটি AC-কে উপরে টানতে থাকে। অর্থাৎ এই অবস্থায়, AC উপরে উঠতে থাকে। সুতরাং U আকৃতির AC-র সর্বনিম্ন পর্যায়ে,

$MC=AC=$ সর্বনিম্ন AC। বিষয়টি দেখানো যায় নিম্নরূপ:

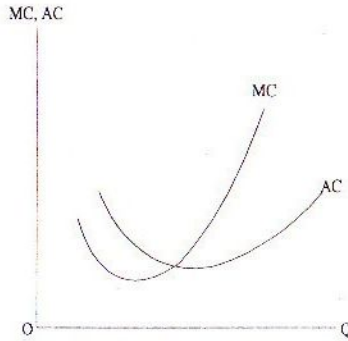
$TC=f(Q)$ মোট ব্যয়।

$TC/Q=f(Q)/Q=h(Q)$ গড় ব্যয়।

$MC=dTC/dQ=$ প্রান্তিক ব্যয়।

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্ষেপে এভাবে দেখানো যায়:

১. যখন $MC < AC$, তখন উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে AC কমতে থাকবে।
২. যখন $MC > AC$, তখন উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে AC বাড়তে থাকবে।
৩. যখন AC নিম্নতম, তখন $AC=MC$



চিত্র ৬.১: গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের চিত্র

উপরের চিত্রে, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় এর সম্পর্ক স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

গড় ব্যয় বলতে মোট ব্যয়ের সঙ্গে মোট উৎপাদনের অনুপাতকে বোঝায়। আর প্রান্তিক ব্যয় বলতে অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাকে বোঝায়। যতক্ষণ প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের নিচে থাকে ততক্ষণ এটি গড় ব্যয়কে নিচে টানতে থাকে অর্থাৎ ততক্ষণ গড় ব্যয় কমতে থাকে। যখন প্রান্তিক ব্যয়, গড় ব্যয়ের সমান হয়ে যায়, গড় ব্যয় তখন কমেও না কিংবা বাড়েও না, তখন এটি থাকে নিম্নতম পর্যায়ে। প্রান্তিক ব্যয় যখন গড় ব্যয়ের উপরে থাকে এটি তখন গড় ব্যয়কে ওপরে টানতে থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

বাজার ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা Market and Perfect Competition

বাজারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক তৎপরতা যতই বেড়েছে, অর্থশাস্ত্রে বাজার সম্পর্কিত বিশ্লেষণের গুরুত্বও ক্রমাগত ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতেও বাজারের বিবর্তন হয়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। বাজার সম্পর্কিত বিশ্লেষণ অনেকটাই অনুমিতিনির্ভর, সে কারণে সেগুলো অব্যাহত পর্যালোচনার বিষয়। এই অধ্যায়ে বাজারের বিবর্তন, বাজারের বিভিন্ন ধরন, বিভিন্ন বাজারের দাম, মুনাফা, উৎপাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাজারের যতগুলো ধরন অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়, তার মধ্যে নিখুঁত প্রতিযোগিতার ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে।

বাজার সম্পর্কিত ধারণা

বাজার বলতে সাধারণতঃ স্থান বোঝালেও আমরা আগেও বলেছি যে, অর্থশাস্ত্রে বাজার হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় বিক্রয় হয়। আলফ্রেড মার্শাল ফরাসী অর্থনীতিবিদ এ. কোরনট-এর কাছ থেকে গৃহীত সংজ্ঞায় বলেছিলেন যে, 'বাজার হলো একটি বিশাল এলাকা যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা এমনভাবে কেনাবেচা করতে পারবে যাতে একই দ্রব্যের দাম খুব দ্রুত এবং সহজে এক হয়ে যেতে পারে' মার্শাল পরে এর সঙ্গে আরও যোগ করেছিলেন যে, "একটি বাজার যতই নিখুঁত হবে ততই তার সকল এলাকা জুড়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দ্রব্যের একই দাম হবে।" বর্তমান কালে বাজার সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তার উৎস পাওয়া যাবে অ্যাডাম স্মিথের লেখায়। তিনি বলেছিলেন, "শ্রম বিভাজন নির্ভর করে বাজারের বিস্তৃতির উপর" উল্টো দিক থেকে দেখাটাই অনেকে ঠিক মনে করেন; "বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে শ্রম বিভাজনের বিকাশের উপর।"

উনিশ শতক পর্যন্ত প্রধান অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পদ বিভিন্ন ব্যবহারকারীর মধ্যে বরাদ্দ করবার বিষয়ে যতটা মনোযোগী দেখা যায় ততটা প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিয়ে দেখা যায় না। বাজার নিয়ে সবচাইতে সুসংগঠিতভাবে কাজ করেছিলেন লিয়ন ওয়ালরাস তাঁর সাধারণ ভারসাম্য ব্যবস্থার (general equilibrium system) মধ্য দিয়ে। তিনি সে সময়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর গণিতিক কাঠামো এখন পর্যন্ত খুবই প্রভাবশালী,

কিন্তু তাঁর কাজে দুটো ত্রুটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এর একটি হলো: সময়কে হিসাবের মধ্যে না নেয়া, অর্থাৎ মানুষের বর্তমান কাজের উপর তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তার প্রভাব এবং দ্বিতীয়টি হলো মানুষের বিভিন্ন অংশের ক্রয়ক্ষমতার ফলাফলকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা। তাছাড়া বাস্তব জগতে এর প্রয়োগ নিয়ে অর্থনীতিবিদের মধ্যে সংশয় ব্যাপক।

এই সময়ের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এরকম বিশ্বাসই প্রধান ছিল যে, বাজারের অব্যাহত ক্রিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করবে। বেকারত্ব সৃষ্টি হতে পারে কেবলমাত্র মজুরি বাড়লেই। এই তত্ত্বের কাঠামোর দুর্বলতা গত শতাব্দীর ৩০ দশকের মহামন্দার আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই তত্ত্বের কাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেন মাইকেল কালেকি, জে.এম. কেইনস, জোয়ান রবিনসন প্রমুখ। বাজারের স্বয়ংক্রিয়তা ও ভারসাম্য ধারণাকেই তাঁরা সমালোচনা করেন। এই ভারসাম্য ধারণা গড়ে উঠেছিল 'নিখুঁত প্রতিযোগিতা'র উপর ভিত্তি করে। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একটি পণ্য নিয়ে অনেক উৎপাদক নিখুঁত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, প্রত্যেকে যোগান দেয় অনুল্লেখ্য মাত্রায়। বাজারই পণ্যের দাম নির্ধারণ করে এবং প্রত্যেক উৎপাদক ততটুকু মাত্রায় বিক্রি করে মুনাফা সর্বোচ্চ করবে যতটুকুতে প্রান্তিক ব্যয় দামের সমান হবে, অর্থাৎ এমন পরিমাণ যার থেকে উৎপাদন বাড়লে প্রান্তির চাইতে ব্যয় বেশি হবে।

বাস্তব জগতে এই অবস্থা দেখা যায় না। বলেই 'ত্রুটিযুক্ত প্রতিযোগিতা' (Imperfect Competition) ধারণা অর্থশাস্ত্রে যোগ হয়েছে ৩০-এর দশকেই। এখানে এই বিষয়টিই বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে যে, বাস্তব জগতে আসলে 'নিখুঁত প্রতিযোগিতা'র কোন অস্তিত্ব নেই। এর অর্থ হলো দাম নির্ধারণে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন নীতি থাকতে পারে।

বর্তমান বাজারের প্রেক্ষাপট

বর্তমান সময়ে আমরা যে বাজার এবং বাজার প্রক্রিয়া দেখতে পাই তার একটি বিকাশ ধারা আছে। এটি বিভিন্ন দিক থেকে বিকশিত হয়ে আজকের এই পর্যায়ে এসেছে।

প্রথমত আমরা এর উৎস দেখি পুরনো গ্রামীণ মেলায়। নিজের ভোগ আর ভূষামীর খাজনা দেয়ার মাধ্যমানেই কৃষক নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু দ্রব্য নিয়ে বাজারে উপস্থিত হতো। যে বাজার ছিল বস্তুতঃ বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে উৎসবমুখর মিলনমেলা।

দ্বিতীয়ত আমরা বাজারের উৎস দেখি ভূষামীদের খাজনার মধ্যে। এই খাজনা সাধারণত পরিশোধ করা হতো শস্যে। ভূষামীরা এগুলো বিক্রি করে ভোগবিলস, সেনাবাহিনী প্রতিপালনসহ বিভিন্ন খরচ করতে। এর মধ্য দিয়ে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বিভিন্ন নগরের উদ্ভব।

তৃতীয়ত আমরা বাজারের বিকাশের পেছনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখি

অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনেক প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশের বাণিকেরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র-পাহাড় পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্য করেছেন। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পণ্য চলাচল ও কেনাবেচা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং সেইসূত্রে বাজারও বিস্তৃত হতে থাকে। বাজারের সম্প্রসারণ ব্যাপক গতিবেগ লাভ করে যখন শিল্প উৎপাদন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে আসতে সক্ষম হয় অর্থাৎ শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল বিষয়ে পরিণত হয়।

বাজারের নির্ধারক

বাজার কাঠামো সবসময়ই একটি অর্থনীতি বিশেষত একটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাজার কাঠামোতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো:

- (১) শিল্পে উদ্যোক্তাদের কেন্দ্রীভবনের মাত্রা
- (২) পণ্য পৃথকীকরণের মাত্রা এবং
- (৩) একজন নতুন বিক্রেতার শিল্পে প্রবেশের সুবিধা বা অসুবিধা।
- (৪) তথ্য প্রবাহের স্বরূপ

এসব শর্তের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি দিয়ে আমরা বিভিন্ন বাজারকে শনাক্ত করতে পারি।

বাজারের বিভিন্ন ধরন

বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে বাস্তব ও কাল্পনিক সম্ভাবনা হিসেবে আমরা বাজারের যে কয়টি ধরন নির্দিষ্ট করতে পারি সেগুলো হলো:

১. নিখুঁত প্রতিযোগিতা (Perfect competition)
২. নিখুঁত একচেটিয়া (Perfect monopoly)
৩. একচেটিয়াসম প্রতিযোগিতা (Monopolistic competition)
৪. বিপরীত একচেটিয়া (Monopsony)
৫. পৃথকীকৃত একচেটিয়া (Discriminating monopoly)
৬. দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া (Bilateral monopoly)
৭. দ্বৈত একচেটিয়া (Duopoly)
৮. গোষ্ঠী একচেটিয়া (Oligopoly)

এর মধ্যে প্রথমটি বাদে সবগুলোই বা অনিখুঁত কৃত্রিম প্রযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দু'টি অর্থাৎ নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও নিখুঁত একচেটিয়া চরম দুই সম্ভাব্য অবস্থার তাত্ত্বিক সূত্রায়ন যা বাস্তব জগতে সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া কঠিন। তবে এই সূত্রায়ন তুলনামূলক অ্যালোচনার জন্যই বেশি কার্যকর। বাজারের বাকি বরেনগুলি বরঞ্চ বেশি বাস্তব।

ছক ১: বাজারের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ধরন	নিখুঁত প্রতিযোগিতা		ক্রটিযুক্ত প্রতিযোগিতা	
	নিখুঁত	মনোপলিস্টিক	ওলিগোপলি	মনোপলি
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	প্রচুর	প্রচুর	কিছু	একটি
দামের উপর নিয়ন্ত্রণ	নাই	সীমিত	মেটামুটি	পুরোপুরি
প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা	নাই	নাই	অনেকখানি	প্রবল
পণ্যের ধরন	সমরূপ	পৃথকীকৃত	সমরূপ কিংবা পৃথকীকৃত	কোনো বিকল্প নাই
প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীলতা	নাই	নাই	অনেকখানি	প্রত্যক্ষ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই

সারসংক্ষেপ

বাজার কঠামো নির্দিষ্টকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো: শিল্পে উদ্যোক্তাদের কেন্দ্রীভবনের মাত্রা, পণ্য পৃথকীকরণের মাত্রা, একজন নতুন উদ্যোক্তার শিল্পে প্রবেশের সুবিধা বা অসুবিধা এবং তথ্যের প্রবাহের স্বরূপ। বাজারকে মূলতঃ নিখুঁত এবং অনিখুঁত প্রতিযোগিতায় ভাগ করা যায়। নিখুঁত একচেটিয়া, একচেটিয়াসম প্রতিযোগিতা, বিপরীত একচেটিয়া, পৃথকীকৃত একচেটিয়া, বিপাকিক একচেটিয়া, দ্বৈত একচেটিয়া, গোষ্ঠী একচেটিয়া বাজার সবই অনিখুঁত প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত।

নিখুঁত প্রতিযোগিতা কী?

নিখুঁত প্রতিযোগিতার ধারণাটি অনেকদিন থেকেই অর্থশাস্ত্রে গুরুত্ব নিয়ে অবস্থান করেছে। অ্যাডাম স্মিথের Wealth of nations গ্রন্থে এই ধারণাটি অলোচিত হয়েছে, কিন্তু তা কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো পায়নি। প্রান্তিকতাবাদীদের পর ১৮৮১ সালে এডওয়ার্থ (Edgeworth) তাঁর লেখা গ্রন্থ Mathematical Physics-এ এই ধারণাটি একটি সুসংবদ্ধ কাঠামোতে উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। ধারণাটি সম্পূর্ণ একটি চিত্র পায় ফ্রাংক নাইটের লেখায় Risk, Uncertainty and Profit. ১৯২১ সালে।

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাজারের যে কয়টি ধরন বর্তমান প্রধান অর্থশাস্ত্রে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়, নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজার তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি চরম অবস্থা যার বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সকলেই সন্দেহন। কিন্তু তারপরও এই বাজার কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক অনুমিতি, শর্ত বা সিদ্ধান্ত অন্যান্য ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা পাই। তাত্ত্বিক সূত্রায়ন অনুযায়ী কোন বাজারকে আমরা তখনই নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক একটি বাজার বলতে পারবো যখন তা নিম্নোক্ত শর্তগুলি পূরণ করবে:

- (ক) অসংখ্য প্রতিষ্ঠান: এই বাজারে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান কাজ করে। অসংখ্য হবার ফলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অংশ এতই ক্ষুদ্র যে, পুরো উৎপাদন ও দাম নির্ধারণে তার কোনো প্রভাব থাকে না। তার প্রবেশ বা প্রস্থানও বাজারের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। এখানে উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো দাম গ্রহীতা (price taker), কোনভাবেই দাম নির্ধারক (price maker) নয়।
- (খ) অসংখ্য ক্রেতা: এই বাজারে ক্রেতার সংখ্যাও থাকে অসংখ্য। অসংখ্য ক্রেতা বাজারে উপস্থিত থাকবার ফলে কোনো একক ক্রেতার পক্ষে বাজারের উপর অলাদা কোনো প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কোনো একক ক্রেতার প্রবেশ বা প্রস্থান দিয়েও বাজারের কার্যক্রম প্রভাবিত হয় না।
- (গ) তথ্যের অবাধ প্রবাহ: এই বাজারে কোনো তথ্যই গোপন নয়। দ্রব্যের মূল্য, বিক্রেতার কৌশল কোন কিছুই তাই ভোক্তাকে প্রতারণা করতে পারে না। সকল তথ্য প্রকাশিত থাকবার ফলে বাজার কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়।
- (ঘ) দ্রব্যের সমরূপতা: এই বাজারে সমরূপ দ্রব্যই উপস্থিত থাকে। অর্থাৎ সকল প্রতিষ্ঠানই এই বাজারে একই দ্রব্য উৎপাদন করে।

(ঙ) প্রবেশ ও প্রস্থানের স্বাধীনতা: এই বাজারে প্রবেশ বা এই বাজার থেকে প্রস্থানের ব্যাপারে কোনোরকম প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিধিনিষেধ থাকে না। অর্থাৎ যে কোনো উৎপাদক বা ভোক্তা এই বাজারে অবাধে প্রবেশ বা এই বাজার থেকে অবাধে প্রস্থান করতে পারে।

এই শর্তগুলির কোনো একটিও পূরণ না হলে তাকে আর নিখুঁত প্রতিযোগিতা বলা যায় না। সেটি তখন কোনো না কোনো ধরনের অনিখুঁত বাজারের ধরন হয়ে যাবে।

নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারণ ও মুনাফা সর্বোচ্চকরণ

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উৎপাদন, দাম, মুনাফা নির্ধারণের প্রক্রিয়া বোঝার জন্য সামগ্রিক বিশ্লেষণ ও প্রান্তিক বিশ্লেষণ দুটোই ব্যবহার করা যায়। সামগ্রিক বিশ্লেষণে মোট আয়, মোট ব্যয় ও মোট মুনাফা দিয়ে এবং প্রান্তিক বিশ্লেষণে আমরা প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক ব্যয় এবং মুনাফার তথ্য থেকে ভারসাম্য উৎপাদন ও সর্বোচ্চ উৎপাদন বের করতে পারি।

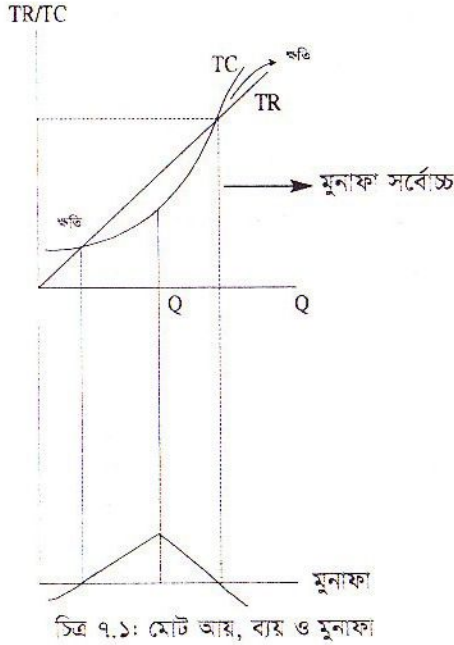
ছক ২: নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উৎপাদন ও মুনাফার চিত্র

উৎপাদনের পরিমাণ (q)	দাম (P)	মোট আয় TR (q)	মোট ব্যয় TC (q)	মোট মুনাফা (r)
০	৮৩৫	৮০	৮৩০	৮-৩০
১	৩৫	৩৫	৫০	-১৫
১.৫	৩৫	৫২.৫০	৫২.৫০	০
২	৩৫	৭০	৬০	+১০
৩	৩৫	১০৫	৭৫	+৩০
৩.৫	৩৫	১২২.৫০	৯১	+৩১.৫০
৪	৩৫	১৪০	১১০	+৩০
৫	৩৫	১৭৫	১৭৫	০
৫.৫	৩৫	১৯২.৫০	২২০	-২৭.৫০

এখানে, $TR(q) - TC(q)$ r = মুনাফা যেখানে $TR(q)$ = মোট আয় এবং $TC(q)$ = মোট ব্যয়।

উপরের ছকে আমরা দেখছি নিখুঁত বাজার হবার কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু ব্যয়ের কারণে উৎপাদনের সকল পর্যায়ে মুনাফা একই রকম হচ্ছে না। আয় এবং ব্যয় সমান সমান হচ্ছে দুটো বিন্দুতে, ১.৫ একক উৎপাদনের সময়ে এবং ৫ একক উৎপাদনের সময়ে। কিন্তু দুই বিন্দুর তাৎপর্য সমান নয়। প্রথমটিতে যখন মুনাফা শূন্য হচ্ছে তখন উৎপাদক আরও উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ অনুভব করবে, কিন্তু পরেরবার যখন মুনাফা শূন্য হবে তখন উৎপাদক আর উৎপাদন বাড়তে চাইবে না। এর কারণ আমরা ছক থেকেই বুঝতে পারি। যখন উৎপাদন ১.৫

একক তখন মুনাফা শূন্য, এর আগের উৎপাদনের বিন্দুতে ছিল লোকসান, এরপরের উৎপাদনে আমরা দেখছি মুনাফা ধনাত্মক। মুনাফা এরপর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। ক্রমান্বয়ে ৩.৫ একক উৎপাদনের সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা হয়। অর্থাৎ এরপর উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার পরিমাণ আন্তে আন্তে কমতে থাকে এবং ৫ এককের সময়ে মুনাফা শূন্য হয়ে যায়। এর পর উৎপাদনে এই অবস্থার কোন উন্নতি না হয়ে বরঞ্চ অবনতি হয় অর্থাৎ লোকসান শুরু হয়।



চিত্র ৭.১: মোট আয়, ব্যয় ও মুনাফা

প্রান্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে নিখুঁত প্রতিযোগিতার একটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা নির্ধারণকারী ভারসাম্য দেখানো যায়। নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম এবং প্রান্তিক আয় সমান।

$$dTR/dq - dTC/dq = 0,$$

$$MR = MC$$

এটি যে সর্বোচ্চ কাম্য বিন্দু সেটা বোঝা যাচ্ছে দ্বিতীয় অন্তরীকরণের মাধ্যমে। কেননা এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়- এর পরবর্তী প্রবণতা।

$$d^2TR/dx^2 - d^2TC/dx^2 < 0, \quad dMR < dMC$$

প্রান্তিক আয় পরিবর্তনের হার এখন প্রান্তিক ব্যয়ের পরিবর্তনের হার থেকে কম।

নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেউ দাম নির্ধারণ করতে পারে না। কারণ এখানে কোনো একক প্রতিষ্ঠান পুরো বাজার প্রক্রিয়ায় খুবই ক্ষুদ্র এবং অনুল্লেখ্য। এই বাজারে মুনাফা সর্বোচ্চ হয় যখন প্রান্তিক ব্যয় দাম বা প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। অর্থাৎ এই বিন্দুতে যে পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে তার চাইতে উৎপাদন এক একক বাড়ালে আর কোনো অতিরিক্ত মুনাফা হবে না। সেই কারণে এই বাজারের চাহিদা রেখা অনুভূমিক হয়, অর্থাৎ তা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা প্রকাশ করে। অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন যাই হোক তা বাজারের দামের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। তবে মনে রাখতে হবে, এই অবস্থা সমগ্র শিল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়। সমগ্র শিল্পে চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়।

ভারসাম্য বিন্দুর শর্ত, $MR = P = MC$ । কিন্তু এই বিন্দু যে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ বিন্দু তা প্রমাণিত হবে তখনই যখন প্রান্তিক আয়ের ঢাল প্রান্তিক ব্যয়ের ঢালের চাইতে কম হবে। অর্থাৎ $dMR < dMC$ ।

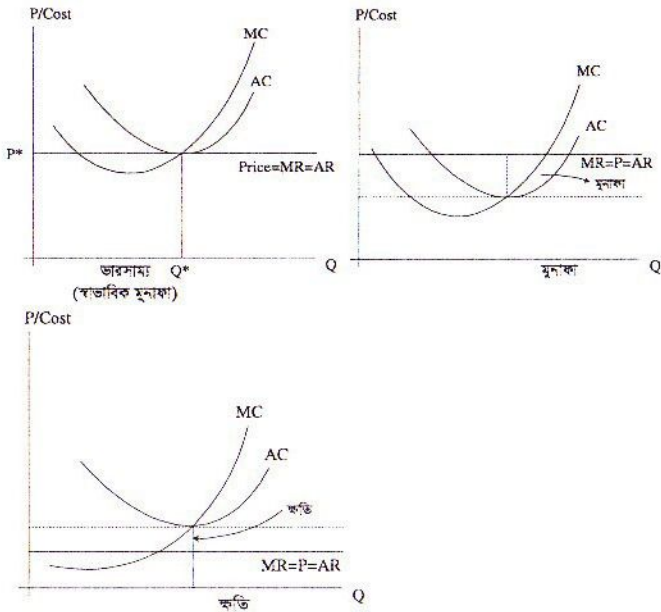
তাহলে নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কাম্যবিন্দুতে পৌঁছার ক্ষেত্রে স্তরগুলো হলো নিম্নরূপ:

$$MC = MR \dots \dots \dots (১)$$

$$MR = P \dots \dots \dots (২)$$

$$MC = MR = P \dots \dots \dots (৩)$$

$$dMR < dMC \dots \dots \dots (৪)$$



চিত্র ৭.২: স্বল্পমোদে নিখুঁত প্রতিযোগিতায় তিন অবস্থা

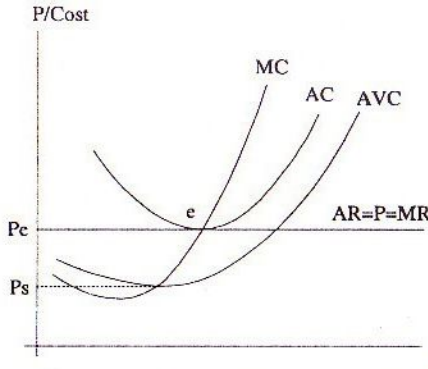
সারসংক্ষেপ

নিখুঁত প্রতিযোগিতার ধারণা আমরা সুসংগঠিতভাবে পাই উনিশ শতকের শেষে। নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কেউ দাম নির্ধারণ করতে পারে না। কারণ এখানে কোনো একক প্রতিষ্ঠান পুরো বাজার প্রক্রিয়ায় খুবই ক্ষুদ্র ও অনুল্লেখ্য। এই বাজারে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় যখন প্রথমতঃ প্রান্তিক ব্যয় দাম বা প্রান্তিক আয়ের সমান হয় এবং দ্বিতীয়ত প্রান্তিক আয় পরিবর্তনের হার প্রান্তিক ব্যয় পরিবর্তনের হার থেকে কম হয়।

৩

উৎপাদন শুরু ও বন্ধ বিন্দু (Break even point and shutdown point)

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় শুধু নয়, সকল ক্ষেত্রেই কোন অবস্থায় উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত হয়ে উঠলো আর কোন বিন্দুতে উৎপাদন আর চালানো সম্ভব নয় সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিচে রেখার মাধ্যমে একটি নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এই দুটো অবস্থা নির্দিষ্টভাবে দেখানো হলো।



চিত্র ৭.৩: উৎপাদন যুক্তিযুক্ত ও অযৌক্তিক বিন্দু

ন্যূনতম উৎপাদন বিন্দু (Break-even point): নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমরা দেখি উর্ধ্বগামী MC রেখা উর্ধ্বগামী AC রেখার সর্বনিম্ন যে বিন্দুতে ছেদ করে উঠে যাচ্ছে সেখানে $MC = AC = AR = P = MR$ হচ্ছে এবং এখানে মুনাফা শূন্য। এটি হচ্ছে ন্যূনতম উৎপাদন বিন্দু (P_e)। নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘমেয়াদে এটাই ভারসাম্য বিন্দু।

উৎপাদন বন্ধ বিন্দু (Shutdown point): কিন্তু কোনো প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের এক পর্যায়ে এ রকম এক পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যেখানে দাম আগের বিন্দুর নিচে নেমে যেতে পারে। আগের বিন্দুর তুলনায় দামের অবনতি উৎপাদন অব্যাহত রাখাকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। উপরন্তু এই দাম যদি নামতে নামতে এ রকম বিন্দুতে আসে যখন $P=AVC$ হয়, অর্থাৎ যখন দাম গড় পরিবর্তনীয়

ব্যয়ের সমান হয়, তখন উৎপাদন অব্যাহত রাখা মানে মোট স্থির ব্যয় পুরোটাই লোকসান। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন যত হবে ততই ক্ষতি বাড়বে। সেজন্য এ রকম বিন্দুতে দাম নেমে এলে তাকে উৎপাদন বন্ধ বিন্দু হিসেবে নির্দেশ করা হয়।

এটা এভাবেও দেখানো যায়:

$$TC = TVC + TFC$$

$$\pi = TR - TC$$

$$\text{কিন্তু যখন, } P = AVC$$

$$\text{তখন, } TR_p = TVC$$

সেই সময় পুরো TFC অপূরণীয় থাকে বা লোকসান হয়।

স্বল্পমেয়াদে উৎপাদন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাই গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো নিম্নরূপে উপস্থিত করা যায়:

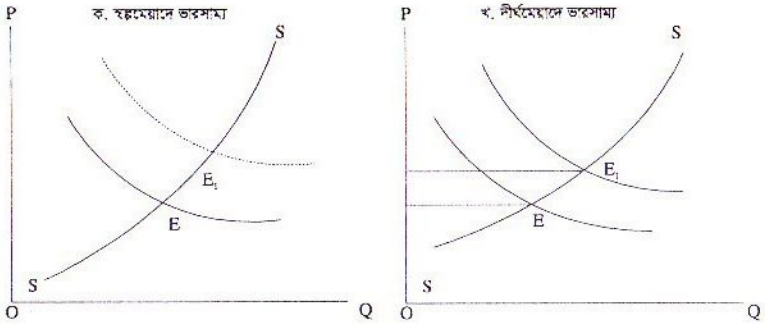
১. যদি দাম ন্যূনতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় থেকে নিচে হয় ($P < \text{minimum AVC}$) তাহলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করবে না। এর অর্থ এটা নাও হতে পারে যে, প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্প ত্যাগ করবে। হতে পারে, ঐ প্রতিষ্ঠান উৎপাদন আপাতত স্থগিত রাখবে এবং দাম বাড়ার জন্য অপেক্ষা করবে।
২. যদি দাম ন্যূনতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান বা তার থেকে বেশি হয় ($P > \text{minimum AVC}$) তাহলে প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে উৎপাদন করবে। এবং এটি মুনাফা সর্বোচ্চ করতে চেষ্টা করবে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান ($P = MC$) করবার মধ্য দিয়ে।
৩. প্রতিষ্ঠান তখনই মুনাফা করবে যখন দাম ন্যূনতম গড় মোট ব্যয় থেকে বেশি ($P > \text{minimum ATC}$) হবে।

দীর্ঘমেয়াদ ও শিল্প

এতক্ষণের যে আলোচনা তার অনেককিছুই করা হয়েছে স্বল্পমেয়াদে একটি নির্দিষ্ট ফর্ম বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যস্তিক অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদ ও একক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উপরই জোর দেয়া হয় বেশি। কিন্তু বলাই বাহুল্য, অর্থনীতি শুধুমাত্র একক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দিয়ে চলে না। এখানে অবশ্য বলা দরকার যে, প্রান্তিকতাবাদী অর্থনীতিবিদদের অবস্থান হলো, একক বা ব্যক্তি অর্থনীতিই মৌলিক। একাধিক ব্যক্তিক অর্থনীতি যোগ দিলেই সমষ্টির অর্থনীতি পাওয়া যাবে। স্যামুয়েলসন আবার বলেছেন, সমষ্টি অনেক সময়ই এককের যোগফল থেকে বেশি হয়। সেজন্য সমষ্টিকে আলাদাভাবে দেখা দরকার। এখানে আমরা পুরো সমষ্টি নয়, যুগ্মিত সমষ্টি নিয়ে অর্থাৎ একক প্রতিষ্ঠানের বাইরে শিল্পক্ষেত্রে সমষ্টিগত আচরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। খেয়াল করুন, প্রতিষ্ঠান বা ফর্ম যেখানে একক, সেখানে শিল্প হলো ঐ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি। অর্থাৎ একটি গার্মেন্ট প্রতিষ্ঠান হলো একক 'ফর্ম' আর সকল গার্মেন্ট মিলে হলো গার্মেন্ট শিল্প। তাছাড়া কয়েকটি স্বল্পমেয়াদ মানে অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদ নাও হতে পারে। সেজন্য দীর্ঘমেয়াদকেও আলাদাভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। সেটিও এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

দীর্ঘমেয়াদে ভারসাম্য

স্বল্পমেয়াদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদের একটি বড় তফাৎ হলো স্বল্পমেয়াদে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির কোনো পরিবর্তন হয় না। তার ফলে এগুলো অপরিবর্তিত রেখেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পও ভারসাম্যে পৌঁছাবে। আর দীর্ঘমেয়াদে যেহেতু প্রযুক্তিসহ উৎপাদনের যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির পরিবর্তন হয়, সুতরাং দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের যাবতীয় ব্যবস্থাবলী পরিবর্তন করতে পারে, কোনো প্রতিষ্ঠান বেরিয়ে যেতে পারে আবার কেউ প্রবেশও করতে পারে। সেভাবেই দীর্ঘমেয়াদে ভারসাম্য তৈরি হয়।



চিত্র ৭.৪: স্বল্পমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে শিল্পের ভারসাম্য

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার যোগফল হিসেবে শিল্পের চাহিদা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগানের যোগফল হিসেবে প্রতিষ্ঠানের যোগান পাই। শিল্পের চাহিদা ও যোগান রেখা তাই বস্তুত ঐ শিল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাক্রমে চাহিদা ও যোগান রেখার সমষ্টি।

আমরা আগেই দেখেছি, স্বল্পমেয়াদে একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ করে দেবার অবস্থা তৈরি হয় যখন দাম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান হয় বা তার নিচে নেমে যায়। দীর্ঘমেয়াদে যেহেতু স্থিরব্যয় বলে কিছু নেই সেহেতু সবকিছুই পরিবর্তনীয় ব্যয়। পুরো গড় ব্যয়ই হলো গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়। তাই আমরা দেখি শিল্পক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দামের গড় ব্যয়ের সমান বা তার বেশি হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে যে ঘটনাটি ঘটে সেটি হলো, দাম যদি গড় ব্যয়ের চাইতে বেশি হয়ে অতিরিক্ত মুনাফার সৃষ্টি করে, তাহলে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্পে প্রবেশ করে; আবার দাম যদি গড় ব্যয়ের চাইতে কম হয়ে লোকসান দেখা দেয়, তাহলে পুরনো প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্প থেকে বেরিয়ে যায়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে ভারসাম্য বিন্দুতে দাম, প্রান্তিক ব্যয়, ন্যূনতম দীর্ঘমেয়াদি গড় ব্যয় সমান হয়। অর্থাৎ, $P = MC = AC$ ।

বলা বাহুল্য, এই বিন্দুটি শূন্য মুনাফা বিন্দু। নিখুঁত প্রতিযোগিতার মডেলে দীর্ঘমেয়াদে শিল্পের এটাই ভারসাম্য বিন্দু। এর অর্থ হলো, শূন্য মুনাফা বিন্দুতে শিল্পের মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হচ্ছে। ব্যয়ের মধ্যে উৎপাদনের সকল উপাদান নিজ নিজ পাওনা পেয়ে যাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

স্বল্পমেয়াদে দাম যদি ন্যূনতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় থেকে নিচে হয় তাহলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করবে না। যদি দাম ন্যূনতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান বা তার থেকে বেশি হয় তাহলে প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে উৎপাদন করবে এবং এটি মুনাফা সর্বোচ্চ করতে চেষ্টা করবে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান করার মধ্য দিয়ে। প্রতিষ্ঠান তখনই মুনাফা করবে যখন ন্যূনতম গড় মোট ব্যয় থেকে দাম বেশি হবে। দীর্ঘমেয়াদে ভারসাম্য বিন্দুতে দাম, প্রান্তিক ব্যয়, ন্যূনতম দীর্ঘমেয়াদি গড় ব্যয় সমান হয়।

নিখুঁত প্রতিযোগিতার মডেল থেকে বিচ্যুতি

নিখুঁত প্রতিযোগিতার মডেলটি তার নিজের ভেতরে একটি যৌক্তিক কাঠামো দাঁড় করালেও তার অনুমিতিগুলি পরীক্ষা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে, এটি বাস্তব জগতের জন্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব জগতের সাথে এই মডেলটির বিরোধ হচ্ছে সেটা আমাদের মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। নিচের ছকে নিখুঁত বাজারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করছি কী কী কারণে এই শর্তগুলো ভেঙে অনিখুঁত প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়।

নিচে প্রথম যে শর্তটি আছে সেটি হলো এই মডেলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুবিধার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরঞ্চ দুই-এর মধ্যে সুসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু বাস্তব জগতে যখনই দেখা যায় উৎপাদন বা বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক সুবিধার চাইতে ব্যক্তির সুবিধা বেশি হচ্ছে, তখনই এই শর্তটি আর কাজ করে না। দেখা যায়, সম্পদ বিতরণ অদক্ষ ও অপচয়মূলক হয়। এর ফলে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটে। ভেঙে পড়ে নিখুঁত বাজারের নকশা।

দ্বিতীয় শর্তে বলা হচ্ছে, বাজারে ভোক্তা যে দামে পণ্য কিনবে তা সেই পণ্য থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে। কিন্তু বাস্তবে যখন দেখা যায়, ক্রেতা বা বিক্রেতা তার আপেক্ষিক শক্তি বা প্রভাব বিস্তার করে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে বা কমাচ্ছে, তখন সেই শর্ত ভেঙে যায় এবং অধিকতর অস্বচ্ছতার সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় শর্তে বলা হচ্ছে, উৎপাদক যখন পণ্য উৎপাদন করেন তখন দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু ক্রেতা বা বিক্রেতার আপেক্ষিক শক্তির কারণে যদি এই অবস্থার ব্যত্যয় ঘটে তাহলে এই শর্ত ভেঙে পড়ে এবং শক্তিশালী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির লাভ সমাজের ক্ষতির কারণ হয়। এই অবস্থাও অধিকতর একচেটিয়াকরণের অবস্থা তৈরি করে।

চতুর্থ শর্তে বলা হচ্ছে, কোনো পণ্য উৎপাদনে ব্যক্তির প্রান্তিক ব্যয় ও সমাজের প্রান্তিক ব্যয় সমান হবে। কিন্তু বাস্তবে যদি দেখা যায় ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যক্তিগত ব্যয় সমাজের উপর স্থানান্তর করা হয়, তাহলে সমাজের ব্যয়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানিক একচেটিয়া শক্তি তৈরি হতে থাকে।

পঞ্চম শর্তে বলা হয়েছে, কোনো অর্থনৈতিক তৎপরতায় সমাজের যে ব্যয় হবে তা সমাজের প্রাপ্ত সুবিধার সমান হবে। এই অবস্থাতেই অ্যাডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হস্ত' শর্ত কাজ করে, অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির লাভ আর সমাজের লাভ সমার্থক। কিন্তু যদি

কোনো প্রভাবের ফলে সমাজের প্রাপ্ত সুবিধার তুলনায় ব্যক্তির লাভ বেশি হয়ে যায় তাহলে পুরো মডেলটিই ভেঙে পড়ে।

ছক ৩: নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শর্তাবলী ও এর ভাঙনের কারণ

দক্ষ বাজার ও নিখুঁত বাজারের শর্তাবলী	সমীকরণে	মডেল ভেঙে পড়ার কারণ	ফলাফল
১. ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুবিধা সমান থাকে	$MUs = MC$	যখন ব্যক্তির প্রাপ্ত উপযোগ সমাজের চাইতে অনেক বেশি হয়।	সম্পদ বিতরণ অনিয়মিত ও অপচয়মূলক হয়। সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটে।
২. জোজুরা এমন নামে পণ্য কেনেন যখন তা প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।	$MU = P$	ক্রোতা বা বিক্রোতা একক শক্তিশালী হলে প্রভাব বিস্তার করে সুবিধামতো দাম নির্ধারণ করতে পারে। $MU \neq P$	প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে একচেটিয়া ব্যবস্থা তৈরি হতে থাকে।
৩. উৎপাদকেরা যখন এমন খরচে উৎপাদন করেন যেখানে পণ্য উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় তার দাম-এর সমান হয়।	$P = MC$	ক্রোতা বা বিক্রোতা একক শক্তিশালী হলে প্রভাব বিস্তার করে সুবিধামতো দাম নির্ধারণ করতে পারে। $P \neq MC$	প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে একচেটিয়া ব্যবস্থা তৈরি হতে থাকে।
৪. যখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় সমান হয়।	$MC = MCs$	ব্যক্তিগত লাভের জন্য যে ব্যয় তা যখন সমাজের উপর স্থানান্তর করা হয়। $MC < MCs$	সমাজের ব্যয়ে ব্যক্তি একচেটিয়া সম্পত্তিশালী শ্রেণী তৈরি হতে থাকে।
৫. সামাজিক ব্যয় ও সামাজিক সুবিধা সমান হয়। এই অবস্থাতেই এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হস্তক্ষেপ' কাজ করে এবং ব্যক্তির সুবিধা সন্ধান সমাজের সুবিধা নিশ্চিত করে।	$MUs = MCs$	সমাজের প্রাপ্ত সুবিধার চাইতে যখন তার ব্যয় অনেক বেশি বেড়ে যায়। $MUs < MCs$	সমাজের ব্যয়ে ব্যক্তি একচেটিয়া সম্পত্তিশালী শ্রেণী তৈরি হতে থাকে এবং দক্ষ এবং সকলের জন্য সুবিধাজনক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

এখানে,

MUs = সামাজিক প্রান্তিক উপযোগ

MU = ব্যক্তির প্রান্তিক উপযোগ

MCs = সামাজিক প্রান্তিক ব্যয়

MC = ব্যক্তির প্রান্তিক ব্যয়।

নিখুঁত বাজার বিরোধী বাস্তব উপাদান

নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজার বাদে সব বাজার ব্যবস্থাকেই এক কথায় অনিখুঁত বাজারের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কীভাবে আদর্শায়িত নিখুঁত বাজার বর্তমান সময়ের অনিখুঁত বাজারে এসে দাঁড়ায় সেটা উপরের ছক থেকেই বোঝা যায়।

১৯৩০ এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে তাত্ত্বিকভাবে অনিখুঁত বাজারের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়নি। ৩০ দশকের প্রথম দিকের মহামন্দা অর্থশাস্ত্রে এই বিষয় অন্তর্ভুক্তির বাস্তব চাপ সৃষ্টি করে। প্রথম উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক কাজ করেন জোয়ান রবিনসন, ১৯৩৩ সালে।^{১৭}

কেইনসের তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে বাজারের অনিখুঁত চেহারাকে স্বীকার করেই নির্মিত। এই ক্ষেত্রের তাত্ত্বিক কাজ পরে আরও অনেক অগ্রসর হয়েছে। স্যামুয়েলসন বাস্তব দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন কী কী উপাদান বা ব্যবস্থাবলী বাজারকে ক্রমান্বয়ে অনিখুঁত করে তোলে। সেগুলোর মধ্যে আছে:

- (ক) অন্যদের তুলনায় বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় এবং প্রতিযোগিতায় সুবিধাজনক অবস্থান,
- (খ) নতুন কোন উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাজারে প্রবেশ অত্যন্ত উঁচু ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠা
- (গ) সরকারি আইন কাঠামো
- (ঘ) বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাজার দখলের ক্ষমতা।

এর সঙ্গে মালিকানা ব্যবস্থা ও সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাসসহ আরও বিভিন্ন উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

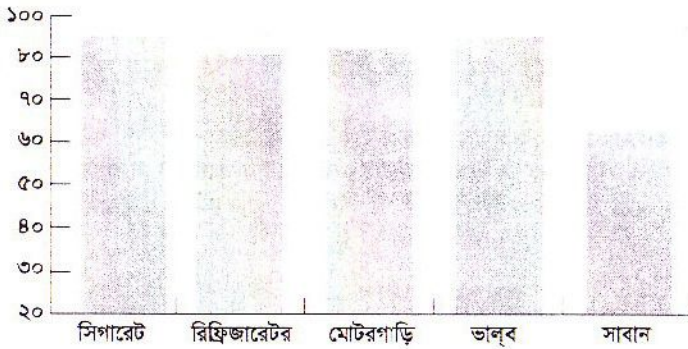
বাস্তব দৃষ্টান্ত

এসব বিভিন্ন কারণে বাজার ক্রমে নিখুঁত বাজারের সকল শর্ত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ টেনে কেন্দ্রীভবনের বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের খরচ, মানোন্নয়ন খরচ ও মুনাফার সম্পর্ক দেখা যায়। নিচে এটির সারসংক্ষেপ দেয়া হলো।

ছক ৪: যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভবনের অনুপাত

কেন্দ্রীভবনের মাত্রা এবং শিল্প শাখা	চারটি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীভবনের অনুপাত	বিজ্ঞাপনের পেছনে শতকরা ব্যয়	গবেষণা ও উন্নয়নের পেছনে শতকরা ব্যয়	মুনাফা, বিক্রির শতকরা হার
উঁচু (গাড়ি ও সিগারেট)	৭১	২.৪	৩.২	১২
মোটামুটি (কাগজ, পাথর, রাসায়নিক দ্রব্য)	১৪	২.১	৩.০	১০.৭
নিচু, (কাপড়, মৃদঙ্গ, আসবাবপত্র)	৯	১.৫	০.৩	১০.৫
নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক (চাল ও গম খামার)	০.০১	০	০	পাওয়া যায়নি

১৭. Joan Robinson: *Theory of Imperfect Competition*.



চিত্র ৭.৫: যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভবন: যুক্তরাষ্ট্রের ৪টি প্রধান কোম্পানি কয়েকটি বাজারের কত অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্য একটি হিসাবে চারটি প্রধান কোম্পানির হাতে নির্দিষ্ট খাতগুলোতে কী পরিমাণ সম্পদের কেন্দ্রীভবন হয়েছে তার চিত্র দেওয়া হয়েছে। এই হিসাব অনুযায়ী, সিগারেট: ৯২%, রেফ্রিজারেটর: ৮৫%, মোটরগাড়ি: ৯০%, ভাল্ব: ৯১%, সাবান: ৬৫%।

বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই একচেটিয়াকরণ দেখি দুইভাবে। এক হলো, দেশীয় শিল্প ও বণিক প্রতিষ্ঠানগুলোর খুব অল্প কয়েকটিই শিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকসহ ইত্যাদির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে আবার সমগ্র দেশীয় অর্থনীতির উপর অল্প কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর একক কর্তৃত্ব আছে।^{১৮}

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন কারণে নিখুঁত প্রতিযোগিতার মডেলটি বাস্তবে কাজ করে না। স্যামুয়েলসনসহ বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে— বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় ও প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থান; নতুন কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাজারে প্রবেশ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ; সরকারি আইন কাঠামো; বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাজার দখলের ক্ষমতা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর উপস্থিতি দ্বৈতভাবে ঘটে।

অষ্টম অধ্যায়

অনিখুঁত প্রতিযোগিতা Imperfect competition

আমরা বিভিন্ন বাজার অর্থনীতির অভিজ্ঞতা থেকে দেখি, বাস্তব জগতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাজার নিখুঁত প্রতিযোগিতা দিয়ে চলে না। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজারে একচেটিয়ার প্রবণতা যে বাড়তেই থাকে এটা আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় বিকশিত সব অর্থনীতিতেই দেখি। বাজারের অনিখুঁত, ক্রটিমুক্ত বা নানা ধরনের অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে কিছু অভিন্ন বিষয় আছে। আবার বিভিন্ন ধরনের আলাদা আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। এই অধ্যায়ে আমরা এসব বিষয় আলোচনা করবো। সেই সঙ্গে ভারসাম্য, অর্থনীতির উপর এর প্রভাব ইত্যাদিও আলোচিত হবে।

অনিখুঁত বাজারের বিভিন্ন ধরন

অনিখুঁত বাজারের ধরন বিভিন্ন হতে পারে। তার কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হল।
নিখুঁত একচেটিয়া (Perfect Monopoly): নিখুঁত একচেটিয়ার উদ্ভব হয় তখনই যখন বাজারে শুধুমাত্র একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সেই উৎপাদিত দ্রব্যের কোনো নিকট বিকল্পও থাকে না। এর ফলে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয় না এবং তার কোনো আশু সম্ভাবনাও থাকে না।

একচেটিয়াসম প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition): পণ্য পৃথকীকরণ ছাড়া এর বাকি সব বৈশিষ্ট্যই নিখুঁত প্রতিযোগিতার মতো। এতে অনেক প্রতিষ্ঠান থাকে। কিন্তু যে পণ্য উৎপাদিত হয় সেগুলোকে কৃত্রিমভাবে পৃথক বা অনন্য হিসেবে দেখানো হয়। বিজ্ঞাপন, মোড়ক, প্রচার দিয়েই এই পার্থক্য তৈরি করা হয়। সেইক্ষেত্রে আচরণ হয় একচেটিয়ার মতো।

বিপরীত একচেটিয়া (Monopsony): এই ক্ষেত্রে ক্রেতা-ই একচেটিয়া আকারে আবির্ভূত হয়।

পৃথকীকৃত একচেটিয়া (Discriminating Monopoly): একই পণ্য যখন বিভিন্ন ক্রেতার কাছে বিভিন্ন দামে বিক্রি করার অবস্থা দেখা যায় তখনই এ রকম বাজারের উদ্ভব হয়েছে বলে ধরা হয়।

দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া (Bilateral Monopoly): ক্রেতা এবং বিক্রেতা দু'দিকেই যখন দু'জন একচেটিয়া অবস্থানে থাকেন তখন তাকে এ রকম দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে যায়।

দ্বৈত একচেটিয়া (Duopoly): এটি গোষ্ঠী একচেটিয়ারই একটি বিশেষ ধরন। এই বিশেষ ধরনে দুটো প্রতিষ্ঠানই বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গোষ্ঠী একচেটিয়া (Oligopoly): যখন দেখা যায় দুই-এর অধিক কিন্তু সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে তখন তাকে আমরা গোষ্ঠী একচেটিয়া বলতে পারি।

অনিখুঁত বাজারের বাস্তব চিত্র

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আমাদের জানাচ্ছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প শাখা আছে ৪০০টি, কিন্তু এগুলোর মধ্যে একক একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান খুবই কম। এর প্রায় অর্ধেক শাখায় কেন্দ্রীভবন যে মাত্রায় ঘটেছে তাতে এগুলোকে বলা যায় ওলিগোপলি। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পণ্য পৃথকীকরণ দেখা যায়। একই চিত্র যুক্তরাজ্যেও, জাপান, ফ্রান্স, ইটালি, কানাডা এবং সুইডেন-এ এগুলো আরও বেশি মাত্রায় উপস্থিত।

গণ-ব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে, যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ ইত্যাদি, যুক্তরাষ্ট্রে একক প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া দেখা যায়। উচ্চ মাত্রায় কেন্দ্রীভূত ওলিগোপলি দেখা যায় রেডিও, টেলিভিশন ও পরিবহন ইত্যাদি খাতে। এসব খাতে নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ হয় দুঃসাধ্য নয়তো অসম্ভব। পশ্চিমের অন্যান্য দেশেও পরিস্থিতি মোটামুটি একইরকম, তবে অন্যান্য দেশে গণ-ব্যবহার্য দ্রব্য যোগানদার প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়।

অন্যদিকে, হিসাব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ, কিন্তু বিক্রি আর সম্পদ কিংবা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করলে বলতে হয় যে মাত্র কয়েকশে প্রতিষ্ঠান পুরো অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইসব বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে অনেক শেয়ারহোল্ডার আছেন কিন্তু বাস্তবে এই লক্ষ লক্ষ শেয়ারহোল্ডারেরা কোনো ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারেন না। এসব প্রতিষ্ঠান আসলে চালায় আমাদের (Joseph Schumpeter (১৮৮৩-১৯৫০) পুঁজিবাদের (বাজার অর্থনীতির) এই একচেটিয়া অবস্থাকে পরজীবী ও অবক্ষয়ী বলে বর্ণনা করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিচালিত চ্যানেলের সাম্প্রতিক এক টিভি আলোচনায় জানানো হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে এখন ১৪,০০০ প্রতিষ্ঠানে ৫০০ এরও অধিক নিয়োগ আছে, অন্যদিকে আরও ২ কোটির অধিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ৫০০ এর কম নিয়োগ দিয়ে থাকে।^{১৯}

ওলিগোপলি শব্দটি দিয়ে এমন ধরনের বাজার বোঝানো হয় যেখানে একচেটিয়া ও প্রতিযোগিতামূলক দু'ধরনের বাজারেরই উপাদান থাকে। কোনটি শক্তিশালী হবে

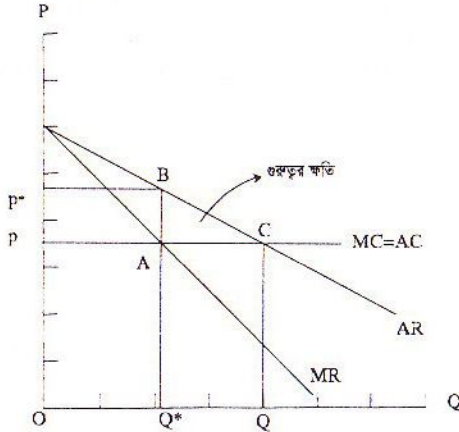
১৯. Samuelson, *Economics*, 15th ed, 1995. পৃ-১০১-২

২০. World Net. 16.8.99

তা নির্ভর করে এগুলোর আপেক্ষিক শক্তির উপর, সেটি আবার নির্ভর করে বাজার কাঠামোর বিস্তারিত বিন্যাসের উপর। খুব সহজভাবে বলতে গেলে এই বাজার হলো মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার, যারা আবার প্রত্যেকে বাজারের একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে তীব্র, কিন্তু প্রয়োজনে আবার এদের মধ্যে সমঝোতাও হতে পারে, এই সমঝোতা একটি কাঠামোগত রূপ পেলে তাকে বলে কার্টেল। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈত লক্ষ্য থাকে। একটি হলো সম্মিলিত ভাবে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে মুনাফা সর্বোচ্চ করা, আবার অন্যটি হলো অন্য প্রতিষ্ঠানকে হারিয়ে নিজ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বোচ্চ করা।

গুরুতর ক্ষতি (Deadweight loss)

সাধারণত যে কোনো নীতিগত অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে যখন ভোক্তার উদ্বৃত্ত, উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা সরকারের উদ্বৃত্ত উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যায় তখন তাকে গুরুতর ক্ষতি বলা হয়। এই নীতিগত অবস্থান পরিবর্তনের মধ্যে আছে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, কর, শুল্ক ইত্যাদি। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, সুনির্দিষ্টভাবে অর্থনীতিতে একচেটিয়াকরণের ফলে যে অদক্ষতা ও অপচয় দেখা দেয় তাতে, ভোক্তার উদ্বৃত্ত হ্রাসসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকে নির্দেশ করেছেন। নিচের ছকে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।



চিত্র ৮.১: একচেটিয়াকরণের ফলে অপচয় ও ক্ষতি

এখানে P দামে ভারসাম্য সম্ভব হলেও, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান অতি মুনাফা অর্জনের জন্য, P^* -এ দাম নির্ধারণ করে। এতে তার বাড়তি মুনাফা হবে কিন্তু উৎপাদন Q থেকে Q^* পর্যন্ত কমে যাবে এবং সামাজিক ক্ষতি হবে ABC পরিমাণ।

জনগণ সামাজিকভাবে $(OQ-OQ^*)$ পরিমাণ দ্রব্য ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের দামের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবার কারণে মুনাফা বাড়ানোর জন্য উৎপাদন কমিয়ে দাম বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এতে ভোক্তার উদ্বৃত্ত কমে যায়।

এতে ব্যক্তিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই গুরুতর ক্ষতি হয়। মুনাফা বাড়ানোর জন্য উৎপাদন হ্রাস একইসঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতার অপচয়, বস্তুগত ও মানব সম্পদের অব্যবহার, বেকারত্ব, অপচয়, উদ্ভাবনকে নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে স্বল্পমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে পুরো অর্থনীতিরই বড় ক্ষতি হয়। বর্তমান বিশ্বে এরকম ক্ষতি একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ প্রতি বছর জিএনপির শতকরা প্রায় ০.৫ থেকে ২ ভাগ এই ধরনের ক্ষতির শিকার হয়।^{২১} এর মূল্য টাকার অংকে কমপক্ষে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা যা বাংলাদেশের একই সময়ের মোট জিডিপির চাইতেও বেশি। এটি অন্য একটি হিসাব অনুযায়ী এর ৪ গুণ বা ৭ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত উঠতে পারে। আরেকটি হিসাবে দু'দশক আগেও দেখা গেছে, ক্ষতি ও অপচয়ের হার ছিল বৃহৎ সংস্থাগুলোর মোট আয়ের কমপক্ষে শতকরা, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ১২.৩ ভাগ ও যুক্তরাজ্যের জন্য ৫.৪ ভাগ।^{২২}

সারসংক্ষেপ

অনিখুঁত বাজারের বিভিন্ন ধরন হতে পারে। নিখুঁত একচেটিয়া এই বাজারের একটি চরম অবস্থা। বাস্তব জগতে অনিখুঁত বাজারের বিভিন্ন ধরনই দেখা যায়। গোষ্ঠী একচেটিয়া বা ওলিগোপলি বাজারে নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ দুঃসাধ্য নয়তো অসম্ভব। বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের অন্যান্য দেশে এসব যোগানদান প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়। অনিখুঁত বাজারজনিত গুরুতর ক্ষতি বলতে অনিখুঁত বাজারের কারণে ভোক্তার উদ্বৃত্ত উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যাওয়া কিংবা অপচয়, বস্তুগত ও মানবসম্পদের অপব্যবহারকে বোঝানো হয়।

২১. F.M. Scherer and David Ross: 'Industrial Market structure and Economic Performance', Boston, 1990.

২২. Keith Cowling and Dennis C. Mueller, "The Social Costs of Monopoly Power", *The Economic Journal*, December, 1978

একচেটিয়া বাজার কী?

একচেটিয়া বাজার হচ্ছে নিখুঁত বাজারের বিপরীত আরেকটি চরম অবস্থা। যেখানে মাত্র একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) থাকে। এ ধরনের ক্রেতা বা বিক্রেতা দাম নির্ধারণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তারা এখানে দাম গ্রহীতার (price taker) বদলে দাম নির্ধারক (price maker)। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে একচেটিয়াকরণ একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। বিশেষত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংকটের সময় অঙ্গীভবন, সম্মিলন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় একচেটিয়াকরণ ত্বরান্বিত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি' বলা হলো একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক আধিপত্য দেখলে বোঝা যায় এই দাবি অর্থহীন বরং বিপরীত চিত্রই আরও স্পষ্ট হয়। একচেটিয়া বিরোধী আইনগত ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিকশিত বাজার অর্থনীতিতে দেখা যায়, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় এগুলোর চাইতে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর শক্তি অনেক বেশি। দু'জন অর্থনীতিবিদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এর আইনগত দুর্বলতার দিকেই।^{১০}

একচেটিয়া বা ইংরেজিতে যাকে বলে monopoly তা এসেছে গ্রীক শব্দ monos pole থেকে যার অর্থ হলো একক বিক্রেতা (alone to sell)। খাঁটি বা চূড়ান্ত রকম একক একচেটিয়া (perfect monopoly) সেভাবে দেখা না গেলেও এর মডেল, মিশ্র বা দ্বৈত একচেটিয়া বা গোষ্ঠী একচেটিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অনিখুঁত বাজার অনেকখানিই কার্যকর থাকে।

একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক আয় ও গড় আয়

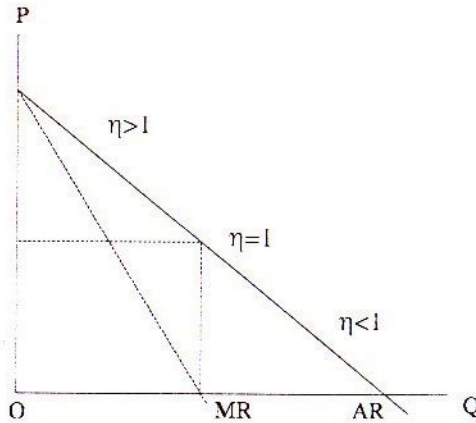
একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক আয়, গড় আয় এবং তার গতিপ্রকৃতি বোঝার সুবিধার জন্য একটি সমীকরণ দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি। এটি হলো:

$$MR = P(1 - 1/\eta)$$

১০. বলা হয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান নয়, বাজারের উপর একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাই আইন বিরুদ্ধ: 'monopoly' per se is not illegal; only 'monopolizing' Or 'attempting to monopolize the market' are illegal (Section 2, Sherman Antitrust Act, 1890)। একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের মুখে জনমতের চাপে Interstate Commerce Act (1887), Sherman Act (1890) প্রবর্তিত হয়। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে অন্যান্য আইন ও আইনগত ব্যাখ্যা, দীর্ঘসূত্রিতা, ক্ষুদ্র জরিমানার বিধান ইত্যাদি একচেটিয়াকরণকে নির্বিশেষ করে তোলে। G.S. Maddala, Ellen Miller: *Microeconomics*, পৃ-৩৫৫-৩৫৭।

এখানে η হলো নমনীয়তা, MR প্রান্তিক আয় এবং P হল দাম বা গড় আয় AR। যেহেতু, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় এই নমনীয়তা অসীম অর্থাৎ দামের দৃষ্টি পরিবর্তনেও চাহিদার অসীম পরিবর্তন হয় সুতরাং প্রান্তিক আয় এই বাজারে দাম বা গড় আয়ের সমান থাকে। অর্থাৎ, যখন $\eta = \infty$, তখন $MR = P$; এবিষয়ে আগে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক, একচেটিয়া বাজারে যেহেতু $\Sigma \eta < \infty$, অর্থাৎ এখানে চাহিদা রেখা অসীম স্থিতিস্থাপক নয় সুতরাং এখানে প্রান্তিক আয় দাম বা গড় আয় থেকে কম হবে ($MR < P$)। রেখায় এর অর্থ দাঁড়াবে প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নিচে থাকবে। পাশাপাশি আমরা যখন দেখি নমনীয়তা ১ এর বেশি, তখন প্রান্তিক আয়ও ১ এর বেশি অর্থাৎ প্রান্তিক আয় রেখা ধনাত্মক অবস্থানে আছে। অর্থাৎ যখন, $\eta > 1$, $MR > 0$ । আবার আমরা যখন দেখি নমনীয়তা শূন্য তখন প্রান্তিক আয়ও শূন্য অর্থাৎ প্রান্তিক আয় রেখা এখানে x অক্ষ ছেদ করেছে। অর্থাৎ যখন, $\eta = 0$, তখন $MR = 0$ । পাশাপাশি আমরা দেখি নমনীয়তা যখন ১ এর কম, তখন প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক হয়ে যায়। অর্থাৎ, যখন $\eta < 1$, তখন $MR < 0$ ।

আমরা রেখাচিত্র এবং এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের চাহিদা নমনীয়তা অসীম বা ০-এর কম এর কোনো অবস্থাতেই থাকবে না। তার অবস্থান হচ্ছে যেখানে নমনীয়তা ১ এর বেশি সেখানেই। অর্থাৎ যেখানে উৎপাদন কমিয়ে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান তার আয় তুলনায় অনেক বাড়তে পারবে।

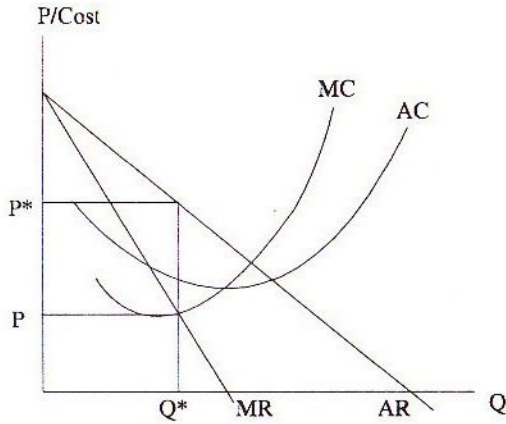


চিত্র ৮.২: একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও প্রান্তিক আয় রেখা

চাহিদা রেখা যখন নিম্নচাল সম্পন্ন তখন প্রান্তিক আয় দামের চাইতে কম হয়। চাহিদা যখন নমনীয়, তখন প্রান্তিক আয় ধনাত্মক, যখন চাহিদার নমনীয়তা একক, তখন প্রান্তিক আয় শূন্য; যখন অনমনীয় তখন প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক।

একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য

একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য নির্ধারণে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানেরও ভূমিকা থাকে। একচেটিয়া বাজারেও এই ভারসাম্য বিন্দুর প্রথম শর্ত একই: $MR = MC$ অর্থাৎ প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে গড় আয় বা দাম থাকে প্রান্তিক আয় থেকে বেশি। এর ফলেই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তুলনায় অনেক বেশি মুনাফা করতে সক্ষম হয়। নিচের চিত্র থেকে এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।



চিত্র ৮.৩: একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য

MR এবং MC সমান হচ্ছে P বিন্দুতে। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের গড় আয় বা দাম বা চাহিদা রেখা প্রান্তিক আয় থেকে উপরে থাকে বলে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের দাম নির্ধারিত হয় P^* বিন্দুতে, এবং উৎপাদন হয় Q^* বিন্দুতে।

সারসংক্ষেপ

একচেটিয়া বাজারে একক প্রতিষ্ঠানই দাম নির্ধারণ করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মালিকানার কেন্দ্রীভবন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। বিশেষত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংকটের সময় অঙ্গীভবন, সম্মিলন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এটি ত্বরান্বিত হয়। একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য বিন্দুর প্রথম শর্ত $MR=MC$, অর্থাৎ প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে গড় আয় বা দাম প্রান্তিক আয় থেকে বেশি।

অনিখুঁত বাজারের ভারসাম্য

অনিখুঁত বাজার যেহেতু বহুরকম হতে পারে এবং এগুলোর মধ্যে আবার যেহেতু একাধিক ধরনের বাজারের নানা মাত্রায় মিশ্রণও থাকতে পারে, সেহেতু এর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য, দাম নির্ধারণ বা ভারসাম্যকে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে দেখানো কঠিন। তবে নিখুঁত বাজারের শর্ত থেকে বেরিয়ে আসার ফলে এগুলোর মধ্যে কিছু অভিন্ন উপাদান থাকে। সে সবার ভিত্তিতে এগুলোর ভারসাম্য চিহ্নিত করা যায়। একচেটিয়া বাজারের আচরণের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই এগুলোর সাম্যুজ্য পাওয়া যাবে। অনিখুঁত বাজারের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। এগুলোর মধ্যে আছে:

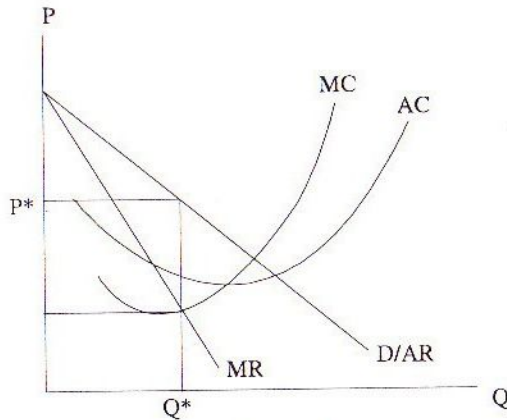
- (১) সম্পদের কেন্দ্রীভবন: এখানে বিভিন্ন ঘটনা, সংকট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে অনেক প্রতিষ্ঠান ছিটকে পড়ে, দেউলিয়া হয়ে যায় কিংবা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এ সবার মধ্য দিয়ে বাজারের প্রতিযোগিতামূলক উপাদান দুর্বল হয়ে যায় এবং প্রায় প্রতিটি শিল্পেই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া আধিপত্য দেখা দেয়। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও আছে।
- (২) প্রতিযোগিতায় বাধা: এই বাজারের বিন্যাস এমন থাকে যে, এখানে নতুন কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। অর্থনৈতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবধান ছাড়াও আইনগত বা সরকারি বিভিন্ন নীতির কারণেও এই অবস্থা ক্রমে স্থায়ী রূপ নেয়।
- (৩) ব্যয়: একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে যে ব্যয় কাঠামো দাঁড়ায়, তার সঙ্গে কোনো ছোট বা নতুন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিজ্ঞাপন, গবেষণা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ব্যয়বহুল কর্মসূচিতে কোনো নতুন বা ছোট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করাও সম্ভব হয় না।
- (৪) কৌশলগত ঐক্য: বাজারে একচেটিয়া প্রভাব টিকিয়ে রাখবার জন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এই বোঝাপড়ায় নিজেদের মধ্যে বাজার ভাগ করে নেয়া ছাড়াও, প্যাটেন্ট ভাগ করা, প্রযুক্তিগত বিকাশ বা গবেষণা লেনদেন করা, সরকারের উপর চাপ রাখবার ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত।

অনিখুঁত বাজারের প্রধান কয়েকটি ধরন

অনিখুঁত বাজারের মধ্যে বিভিন্ন ধরন, সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একা ও অনেক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে স্যামুয়েলসন এগুলোর মধ্যে বাস্তবে বিদ্যমান তিনটি ধরনকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো:

১. সমন্বিত গোষ্ঠী একচেটিয়া (Collusive oligopoly)
২. প্রতিযোগিতামূলক একচেটিয়া (Monopolistic competition) এবং
৩. ক্ষুদ্র সংখ্যক গোষ্ঠী একচেটিয়া (Small number oligopoly)

সমন্বিত গোষ্ঠী একচেটিয়া বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা যখন অর্থনীতিতে বিদ্যমান কয়েকটি প্রধান একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়। এই বোঝাপড়ার ফলে গড়ে ওঠে কার্টেল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বর্তমান শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এবং বিভিন্ন দেশে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে এই জাতীয় চর্চা বহুল প্রচলিত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো এই যে, যখনই কয়েকটি গোষ্ঠী একচেটিয়া নিজেদের মধ্যে এমনভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বোঝাপড়া করে নেয় যে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপাদান আর অবশিষ্ট থাকে না তখনই সেখানে উদ্ভব ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির। পুরো বাজার তখন যেভাবে আচরণ করে তাতে তার সঙ্গে নিখুঁত একচেটিয়ার পার্থক্য থাকে সামান্যই। নিচের চিত্রে আমরা এরই প্রতিফলন দেখছি।

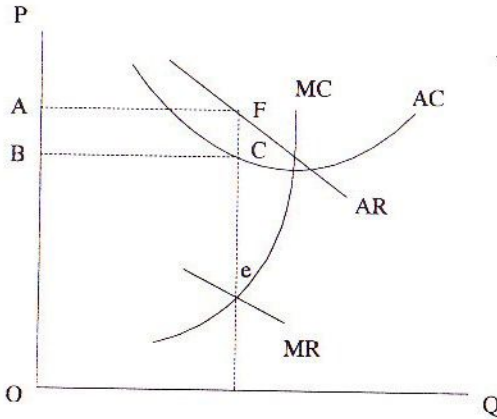


চিত্র ৮.৪: সমন্বিত গোষ্ঠী একচেটিয়ার দাম ও মুনাফা

সমন্বয়ের ফলে একটি সংস্থার দামরেখা D বা AR অন্যান্য সংস্থাগুলোরও দাম রেখা হিসেবে দাঁড়ায়। ফলে ভারসাম্য দাম সবার জন্য হয় P^* ।

একচেটিয়াসম প্রতিযোগিতায় একই সঙ্গে একদিকে একচেটিয়া ও অন্যদিকে প্রতিযোগিতার উপাদান কার্যকর থাকে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার সঙ্গে এর মিল আছে তিন জায়গায়: অনেক ক্রেতা-অনেক বিক্রেতা, সহজ প্রবেশ ও প্রস্থান, সকল প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দামকে বাজার নির্ধারিত বলে ধরে নেয়। নিখুঁত প্রতিযোগিতার

সঙ্গে পার্থক্য এক জায়গায়: নিখুঁত প্রতিযোগিতায় পণ্য থাকে সমরূপ, কিন্তু এই বাজারে পণ্য থাকে পৃথকীকৃত। এর উদাহরণ বিশেষত গার্হস্থ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশি পাওয়া যায়: কসমেটিকস, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। এছাড়া পেট্রোল, পরিবহন, বিনোদন সামগ্রীও এর মধ্যে পড়ে। দ্রব্য একই কিন্তু ব্র্যান্ড ইত্যাদির পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট ধরনের পণ্যে একচেটিয়া অবস্থার তৈরি হয়। দাম নির্ধারণে এখানেও তাই দেখি গড় আয় থেকে প্রাপ্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় অনেক নিচে থাকে। তবে তাত্ত্বিকভাবে প্রবেশ ও প্রস্থান সহজ থাকার ফলে দীর্ঘমেয়াদে আবার প্রাপ্তিক ব্যয় গড় আয় থেকে নিচে থাকলেও নিখুঁত প্রতিযোগিতার মতো শূন্য মুনাফায় ভারসাম্য স্থাপিত হবার কথা বিবেচনা করা হয়। নিচে নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশের আগে ও পরে দুই অবস্থারই চিত্র দেয়া হলো। বলাই বাহুল্য, বাস্তব জগতে একচেটিয়া গোষ্ঠীসমূহের ভারসাম্যে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন না হলে নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ সহজসাধ্য নয়।



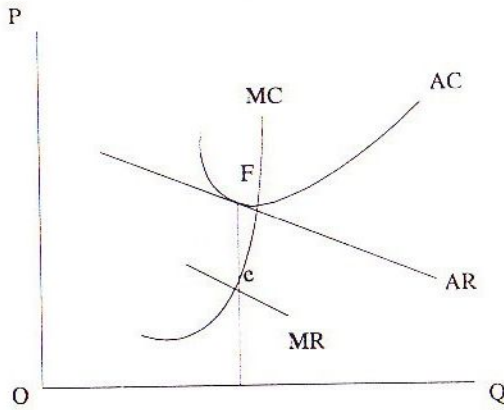
চিত্র ৮.৫: নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশের আগে একচেটিয়াসম প্রতিযোগিতা

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশের আগে $MR=MC$ হচ্ছে e বিন্দুতে। কিন্তু AR রেখা অনেক উপরে থাকায় মুনাফা হচ্ছে $ABCF$ পরিমাণ।

নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশের ফলে F বিন্দুতে $AC=AR$ হয় তার ফলে শূন্য মুনাফা বিন্দুতে ভারসাম্য দেখা দেয়।

দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্র সংখ্যক গোষ্ঠী একচেটিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা বাস্তব বিশ্বে যাকে প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়, তার প্রধান চিত্র। বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার থেকে তেল, গাড়ি, খাদ্য, ওষুধ, বিমান ইত্যাদিতে ক্ষুদ্র সংখ্যক প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলে। দ্বৈত একচেটিয়া, বিপরীত একচেটিয়া ইত্যাদিও এই ধরনের মধ্যেই পড়ে।

সবমিলিয়ে অনিখুঁত বাজারে আমরা তিনটি সম্ভাবনা দেখি:



চিত্র ৮.৬: নতুন প্রতিষ্ঠান প্রবেশের পর একচেটিয়াসম প্রতিযোগিতা

- (১) যখন কতিপয়ের গোষ্ঠী-একচেটিয়াগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া কার্যকরভাবে বহাল থাকে তখন তা নিখুঁত একচেটিয়ার রূপ লাভ করে।
- (২) যখন এগুলোর মধ্যে কোনোরকম বোঝাপড়া থাকে না তখন সীমিত এলাকার মধ্যে প্রায় নিখুঁত প্রতিযোগিতার মতো আচরণ দেখা যায়।
- (৩) বাস্তবে এর কোনোটিই স্থায়ী হয় না। ফলে স্থিতিশীলতাও স্থায়ী হয় না। প্রতিযোগিতা, চক্রান্ত, অগ্রাসন, হিংস্রতা, সহযোগিতা, বাজার ভাগ বাঁটোয়ারা ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ায় বাস্তব পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলতে থাকে।

সংকট ও প্রসার এ দুটোও তাই পালাক্রমে আসে। সংকট খুব বেশি হলে রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় এগিয়ে আসে। ১৯৩০-এর মন্দা বা ১৯৯৭-৯৮ এবং আরও ব্যাপক আকারে ২০০৭-৮-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের উত্তরণের চেষ্টায় আমরা এটাই প্রত্যক্ষভাবে দেখি।

সারসংক্ষেপ

অনিখুঁত বাজারের অভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, সম্পদের কেন্দ্রীভবন, প্রতিযোগিতার বাধা, তথ্য প্রবাহে অসম্পূর্ণতা, ব্যয়বহুল কর্মসূচি, কৌশলগত ঐক্য। সমন্বিত গোষ্ঠী একচেটিয়া বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা যখন অর্থনীতিতে বিদ্যমান কয়েকটি প্রধান একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়। এই বোঝাপড়ার ফলে গড়ে ওঠে কার্টেল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বোঝাপড়া কার্যকর হলে সবগুলো মিলে নিখুঁত একচেটিয়া রূপ দাঁড়ায়, কার্যকর না হলে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা দেখা যায়।

নবম অধ্যায়

উৎপাদন উপাদানের দাম ও বিতরণ Pricing of Factors and Distribution

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপাদানের অংশগ্রহণ থাকে। এসব উপাদানের পেছনে থাকে বিভিন্ন মানুষ, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যাদের নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীগত পরিচয়ও আছে। উৎপাদিত দ্রব্য বিভিন্ন উপাদানের (অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর) মধ্যে কীভাবে বিতরণ হবে সেটা অর্থশাস্ত্রের একটি জটিল বিশ্লেষণের বিষয়। এই প্রশ্ন ঘিরে অর্থশাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদীদের পার্থক্য আরও বেশি ধরা পড়ে। এই অধ্যায়ে উৎপাদন উপাদানের পরিচয়, বিতরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে। মজুরি বিষয়টি নিয়ে বহু রকম বিতর্ক আছে বলে এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়াও এসবের সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ বৈষম্যের চিত্র নিয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের দাম

আমরা জানি, উৎপাদনের প্রধান চারটি উপাদান হিসেবে যেগুলোকে সাধারণত নির্দিষ্ট করা হয় সেগুলো হলো: শ্রম, পুঁজি, ভূমি ও উদ্যোক্তা (সংগঠন)। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই উপাদানগুলোর বিভিন্ন মাত্রায় ভূমিকা থাকে। উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে যে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হয় তার পেছনে এসব উপাদানের ভূমিকা মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় বলে এগুলোর প্রাপ্য নির্ধারণ অর্থশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বরাবরই বিবেচিত। পুঁজিবাদের আদিকাল থেকে, বাজার অর্থনীতি যখন খুব সুসংগঠিত হয়নি, তখন থেকেই উৎপাদন শেষে সম্পদ যে কয় ভাগে বিতরণের প্রশ্ন আমরা বিবেচিত হতে দেখি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মজুরি, সুদ, খাজনা, মুনাফা। মজুরি পায় শ্রমিকেরা, সুদ পুঁজির লগ্নীকারকেরা, খাজনা ভূস্বামীরা এবং মুনাফা পায় উদ্যোক্তারা। সে হিসেবে ক্লাসিকাল, নয়া ক্লাসিকাল, কেইনসীয় অর্থশাস্ত্রে মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফাকে যথাক্রমে শ্রম, পুঁজি, ভূমি ও উদ্যোক্তার প্রাপ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অন্যদিকে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রে মজুরিকে বলা হয় পরিবর্তনীয় মূলধন বা শ্রম শক্তির মূল্যের পরিশোধিত অংশ এবং সুদ, খাজনা ও মুনাফাকে বলা হয় উদ্ভূত মূল্যের অংশ।

আমরা নিচে প্রথমে খাজনা, সুদ ও মুনাফা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো এবং পরে মজুরির প্রধান প্রধান তত্ত্ব ও বিতর্ক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করবো।

খাজনা, সুদ ও মুনাফা

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে স্মিথ, রিকার্ডোসহ ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদেরা এবং ভিন্নভাবে কার্ল মার্কস, উনিশ শতকের শেষ থেকে আলফ্রেড মার্শালসহ নয়া ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদেরা সকলেই এসব বিষয় নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের কাছে সমাজ ছিল তিনভাগে বিভক্ত: ভূস্বামী, শ্রমিক ও পুঁজিপতি। এই বিভাজন হলো তৎকালীন বৃটেনের সমাজেরই একটি চিত্র। সে সময় অর্থনীতিবিদদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয় এই ছিল যে, কীভাবে সম্পদ এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ হয়। ভূমি মালিকানা থেকে প্রাপ্ত ভূস্বামীদের আয় খাজনা হিসেবেই অভিহিত হয়েছে। প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, খাজনা হচ্ছে ভূমি কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত যে কোনো সম্পদের মালিকানা সূত্রে প্রাপ্ত আয়। বিভিন্ন ধরনের জমির খাজনা কীভাবে নির্ধারিত হবে এ নিয়ে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ, বিশেষত ডেভিড রিকার্ডো এবং পরে কার্ল মার্কস তাঁদের তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। উৎকৃষ্ট জমি, নিকৃষ্ট জমি বা প্রান্তিক জমিতে খাজনার বিভিন্ন মাত্রার বিশ্লেষণ এসব থেকে পাওয়া যায়।

ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রে সুদ, মুনাফা ও খাজনাকে বলা হয় উৎপাদিত সম্পদের উপর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অংশ। মার্কসের বিশ্লেষণে মুনাফা, সুদ, খাজনা তিনটিই হলো উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ। অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে মূল্য তৈরি হচ্ছে তার যে অংশ শ্রমিককে শোধ করা হয়নি, তা মালিক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিতরণ হয়। মুদ্রাপুঁজি যোগানদার ব্যাংক বা ঋণদাতা সুদ নেয়, উদ্যোক্তা/মালিক মুনাফা নেয় এবং ভূস্বামী খাজনা নেয়। কার অংশ কত হবে তা তাদের আপেক্ষিক শক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। নয়া ক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রে সুদকে সাধারণত পুঁজির দাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যে মুদ্রা পুঁজি যোগান দিচ্ছে তার অপেক্ষার মূল্যও এটি। সে রকম মুনাফাকে বলা হয় উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক। বলাবাহুল্য, সুদ, খাজনা, মুনাফা কীভাবে নির্ধারিত হবে তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যকার বিস্তারিত মতপার্থক্য তাঁদের অর্থনীতি বিষয়ে সামগ্রিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মজুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব

মজুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব যা আমরা বর্তমান সময়ে অর্থশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখি, সেগুলো সবই সামন্তবাদী ব্যবস্থা ভেঙে যাবার পর শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সম্পত্তিহীন স্বাধীন মজুর শ্রেণীর উদ্ভবের পর থেকে নির্মিত হয়েছে। এ ব্যাপারে যথার্থিতি এ্যাডাম স্মিথকে পথিকৃৎ বলা হয়। যদিও মজুরি তত্ত্ব সেই সময় যথেষ্ট পরিষ্কার হয়নি। স্মিথ তাঁর সামগ্রিক তত্ত্বীয় কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই ভেবেছেন যে, অন্যান্য পণ্যের দামের মতো বাজারে যোগান এবং চাহিদার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই মজুরিও নির্ধারিত হবে। মালিক ও মজুর নিজ নিজ স্বার্থেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে এবং তাতে সকলেরই সর্বোচ্চ কল্যাণ হবে। এই বক্তব্য বর্তমান সময়েও অর্থশাস্ত্রের মূলধারার মজুরি তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

মজুরি তত্ত্বের মধ্যে 'টিকে থাকা তত্ত্ব'ও (Subsistence theories) স্মিথের ধারণা

থেকেই গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্ব শ্রমবাজারে চাহিদার চাইতে যোগানের উপর বেশি নির্ভরশীল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, শ্রমিকদের যোগানের উপরই নির্ভর করে প্রকৃত মজুরি টিকে থাকার মাত্রায় থাকবে নাকি তারও নিচে চলে যাবে। স্মিথ তাঁর মূল গ্রন্থ *Wealth of Nations*-এ বলেছেন যে, শ্রমিকদের মজুরি তাদের বেঁচে থাকা ও পুনরুৎপাদনের মতো যথেষ্ট হতে হবে। অন্যান্য ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ, যেমন রিকার্ডো ও ম্যালথাসের মতামতে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। রিকার্ডো মনে করতেন, শ্রমের 'প্রাকৃতিক দাম' (natural price)ই হলো তার টিকে থাকার ও শ্রমিকদের বংশবৃদ্ধির জন্য যথাযথ দাম। ম্যালথাসের বক্তব্য ছিল এর কাছাকাছি। তাঁর বক্তব্য ছিল, খুব বেশিদিন শ্রমের বাজার দাম প্রাকৃতিক দাম থেকে ভিন্ন থাকতে পারে না। যদি মজুরি টিকে থাকার মাত্রা থেকে বেশি হয় তাহলে বাজারে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং মজুরি হার ঠিকই নেমে যাবে। আবার যদি মজুরি টিকে থাকার খুব নিচে নেমে যায় তাহলে শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাবে এবং মজুরি হার আবার উর্ধ্বগামী হবে। অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যখন এসব তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল তখন ইউরোপেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক টিকে থাকার চাইতে অনেক কম মজুরি পাচ্ছিলেন। এই মজুরিকে যারা অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় মনে করতেন তাদের বক্তব্যকে মজুরির লৌহকঠিন আইন (iron law of wages) এর প্রবক্তা বলা হতো।

এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি তত্ত্ব হলো মজুরি-তহবিল তত্ত্ব (Wages-fund theory)। স্মিথ ও রিকার্ডো তাঁদের বক্তব্যে মজুরির জন্য নির্ধারিত তহবিলের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন তার উপরই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এর মূল কথা হলো, মজুরি নির্ধারিত হয় তার জন্য নির্ধারিত তহবিল দ্বারা। এটি পুঁজিপতিদের অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্ভূত, এবং পুঁজির অংশ। নির্দিষ্ট সময়ে এর যেহেতু পরিবর্তন হয় না, সেহেতু এর পরিমাণ বেশি হলে গড় মজুরি বেশি হবে, আর পরিমাণ কম হলে গড় মজুরি কম হবে। অন্যদিকে মজুরের যোগান বেশি হয়ে গেলে মজুরি কমে যাবে এবং মজুরের যোগান কমে গেলে মজুরি বেড়ে যাবে। সুতরাং মজুরি বাড়তে গেলে মূলধন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের কাজ করাটাই গুরুত্বপূর্ণ। এবং একই কারণে আইন করে মজুরি বাড়ানো কার্যকর হবে না। ১৮৬৫ সালের পর সিনিয়র, মিল, থর্নটন, লঞ্জ এবং ওয়াকার (William Senior, John Stuart Mill, W.T. Thornton, F.D. Longe, and Francis A. Walker) এই তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁরা বলেন, শ্রমের চাহিদা মজুদ তহবিল দিয়ে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় ভোক্তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার ভিত্তিতে।

১৯৩০-এর দশকে মহামন্দার পর কেইনস ও অন্যান্যরা ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারি ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এই সময়েই দেখা যায় মজুরি কমালে কর্মসংস্থান বাড়বে এই তত্ত্বটি ঠিক নয়। উপরন্তু মজুরি হ্রাস ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের মাধ্যমে অধিকতর বিনিয়োগের সংকট তৈরি করতে পারে। এটি 'ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্ব' নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব অবশ্য একক প্রতিষ্ঠান নয়, সমগ্র অর্থনীতি নিয়েই আলোচনা করে।

অন্যদিকে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রে মজুরিকে দেখা হয় পুঁজিবাদে মূলধন সংবর্ধন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। এই অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী শ্রমিক ও মজুরি

পুঁজিবাদের আগে ছিল না, পুঁজির বিকাশ ধারার সঙ্গেই এর বিকাশ ঘটে এবং এর বিভিন্ন প্রবণতাও গড়ে ওঠে। এই ধারার মতে অর্থনীতিতে গতিশীলতা থাকলে মজুরি বৃদ্ধিতে মূলধন সংবর্ধন হ্রাস পায় না। তারা আরও মনে করেন, মজুরি হচ্ছে শ্রমশক্তির পরিশোধিত অংশের মূল্য। এর পরিমাণ বা অনুপাত পূর্বনির্ধারিত নয়। এটা নির্ধারিত হয় শ্রমশক্তির যোগান, শ্রমশক্তির চাহিদা, প্রযুক্তিগত অবস্থান, সাংস্কৃতিক স্তর এবং সর্বোপরি শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের আপেক্ষিক শক্তি বিনিয়াসের উপর। এই ধারার মতে, শ্রমিকেরা সংগঠিত ও শক্তিশালী অবস্থানে থাকলে পণ্যের মূল্যের উপর তাদের অংশীদারীত্ব বাড়বে কিন্তু মালিকানা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক, মতাদর্শিক ও আইনগত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে কখনোই তারা তাদের শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্যের উপর কর্তৃত্ব পাবে না।

শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং মজুরি

শ্রমের চাহিদা ও যোগানের নমনীয়তা মজুরি নির্ধারণে কী ভূমিকা পালন করতে পারে সেটা একটি জরুরি বিষয়। কেননা এই ধারণা ছাড়া মজুরি নির্ধারণ বা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'উৎপাদন উপাদানের দাম' সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা অসম্পূর্ণ হবে।

শ্রমের চাহিদার নমনীয়তা (The elasticity of demand for labour)

১. কোনো পণ্য যেটি উৎপাদিত হচ্ছে, তার চাহিদা নমনীয়তার উপর সেই পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের চাহিদার নমনীয়তা নির্ভর করে। যেমন, ধরা যাক কাগজ যদি অনমনীয় চাহিদা সম্পন্ন পণ্য হয়, তাহলে এর মজুরদের মজুরি বাড়বার ফলে যদি কাগজের দাম বাড়ে তাহলে সেই হারে কাগজের চাহিদা কমবে না। তার ফলে শ্রমের চাহিদার উপরও উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পড়বে না।
২. যে কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যয়ে মজুরির অনুপাত কেমন তা নমনীয়তা নির্ধারণে অনেকখানি ভূমিকা পালন করে। যদি উৎপাদন ব্যয়ের বড় অংশ জুড়ে মজুরি থাকে, তাহলে মজুরি বৃদ্ধি পুরো ব্যয়ের উপর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শ্রমের চাহিদা সেক্ষেত্রে নমনীয় হয় এবং নিয়োগ কমিয়ে ব্যয় কমানোর প্রবণতা থাকে।
৩. স্বল্পমেয়াদে শ্রমের চাহিদা নমনীয়তা কম হবে যদি শ্রমের বিকল্প না থাকে। সেক্ষেত্রে যদি মজুরি বৃদ্ধি পায় তাহলেও শ্রমের চাহিদা সে হারে কমবে না। তবে দীর্ঘমেয়াদে পুঁজি দ্বারা শ্রম প্রতিস্থাপন করা যায় বলে শ্রমের চাহিদা নমনীয় হয়।

শ্রমের যোগানের নমনীয়তা (The elasticity of supply of labour)

শ্রমের মোট যোগান পুরোপুরি অনমনীয় হতে পারে না। কেননা মজুরির বৃদ্ধি সব সময়ই অধিক থেকে অধিকতর শ্রমিককে শ্রমশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে এবং অন্য কর্মরত শ্রমিকদেরও বাড়তি সময় কাজে উৎসাহিত করে।

শ্রমের যোগান মজুরি ছাড়াও আরও অনেক শর্তের উপর নির্ভরশীল। বিশেষত

শ্রমের সময়, কাজের পরিবেশ, কাজের নিশ্চয়তা, কাজের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব, নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ইত্যাদি অনেক বিষয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমের যোগান বিভিন্ন রকম করে থাকে। এছাড়াও শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ছাড়াও পেশাগত বা ভৌগোলিক আরও অন্যান্য উপাদান যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

পেশাগত অচলতা (Occupational immobility)

কোনো কোনো পেশা আছে যেখানে পেশাগত শর্ত কিংবা দক্ষতার বিকাশহীনতার কারণে সেখান থেকে শ্রমিকরা বা পেশাজীবীরা অন্য কোথাও যেতে পারে না। কোনো কোনো দক্ষতা অন্য কোনো পেশার জন্য উপযোগী হয় না।

ভৌগলিক অচলতা (Geographical immobility)

বেকার থাকলেও কিংবা কাজের খুব প্রয়োজন থাকলেও মানুষ সবসময় নিজের ভৌগলিক অবস্থান ছেড়ে বের হতে পারে না। পরিবারের প্রয়োজন, নতুন অনিশ্চয়তা, প্রশিক্ষণের সমস্যা ইত্যাদি কারণে অনেকেই নিজের এলাকার মধ্যেই আটকে থাকেন।

সামাজিক অচলতা (Social immobility)

সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, বিধিনিষেধ ইত্যাদি কারণে যখন শ্রমের বাজারে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয় তখন সামাজিক অচলতা দেখা যায়। বিশেষত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নারীশ্রমের সচলতার ক্ষেত্রে এই অবস্থা আগে অনেক বেশি ছিল, এখনও দেখা যায়।

বাংলাদেশে শ্রমের যোগানের বর্তমান ধারা খেয়াল করলে দেখা যাবে, কাজের চাহিদা এবং বিদ্যমান কাজে প্রকৃত আয়ের নিম্নমাত্রার কারণে ভৌগলিক বা সামাজিক অচলতা এখন অনেকখানি অকার্যকর হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক চাপে পরিবারে ভাঙন, পরিবার থেকে একাধিক সদস্যের কাজের চাপ ইত্যাদি এখন খুব পরিচিত ঘটনা। ঢাকায় কাজের খোঁজে মানুষের অব্যাহত প্রবাহ দেখা যাচ্ছে, শিশু-নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ সকলেই যে হারে কাজ খুঁজছেন সে হারে কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না।

সারসংক্ষেপ

সামন্তবাদী ব্যবস্থা ভেঙে যাবার পর শিশু প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সম্পত্তিহীন স্বাধীন মজুর শ্রেণীর উদ্ভবের পর মজুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে। ক্লাসিকাল, নয়া ক্লাসিকাল, কেইনসীয় অর্থশাস্ত্রে মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফাকে যথাক্রমে শ্রম, পুঁজি, ভূমি ও উদ্যোক্তার প্রাপ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অন্যদিকে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রে মজুরিকে বলা হয় পরিবর্তনীয় মূলধন বা শ্রমশক্তির মূল্যের পরিশোধিত অংশ এবং সুদ, খাজনা ও মুনাফাকে বলা হয় উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ। মজুরি নির্ধারণে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের নমনীয়তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমের যোগান মজুরি ছাড়াও আরও অনেক শর্তের উপর নির্ভরশীল।

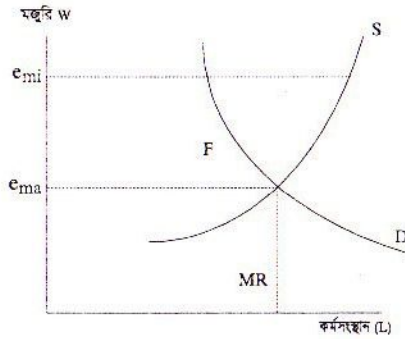
ন্যূনতম মজুরি

ন্যূনতম মজুরি Minimum Wage বলতে বোঝায় মজুরির নিম্নতম সীমা যা একটি শ্রমিক পরিবারের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য অত্যাৱশ্যক। ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত আইন এই সীমা নির্ধারণের একটি আইনগত ব্যবস্থা বা মজুরি কোন পর্যায়ের নিচে নামবে না সেটি নিশ্চিত করে। এই বক্তব্য প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে খুবই প্রভাবশালী যে, বাজার অর্থনীতিতে বা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ন্যূনতম মজুরি বাজার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এটি বাস্তবে মজুরির ক্ষেত্রে অনমনীয়তা তৈরি করে চাহিদা কমিয়ে দেয় এবং তার ফলে বেকারত্ব বাড়িয়ে দেয়। এ নিয়ে ভিন্নমতও যথেষ্ট জোরালো। বর্তমান সময়ে প্রায় সকল শিল্পোন্নত দেশেই ন্যূনতম মজুরি আছে। এছাড়া নয়া শিল্পায়িত দেশগুলোতেও ন্যূনতম মজুরি আছে। ন্যূনতম মজুরি থাকা উচিত কিনা তা নিয়ে অর্থশাস্ত্রে বিতর্ক অব্যাহত থাকলেও প্রাপ্ত তথ্য ও যুক্তি এবং সেইসঙ্গে কোনো কোনো সরকারের উদ্যোগ ন্যূনতম মজুরির পক্ষে।

১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক প্রধান অ্যালেন গ্রিনস্প্যান কংগ্রেস কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ইতোমধ্যে বিভিন্ন গবেষণা থেকে এ রকম কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি যে, ন্যূনতম মজুরি বাড়ালে কর্মসংস্থান কমবে'। অন্যদিকে শিল্পোন্নত ১৭টি দেশের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই দেশগুলোতে ন্যূনতম মজুরি চালু আছে এবং এর যৌক্তিকতা হচ্ছে যে, এটি থাকলে মজুরি ভয়াবহ মাত্রায় নিচে নেমে যাবার সম্ভাবনা থাকে না, এটি বরঞ্চ উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।^{২৪}

অপর পৃষ্ঠায় কয়েকটি চিত্রের মাধ্যমে ন্যূনতম মজুরি ও বাজার প্রক্রিয়ার সম্পর্ক নিয়ে অর্থশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। e_{ma} হচ্ছে বাজার প্রক্রিয়ার ভারসাম্য বিন্দু। কিন্তু ন্যূনতম মজুরি যদি e_{mi} তে নির্ধারণ করা হয় তাহলে চাহিদা কমে যাবে ও যোগান বেড়ে যাবে। স্যামুয়েলসন উপস্থাপিত এই চিত্রে ধরে নেয়া হয়েছে যে, ন্যূনতম মজুরি বাজার গড় মজুরি থেকে বেশি হবে। কিন্তু এই ধরে নেয়া ঠিক নাও হতে পারে।

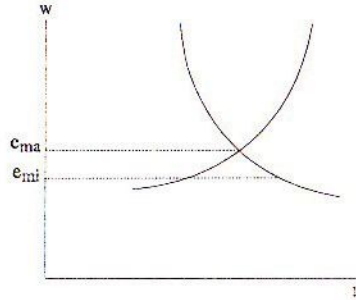
২৪. "Making the most of the minimum: statutory minimum wage, employment and poverty", OECD employment outlook report, June 23, 1998.



চিত্র ৯.১: ন্যূনতম মজুরি কীভাবে বাজার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে (স্যামুয়েলসন)

সামুয়েলসনের চিত্র ভিন্নরূপ নেবে যদি কোনো অর্থনীতিতে দুটো ঘটনার যেকোনো একটি কিংবা দুটোই ঘটে।

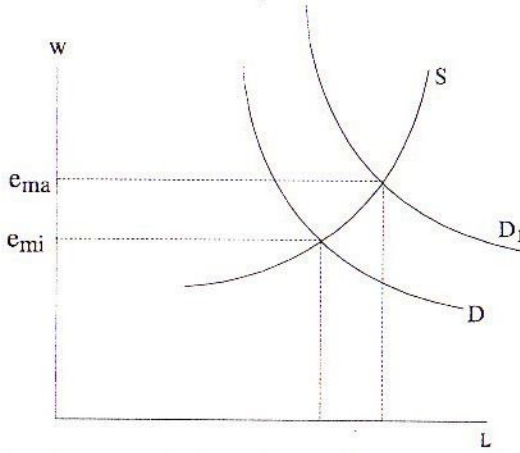
প্রথমত: যদি দেখা যায় যে অর্থনীতিতে গড় মজুরির চাইতে নিচে ন্যূনতম মজুরি স্থাপন করা হচ্ছে তাহলে চিত্র হবে নিম্নরূপ।



চিত্র ৯.২: বাস্তব ন্যূনতম মজুরি কীভাবে বাজার নির্ধারিত মজুরিকে নিচের দিকে টেনে রাখে

এখানে ন্যূনতম মজুরি বাজার গড় মজুরির নিচে স্থাপন করায় চাহিদা যোগান থেকে বেশি হচ্ছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে গড় শিল্প মজুরি ন্যূনতম মজুরি থেকে শতকরা ৩৫ থেকে ৫২ ভাগ বেশি ছিল। এটা এখনও অব্যাহত আছে।^{২৭}

দ্বিতীয়তঃ প্রথম চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা যদি অধিকতর গতিশীলতায় নতুন বিনিয়োগ চিত্র কল্পনা করি তাহলেও ভিন্ন চিত্র হয়।



চিত্র ৯.৩: বিনিয়োগ সম্প্রসারণ কীভাবে কর্মসংস্থান ও মজুরি বাড়ায়

প্রথম দিকে যোগান উদ্বৃত্ত হলেও নতুন চাহিদা রেখার কারণে বাজার ভারসাম্যের সঙ্গে ন্যূনতম মজুরি সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এতে দেখা যাবে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ফলে মজুরের চাহিদাও বাড়ে, মজুরিও বাড়ে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

উনিশ শতকের শেষদিকে এই তত্ত্বের উদ্ভব। এটি শুধু মজুরি নিয়ে নয়, সকল উৎপাদন উপাদান নিয়েই আলোচনা করে। নির্ধারণ কিংবা বিতরণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কে এই তত্ত্বটিকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

১৮২৬ সালে জার্মান অর্থনীতিবিদ ভন থুনের (Johann Heinrich Von Thunen) মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীল তত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তি নির্মাণ করেন। ১৮৭০ দশকে প্রান্তিক ধারণার বিকাশের পর এই তত্ত্বেরও বিকাশ ঘটে। ১৮৯০ দশকে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ উইকস্টিড এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ জে.বি. ক্লার্কসহ আরও অনেক অর্থনীতিবিদ বিতরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার এই তত্ত্ব বিকাশে অবদান রাখেন। অনেকে মনে করেন, মজুরি সম্পর্কে মার্শের তত্ত্বের বিপরীতেই এই তত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।^{২৫} ১৯৩০-এর দশকে একচেটিয়ামূলক বাজারের পরিপ্রেক্ষিতেই এই তত্ত্বের পরিমার্জনা করেন যুক্তরাজ্যে জোয়ান রবিনসন (Joan Robinson) এবং যুক্তরাষ্ট্রে চেম্বারলিন (Edward H. Chamberlin)। এখন আমরা প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটির মূল বিষয়টি বলি। এই তত্ত্বে উৎপাদন উপাদানের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে তার পাওনার সম্পর্ক দেখানো হয়। বাস্তবে এই তত্ত্ব মজুরি নির্ধারণের বিশেষ ব্যাখ্যা করার কাজেই বেশি ব্যবহার করা হয়।

প্রান্তিক বস্তুগত দ্রব্য (Marginal Physical product, MPP) বলতে আমরা বুঝি কোনো উপাদানের এক একক বৃদ্ধিতে মোট বস্তুগত দ্রব্যের বৃদ্ধি আর প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue, MR) বলতে আমরা বুঝি কোনো উপাদানের এক একক বৃদ্ধিতে মোট আয়ের বৃদ্ধি। অন্যদিকে প্রান্তিক আয় দ্রব্য (Marginal Revenue Product, MRP) বলতে উপরোক্ত প্রান্তিক বস্তুগত দ্রব্য ও প্রান্তিক আয়ের গুণফলকে বুঝি।

$$\text{অর্থাৎ } MRP = MPP \times MR$$

আবার প্রান্তিক দ্রব্যের মূল্য (The value of the marginal product, VMP) বলতে আমরা প্রান্তিক বস্তুগত দ্রব্যের সঙ্গে দামের গুণফলকে বুঝি।

$$\text{অর্থাৎ, } VMP = MPP \times P$$

অন্যদিকে প্রান্তিক উপাদান ব্যয় (Marginal factor cost, MFC) হলো

25. Encyclopaedia Britannica (1998)-র বিষয়ে ভাষ্য, 'It is likely that the disturbing conclusions drawn by Marx from classical economic theory inspired this development'.

পরিবর্তনীয় যেকোনো একটি উপাদানের এক একক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়ের পরিবর্তন।

কোনো প্রতিষ্ঠান যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তার পণ্য বিক্রি করে তাহলে সেখানে দাম এবং প্রান্তিক আয় সমান থাকবে। অর্থাৎ $P=MR$ । এবং সেক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় দ্রব্য এবং প্রান্তিক দ্রব্যের মূল্য সমান হবে। আমরা তাই দেখি,

$$MRP=VMP$$

সুতরাং এ থেকেই এই কথাটা দাঁড়ায় যে, মুনাফা সর্বোচ্চ করার উদ্দেশ্যে কর্মরত কোনো প্রতিষ্ঠান যখন নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তার পণ্য বিক্রি করে তখন সে প্রান্তিক আয় দ্রব্য (MRP) বা প্রান্তিক দ্রব্যের মূল্য (VMP) যতক্ষণ প্রান্তিক উপাদান ব্যয়ের (MFC) সমান না হয়, ততক্ষণ সে পরিবর্তনীয় উপাদান ক্রয় করতে থাকে। অর্থাৎ সেখানে প্রান্তিক আয় দ্রব্য বা মূল্য এবং প্রান্তিক উপাদান ব্যয় সমান হওয়া $MRP(VMP)=MFC$ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য অবস্থা। একেই বলে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (Theory of Marginal Productivity)।

শ্রম হচ্ছে একটি পরিবর্তনীয় উপাদান। এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো প্রতিষ্ঠান শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য যে প্রান্তিক ব্যয় করে সেটাই হলো মজুরি। অর্থাৎ মজুরির ক্ষেত্রে তত্ত্বটি দাঁড়াবে এরকম যে, একটি প্রতিষ্ঠান ততক্ষণ পর্যন্তই অতিরিক্ত শ্রম-একক কিনতে থাকবে যতক্ষণ মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান হয়।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী, একজন শ্রমিক যে মজুরি পায় তা তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং কারও মজুরি যদি কম হয় তা পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার কোনো অসঙ্গতি নয়, বরঞ্চ তা শ্রমিকের নিম্ন উৎপাদনশীলতার প্রকাশ! একই সূত্র অনুযায়ী বেকারত্ব মানে বাজারে চাহিদামতো উৎপাদনশীলতা যোগানে ব্যর্থতা।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

এই সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ যেসব বক্তব্য ও প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেগুলো! সংক্ষেপে এভাবে উপস্থাপন করা যায়:

১. এই তত্ত্ব যোগানের দিকটি উপেক্ষা করবার কারণে উপাদানের দামের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব হিসেবে একে আখ্যায়িত করা যায় না।
২. এখানে ধরে নেয়া হয় যে, শ্রম একটি সমরূপ দ্রব্য, যেটি নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একক দামে বিক্রি হচ্ছে। বস্তুতঃ দক্ষতা, কাজের ক্ষেত্র, প্রযুক্তি ইত্যাদি কারণে শ্রম কোনো একক সমরূপ দ্রব্য নয়, শ্রম বাজারও কোনো নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজার নয়।
৩. ধরে নেয়া হয়েছে যে, এখানে শ্রমের ক্রেতা সকলেরই লক্ষ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শ্রম নিয়োগকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ থাকে না।

৪. তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়েছে যে, মজুরি মাত্রা শ্রম উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি, অনেক সময় মজুরি মাত্রা দ্বারা উৎপাদনশীলতা নির্ধারিত হয়। মজুরি বৃদ্ধি অনেক সময় মজুরদের উৎসাহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি করে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। মজুরি ও বেতনখাতে ব্যয় বৃদ্ধি পুরো কাজ ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনশীলতা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। মজুরি বৃদ্ধি পুষ্টি বাড়িয়ে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে। এসব পরিবর্তন শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত দ্রব্য (MPP) বাড়িয়ে দেয় এবং প্রান্তিক আয় দ্রব্য (MRP) রেখাকে ডানদিকে স্থানান্তরিত করে।
৫. শ্রম উৎপাদনশীলতা নাম হলেও এই উৎপাদনশীলতা শুধুমাত্র শ্রমের উপর নির্ভর করে না। শ্রমের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে পুঁজি বিনিয়োগ মাত্রা, প্রযুক্তি বিকাশ মাত্রা, ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর অন্যান্য উপাদানের প্রভাব নিয়ে এই তত্ত্ব কোনো মনোযোগ দেয় না।
৬. এই তত্ত্ব মজুরি নির্ধারণে সামাজিক শ্রেণীসমূহের আপেক্ষিক শক্তি, রাষ্ট্রের ভূমিকা, সাংস্কৃতিক স্তর ইত্যাদিকে বিবেচনা করে না।

সারসংক্ষেপ

ন্যূনতম মজুরি আইন বলতে বোঝায় এমন একটি আইনগত ব্যবস্থা যা মজুরি কোন পর্যায়ের নিচে নামবে না সেটি নিশ্চিত করে। স্যামুয়েলসনের মতে, ন্যূনতম মজুরি বাজার গড় মজুরি থেকে বেশি হয় বলে তা চাহিদা যোগানের ভারসাম্যে সমস্যা তৈরি করে। অন্যদিকে বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে গড় শিল্প মজুরি ন্যূনতম মজুরি থেকে সব সময়ই বেশি ছিল। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বে উৎপাদন উপাদানের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে তার পাওনার সম্পর্ক দেখানো হয়। এই তত্ত্ব যেসব অনুমিতির উপর নির্ভরশীল সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা আছে।

দশম অধ্যায়

বিতরণ ও বৈষম্য

বিতরণ প্রশ্নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

অর্থনীতিতে সম্পদ বিতরণ ও সেইসঙ্গে মালিকানা প্রশ্নটি এখন পর্যন্ত সবচাইতে বিতর্কিত এবং অমীমাংসিত এলাকা। এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ তাঁদের তাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। আমরা এসব বিষয়ে ইতোমধ্যেই অনেকখানি আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে এখানে বিষয়টি নিম্নরূপ উপস্থিত করা যায়।

ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদেরা বলেছেন সমাজের সম্পদ তিনটি শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় ভাগ হবে। শ্রেণী তিনটি হলো: ভূস্বামী, পুঁজিপতি ও শ্রমিক। তাদের মধ্যে উৎপাদিত ও প্রাপ্ত সম্পদ ভাগ হবে যথাক্রমে খাজনা, মুনাফা ও মজুরি হিসাবে। এই মত অনুযায়ী যেহেতু সম্পদ নির্দিষ্ট, সুতরাং কারও প্রাপ্তি বাড়লে অন্যের কমবে। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী, ক্রমাগত পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদন বিকাশের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে পুঁজিপতির মুনাফা ভূস্বামীর খাজনার তুলনায় কমে আসবে এবং তা সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা দেবে।

নয়া ক্লাসিকাল বা প্রান্তিক মতবাদের অর্থনীতিবিদেরা বিতরণকে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবেই দেখেন। তাঁরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উৎপাদন উপাদানের অবদান এবং সেই হিসেবে সেগুলোর দাম নির্ধারণ করেন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রত্যেকটি উপাদানের প্রান্তিক অবদান অনুযায়ী যা সে পায় সেটাই তার পাবার কথা। এখানে কোনো অসঙ্গতির কিছু নেই। তাদের এই তত্ত্ব প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। মার্কিন অর্থনীতিবিদ John Bates Clark এই তত্ত্ব দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান অর্থশাস্ত্রে বিতরণের তত্ত্বসমূহের মধ্যে এটিই সবচাইতে প্রভাবশালী। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মজুরি হচ্ছে শ্রমিকের, খাজনা ভূস্বামীর এবং সুদ পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার প্রকাশ।

এর গাণিতিক চর্চা অর্থশাস্ত্রে খুবই প্রচলিত। যেখানে খুব সহজভাবে বিষয়টি দেখানোর জন্য দুটো উৎপাদন উপাদান নিয়ে উৎপাদন অপেক্ষক দেখানো হয়। এগুলো হলো: শ্রম ও পুঁজি। ভূমিকে এখানে পুঁজির মধ্যেই ধরে নেয়া হয়। এরপর একটিকে স্থির রেখে অন্যটির আংশিক ডিরাইভেটিভের মাধ্যমে তার দাম বের করা হয়। যেমন: পুঁজি স্থির রেখে যদি অতিরিক্ত শতকরা ১ ভাগ শ্রমশক্তি যোগ করলে ০.৬ ভাগ উৎপাদন বাড়ে তাহলে উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ হবে শ্রমিকের পাওনা। একই হিসাব পুঁজির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এই তাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী, উৎপাদন পূর্ণাঙ্গভাবে বিতরণ হয়ে যায়। এই

মডেলে শোষণ, অপচয় বা বঞ্চনার কোনো সুযোগ নেই। এই তাত্ত্বিক মডেল দাঁড় করবার ক্ষেত্রে যিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি হলেন *Leonhard Euler*। তিনি দেখান কোনো উৎপাদক অপেক্ষক $Q=f(L,K)$ -এ স্থির উৎপাদন মাত্রা ধরে তার বিতরণ নিচের সমীকরণের মতো করে দেখানো যায়।

$Q=MP_L \cdot L+MP_K \cdot K$ । এটিই Euler's theorem নামে পরিচিত।

এখানে Q হচ্ছে মোট উৎপাদন, MP_L হচ্ছে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, L হচ্ছে নিয়োজিত শ্রমের একক, MP_K হলো পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা এবং K হলো নিয়োজিত মোট পুঁজির একক।

অন্যদিকে, মার্কস বিতরণ প্রশ্নটিকে মালিকানা ও উৎপাদনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবেই দেখেছেন। তবে তাঁর মডেলে একদিকে ঐতিহাসিক ও অন্যদিকে সামগ্রিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর মতে সম্পদ তা প্রাকৃতিক হোক বা উৎপাদিত হোক, কী অনুপাতে বিতরণ হবে তা মুখ্যত নির্ভর করে মালিকানা ব্যবস্থার উপর। এর সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছুই সম্পর্কিত। মার্কসীয় কাঠামোতে বর্তমান শ্রমকে ধরা হয় জীবন্ত শ্রম হিসেবে আর পুঁজিকে বলা হয় মৃত শ্রম। মার্কসীয় কাঠামোয় এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাটি মৌলিক। অন্যরা যেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছেন, মার্কস সেখানে এটিকে দেখেছেন একটি অস্থায়ী অন্তর্-বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে। পুঁজিবাদী সামগ্রিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে শ্রমিক শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীও এই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণ ও মূলধন সংবর্ধন এক সঙ্গেই চলে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সংকটও সৃষ্টি হয়। মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় উন্নততর কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলে সংকট মোকাবিলায় মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদে আরও একচেটিয়াকরণ সৃষ্টি হয়। বেকারত্ব, বৈষম্য বৃদ্ধি পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই অব্যাহত থাকে।

বৈষম্যের বিভিন্ন ধরন

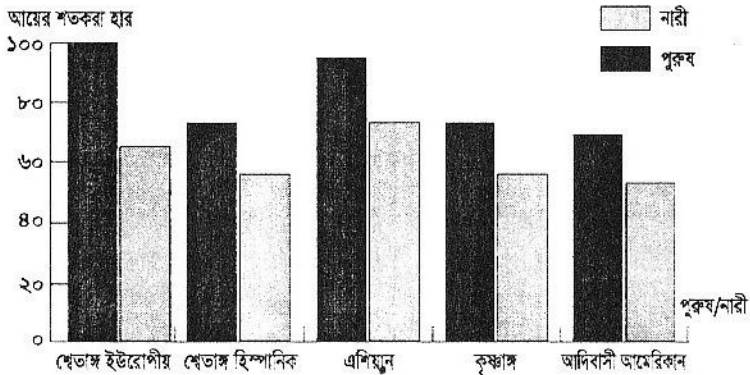
আমরা প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করেছি যে, বাজার অর্থনীতি যে জায়গাগুলোতে তার প্রতিশ্রুত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো সমাজে বৈষম্য। বৈষম্যমূলক অর্থনীতির সমর্থক হয়েও স্যামুয়েলসন নিজেই প্রশ্ন করেছেন যে, 'বাজারের অদৃশ্য হস্ত কি আসলে সব চাইতে বঞ্চিত অংশের পাওনা পরিশোধ নিশ্চিত করতে পারে? যারা দীর্ঘসময় ধরে কাজ করেন তাদের জন্য শোভন জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে?' তিনিই আবার উত্তর দিয়েছেন, 'না'। বলেছেন, 'আসলে প্রতিযোগিতামূলক বাজার, সবচাইতে যার দাবি বেশি বা যার পাবার কথা তার কাছে সম্পদ নিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারে না। এটি আরও ব্যাপক বৈষম্যের দিকে সমাজকে নিয়ে যেতে পারে, তৈরি করতে পারে অসংখ্য অপুষ্ট শিশু যারা আরও অপুষ্ট শিশু তৈরি করবে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় এই বৈষম্য চলতে থাকবে।' স্যামুয়েলসনের মতে, 'অ্যাডাম স্মিথ এই ধারণায় পুরোপুরি ঠিক নন যে, অদৃশ্য হস্তের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ এক জায়গায় গিয়ে মিশবে।'

আমরা বিশ্বব্যাপক বা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার তথ্য থেকে দেখি একদিকে এই বিশ্বের সম্পদ বাড়ছে উচ্চহারে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ হচ্ছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়, কিন্তু সেইসঙ্গে অধিকাংশ মানুষের জীবনই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকছে। বৈষম্য বাড়ছে, দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এসব তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি সম্পদের অভাব নয়, অন্যকোনো কারণ এর পেছনে কাজ করছে। এরপর আমরা যখন দেখি বিশ্বের সবচাইতে সম্পদশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বৈষম্য, অপচয়, দারিদ্র্য পাহাড়প্রমাণ, তখন আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আরও বেড়ে যায়। আমরা এখানে এসব প্রশ্নের সমাধান আলোচনা করতে পারবো না, কিন্তু অন্তত এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণ থেকে বাস্তব চিত্র বুঝতে চেষ্টা করবো।

বৈষম্য বা বণ্টনের বিভিন্ন তথ্য থেকে আমরা দেখি বৈষম্য শুধু যে শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়, এটি একই দেশের মধ্যে নারী-পুরুষ, বিভিন্ন জাতি ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলকে ঘিরে হতে পারে। নিচে কয়েকটি ছক থেকে এর একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

ছক ১: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়ের ক্ষেত্রে জাতিগত ও লিঙ্গীয় বৈষম্য

জনগোষ্ঠী	বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আয়ের চিত্র (ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষের শতকরা অংশ হিসেবে)	
	পুরুষ	নারী
শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় (স্পেনীয় বাদে)	১০০	৬৭
শ্বেতাঙ্গ হিস্পানিক	৭৩	৫৭
এশিয়ান	৯৪	৭১
কৃষ্ণাঙ্গ	৭৩	৫৬
আদিবাসী আমেরিকান	৭১	৫৩



চিত্র ১০.১: বিভিন্ন মাত্রায় বৈষম্য

উপরের ছকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাতে ঐ দেশে মজুরি ও আয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের চেহারা পাওয়া যাচ্ছে। বৈষম্য আমরা দেখছি নারী-পুরুষ, জাতিগত এবং বর্ণগত। এর মধ্যে সবচাইতে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় পুরুষ, তার চাইতে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় নারীর আয় কম। আবার সবচাইতে খারাপ অবস্থায় আছেন যথাক্রমে কৃষ্ণাঙ্গ ও আদিবাসী আমেরিকান নারী।

ছক ২: যুক্তরাষ্ট্রে পেশাগত অবস্থানে নারী-পুরুষ

পেশা	নারীর অংশগ্রহণ (%)
উচ্চ আয়সম্পন্ন	
প্রকৌশলী	৮.৫
ডাক্তার	২৬.৪
আইনজীবী	২৯.৫
নিম্ন আয়সম্পন্ন পেশা	
শিশু যত্ন কর্মী	৯৭.১
ব্যক্তিগত সচিব	৯৮.৬
নার্স, সহযোগী	৮৮.৪

উপরের ছকে নির্দিষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নারী-পুরুষের পেশাগত এমন একটি চিত্র আমরা পাচ্ছি যেখান থেকে বোঝা সম্ভব কীভাবে পেশার শুরুতেই বৈষম্যের বীজ রোপিত হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে যেসব পেশায় আয় কম মেয়েদের অংশগ্রহণ কিংবা কর্মসংস্থান সেগুলোতেই বেশি। এর অনুপাত শতকরা ৮৮ থেকে শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে যেসব পেশায় আয় বেশি, সেগুলোতে মেয়েদের প্রবেশাধিকার খুবই কম। এই চিত্র শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, আন্তর্জাতিক। বাংলাদেশেও একই ঘটনা আছে। তবে বাংলাদেশের মতো দেশে মজুরিবিহীন কাজে মেয়েদের একটি বড় অংশ নিয়োজিত আছেন। কৃষি এর একটি বড় ক্ষেত্র। এছাড়া পারিবারিক শিল্প বা ব্যবসায়ে তাদের শ্রম স্বীকৃত নয়। শিশুপালন বা গার্হস্থ্য শ্রম তো আছেই। বাংলাদেশে দিনমজুর বা শিল্পমজুর হিসেবে মেয়েদের অংশগ্রহণ এখন আগের তুলনায় বেশি। সেখানে আমরা একই রকম চিত্র দেখি।

ছক ৩: একই কাজে বিভিন্ন দেশে মজুরির তফাৎ

অঞ্চল	শিল্পখাতে উচ্চ মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা (ঘণ্টা প্রতি ডলার)
জার্মানি	৩১.৮৮
জাপান	২৩.৬৬
যুক্তরাষ্ট্র	১৭.২০
ইটালী	১৬.৪৮
যুক্তরাজ্য	১৩.৭৭
দক্ষিণ কোরিয়া	৫.২৫
মেক্সিকো	১.৫১
ভারত	০.৭১
বাংলাদেশ	০.২০

উপরের ছক থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আয়ের আকাশ-পাতাল ব্যবধান দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে মজুরি প্রায় ৮০ গুণ এবং জার্মানিতে প্রায় ১৫০ গুণ বেশি। এই ব্যবধানের নানা কারণ রয়েছে। ক্রয়ক্ষমতার অভিন্ন মাপকাঠি বা (Purchasing Power Parity (PPP) দিয়ে বিবেচনা করলে এই ব্যবধান কিছুটা কমে আসবে। তবে অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে দামের তারতম্য থাকলে, যেমন কম দামের এলাকা থেকে বেশি দামের এলাকার দিকে পণ্যের প্রবাহের একটা প্রবণতা থাকে শ্রমের ক্ষেত্রেও তাই হয়। কিন্তু শ্রমের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ অনেক বেশি। বিশেষত শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বকতার কারণে ঐসব দেশে শ্রমের স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ব্যবধানের উঁচু মাত্রা অব্যাহত থাকছে। 'বাজার প্রক্রিয়ায়' ব্যবধান দূর হচ্ছে না।

ছক ৪: ৯০ দশকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয়ে বিভিন্ন আয় গ্রুপের অনুপাত

	বাংলাদেশ ১৯৯১-৯২	বাংলাদেশ ১৯৯৫-৯৬	যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৮	যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৫
সর্বনিম্ন ৫%	১.০৩	০.৮৮	—	—
প্রথম ২০%	৬.৫২	৫.৭১	৪.৬০	৩.৭০
দ্বিতীয় ২০%	১০.৮৯	৯.৮৬	১০.৭০	৯.১০
তৃতীয় ২০%	১৫.৫৩	১৩.৮৮	১৬.৭০	১৫.২০
চতুর্থ ২০%	২২.১৯	২০.৫০	২৪.০০	২৩.৩০
পঞ্চম ২০%	৪৪.৮৭	৫০.০৮	৪৪.০০	৪৮.৭০
সর্বোচ্চ ৫%	১৮.৮৫	২৩.৬২	১৭.০০	২১.০০

উপরের ছকে আমরা বিকশিত ও অবিকশিত 'বাজার অর্থনীতি'র ভেতরের বৈষম্যের পরিষ্কার চিত্র দেখতে পাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন মাত্রার উদাহরণ। বাংলাদেশ 'দরিদ্র' 'অনুন্নত' দেশ হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র সবচাইতে সম্পদশালী, ক্ষমতাবান, সবচাইতে শক্তিশালী অর্থনীতি। কিন্তু আমরা যখন আকাশ-পাতাল তফাতের এই অর্থনীতিগুলোর ভেতরের বৈষম্যের চিত্র দেখি, তখন সেখানে বৈষম্যের অনুপাতে কোনো আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখি না। দেখি দুই অর্থনীতিতেই একই ধরনের বৈষম্য। এমনকি এর পরবর্তীকালে গত কয়েক বছরে বৈষম্য বৃদ্ধির প্রবণতাও একই রকম। এখন (২০১০) পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে দু'দেশেই সর্বোচ্চ শতকরা ৫ ভাগ ও ২০ ভাগ জনগোষ্ঠীর হাতে সম্পদ তুলনামূলকভাবে বেশি বেড়েছে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের শতকরা ৫ ও ২০ ভাগ জনগোষ্ঠীর সম্পদের অনুপাত কমেছে। ভয়াবহ আর্থিক সংকটের কারণে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র ও বৈষম্য তুলনায় বেড়েছে বেশি।

বৈষম্যের পরিমাপক

অর্থশাস্ত্রে বৈষম্য পরিমাপের জন্য যে দু'টি ধারণা বহুল ব্যবহৃত সেগুলো হলো: গিনি সহগ ও লরেঞ্জ রেখা।

গিনি সহগ (Gini concentration ratio or 'Gini coefficient')

ইটালীয় পরিসংখ্যানবিদ (C. Gini)-র নামানুসারে এই অনুপাত বৈষম্যের মাত্রা বোঝার জন্য ব্যবহার হয়। এই অনুপাত শতকরা ১০০ ভাগের দিকে যত যাবে ততই সেখানে বেশি বেশি বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। আর অনুপাত যত ০-এর দিকে যাবে ততই সেখানে বৈষম্যের হ্রাস পাচ্ছে বলে ধরে নেয়া যাবে।

লরেঞ্জ রেখা (Lorenz curve)

লরেঞ্জ রেখা হলো এমন একটি রেখা যার মধ্য দিয়ে একটি দেশের বিভিন্ন আয়গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদ বিতরণের আনুপাতিক বন্টন বোঝা যায়। একটি অর্থনীতিতে বিভিন্ন আয়গোষ্ঠীর মধ্যে আয় বন্টন যদি পুরোপুরি নিখুঁত সমতাভিত্তিক হয় তাহলে রেখাটি থাকবে ০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি কোণিক অবস্থানে।

সারসংক্ষেপ

সম্পদ বিতরণ প্রশ্নে অর্থনীতিবিদের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বাজার অর্থনীতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, না তার নিরসন করে সেটি নিয়েও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কোনো ঐক্যমত নেই। তবে বাস্তব তথ্য থেকে বিভিন্ন দেশে শ্রেণীগত, নারী পুরুষ কিংবা আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধির ঘটনাই দেখা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে দেখা যায় যেসব দেশে আয় কম, মেয়েদের অংশগ্রহণ কিংবা কমসংস্থান সেগুলোতেই বেশি। বাংলাদেশে মজুরিবিহীন কাজে মেয়েদের একটি বড় অংশ নিয়োজিত আছে। অর্থশাস্ত্রে বৈষম্য পরিমাপের জন্য গিনি সহগ ও লরেঞ্জ রেখা—এই দুটো ধারণা ব্যবহৃত হয়।

একাদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: ধারণা ও বিনিময় হার International Trade: Concept and exchange Rate

বাণিজ্য যখন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করে তখনই তাকে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলি। বিভিন্ন অঞ্চল ধরে বা রাষ্ট্রীয় পরিধিকে অতিক্রম করে বাণিজ্য দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত। তবে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও অনেকগুণ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কিত অনেক তত্ত্বও জন্মলাভ করেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও বিভিন্ন মতবাদ ও ধারা ক্রমে বিকশিত হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিনিময় হার নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা, বিতর্কও বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনারও বিকাশ ঘটেছে। এসব বিষয় নিয়েই আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও তার বিকাশ

পারস্পরিক প্রয়োজনে মানুষ পরস্পর বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা বিনিময় করে। এ রকম বিনিময় যখন বৃহৎ আকারে সংঘটিত হয় তখন তাকে আমরা বাণিজ্য বলি। বাণিজ্য যখন নির্দিষ্ট রাষ্ট্র নামক ভৌগোলিক কাঠামোর বাইরে সম্প্রসারিত হয়, যখন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র জুড়ে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

আজকের দিনে আমরা যাকে রাষ্ট্র বলে জানি সেরকম রাষ্ট্রের বয়স খুব বেশিদিনের নয়, কয়েকশো বছর। এর আগে ছিল সম্রাজ্য, তারও আগে আমরা পাই গোত্রীয় সমাজ। রাষ্ট্রের বয়স বেশিদিনের নয় বলে বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় আইন, বিধিনিষেধ, সার্বভৌমত্ব, গুরু-অগুরু বাধা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাণিজ্যের বয়সও বেশিদিনের নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, 'আন্তর্জাতিক' বলতে সাধারণভাবে আমরা দূরদূরান্তের যে বাণিজ্যের কথা জানি, তা তখন ছিল না। বহুকাল আগে থেকেই মানুষ দূরদূরান্তে, নৌপথে, স্থলপথে বাণিজ্য করতে গেছে। প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে বাণিজ্য ছিল খুব সীমিত। তাছাড়া ক্রেতা সীমিত থাকায় বাজারও খুব সীমিত ছিল। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এক সময়ে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ বা

রৌপ্য ব্যবহার করা হতো। ক্রমে ধাতব মুদ্রা, কাগজী মুদ্রা এবং এক পর্যায়ে এসে ক্রেডিট কার্ড চালু হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র তার সার্বভৌম প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা চালু করেছে। এর ফলে বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণের প্রশ্ন এসেছে। এর মধ্যেও অনেকরকম বিবর্তন এসেছে।

সাম্প্রতিককালে ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইট চ্যানেল-এর বিকাশের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ই-বাণিজ্যের প্রসার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ

প্রধানত চারটি কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো:

- * প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতা।
- * চাহিদার তারতম্য।
- * প্রযুক্তিগত তফাতের কারণে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি উৎপাদন।
- * উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

প্রথমত: প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতা। বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে সম্পদের প্রাপ্যতা বা প্রাচুর্য বিভিন্নরকম হতে পারে। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকার অনেক দেশে খনিজ সম্পদ বেশি আছে। এসব দেশ খনিজ সম্পদ রফতানি করতে পারে কিংবা খনিজ সম্পদ নির্ভর শিল্প গড়ে তার উৎপাদিত দ্রব্য রফতানি করতে পারে। অন্যদিকে জাপানে প্রযুক্তিগত সম্পদ আছে কিন্তু খনিজ সম্পদ নেই, সে ঐ খনিজ সম্পদ আমদানি করতে পারে। বাংলাদেশে প্রচুর পাট উৎপাদন হয়। বাংলাদেশ তাই পাট বা পাটজাত দ্রব্য রফতানির বিপুল সম্ভাবনা আছে। আবার, শ্রমশক্তি সুলভ ও মজুরি অনেক নিম্ন থাকার কারণে এখানে গার্মেন্টস-এর মতো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা প্রধানত রফতানির উদ্দেশ্যেই স্থাপিত।

দ্বিতীয়ত: চাহিদার তারতম্য। সম্পদের প্রাচুর্য এবং রুচি বা সামাজিক কোনো কারণে তার কম চাহিদা থাকার কারণে কোনো দেশ কোনো পণ্য রফতানিতে অগ্রহী হতে পারে। আবার অন্য কোনো দেশ সেই পণ্য আমদানিতে অগ্রহী হতে পারে। ভারতে গরুর সংখ্যা অনেক। কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে সেখানে গরুর মাংসের চাহিদা কম। অন্যদিকে বাংলাদেশে গরুর মাংসের চাহিদা বিপুল। যে কারণে বাংলাদেশে ভারত থেকে বৈধ ও অবৈধ পথে প্রচুর গরু আমদানি হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত: প্রযুক্তিগত তফাতের কারণে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি উৎপাদন। সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রযুক্তিগত অবস্থানের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। যে সব দেশ প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে সে সব দেশে উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য অনেক দেশের চাইতে বেশি, যেখানে প্রযুক্তিগত এই অগ্রগতি হয়নি। তার ফলে কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো পণ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে কিংবা তা উদ্বৃত্ত হচ্ছে। সে চাইবে এসব পণ্য অন্য কোথাও রফতানি করতে। অন্যদিকে যে সব দেশ প্রযুক্তিগত কারণে এসব পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করতে পারছে না,

কিন্তু তার চাহিদা রয়েছে সেসব দেশ এসব পণ্য আমদানি করতে চাইবে। যেমন বাংলাদেশের মতো দেশ যুক্তরাষ্ট্র বা তাইওয়ান থেকে কম্পিউটার কিংবা জাপান বা ভারত থেকে গাড়ি আমদানি করে।

চতুর্থত: উৎপাদন খরচের পার্থক্য। উৎপাদন খরচের পার্থক্য তৈরি হয় সম্পদের প্রাপ্যতা বা প্রাচুর্যের তফাৎ কিংবা প্রযুক্তিগত তারতম্যের কারণে। বাংলাদেশে শ্রমশক্তির প্রাচুর্য আছে, পাটের প্রাচুর্য আছে। সুতরাং এখানে শ্রমপ্রধান শিল্প কিংবা পাটকেন্দ্রিক উৎপাদনের উৎপাদন খরচ কম পড়বে। আবার মিশর বা পাকিস্তানে তুলা আছে। সুতরাং উৎপাদনে তাদের খরচ কম পড়বে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার কারণে জাপান বা কোরিয়ায় গাড়ি উৎপাদনে খরচ কম পড়বে। আপেক্ষিক দক্ষতার কারণে আবার জাপান বা কোরিয়া কম্পিউটার চিপ উৎপাদনে যে সুবিধা পায় তা যুক্তরাষ্ট্র পায় না। কিন্তু প্রযুক্তিগত কারণে বা আপেক্ষিক দক্ষতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিমান বা কম্পিউটার উৎপাদনে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে।

তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে, খরচের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য অনেক সময় কৃত্রিমভাবে বা ক্ষমতাপ্রয়োগের মাধ্যমেও করা হয়। এই চর্চা আজকের নয়। এটি গুরু হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলেই।

সারসংক্ষেপ

চারটি কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো: প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতা, চাহিদার তারতম্য, প্রযুক্তিগত তফাতের কারণে উদ্ভূত বা ঘটিত উৎপাদন এবং উৎপাদন খরচের পার্থক্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন এসেছে। স্বর্ণ বা রৌপ্য থেকে ক্রমে ধাতব মুদ্রা, চেক এবং এক পর্যায়ে এসে ক্রেডিট কার্ড চালু হয়েছে। ই-বাণিজ্যের প্রসার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।

বৈদেশিক বিনিময় হার মানে কী?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যেহেতু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার ব্যবহার হয় সেহেতু বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হার অর্থাৎ একটির সঙ্গে অন্যটি বাজারে কী হারে বিনিময় হচ্ছে সেটি অন্যতম নির্ধারক ব্যাপারে পরিণত হয়। বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে আমরা একটি মুদ্রার তুলনায় অন্য একটি মুদ্রার দাম বুঝি। বিভিন্ন কারণে, অর্থনীতির সবলতা-দুর্বলতা, মুদ্রার চাহিদা-যোগান, আমদানি-রফতানির চাহিদার উৎস বা ধরন ইত্যাদির উপর মুদ্রার দাম নির্ভর করে।

বিনিময় হার ব্যবস্থা: বিবর্তন

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যতই সম্প্রসারিত হচ্ছে ততই এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হচ্ছে, বিতর্ক হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্বে ‘স্বর্ণমান’-ই (gold standard) ছিল বিনিময় হারের প্রধান নির্ধারক। সে অনুযায়ী, সবগুলো দেশের মুদ্রা স্বর্ণ-এর সঙ্গে স্থির অনুপাতে বাধা থাকতো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্বর্ণ আমদানি ও রফতানি করতেও সক্ষম ছিল। স্বর্ণমান কার্যকর হবার জন্য কয়েকটি শর্তপূরণ জরুরি ছিল:

১. স্বর্ণই কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।
২. দেশের স্বর্ণমজুদ এবং মুদ্রার যোগানের মধ্যে অপরিবর্তনীয় অনুপাতে সম্পর্কিত থাকবে।

৩. মজুরি ও দাম নমনীয় (flexible) থাকবে এবং ‘মুদ্রার পরিমাণ তত্ত্ব’ কার্যকর থাকবে।

পূর্ণ ক্লাসিক্যাল মডেলে তাই এ রকম বিশ্বাসই প্রবল ছিল যে, যে কোনো ভারসাম্যহীনতা দেখা গেলে বাজার প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা আবার ভারসাম্যে ফিরে আসবে। প্রক্রিয়াটি সরল: যেমন, “ঘাটতি দেশে স্বর্ণ কমে যাবে, মুদ্রা সরবরাহও কমে যাবে, দাম ও মজুরি কমেবে এবং রফতানি আরও বেশি বেশি উৎসাহিত হবে। এর ফলে ঐ দেশে বাণিজ্য ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত দেশে স্বর্ণমজুত বাড়বে, সে জন্য মুদ্রা যোগান বাড়বে, দাম এবং মজুরি বেড়ে রফতানি নিরুৎসাহিত হবে। তার ফলে বাণিজ্য ভারসাম্য আবার পুরনো জায়গায় ফিরে আসবে।”

কিন্তু মজুরি আর দাম নমনীয় না হবার ফলে এবং অন্যান্য শর্তগুলোও পুরোপুরি কার্যকর না হবার ফলে বাস্তবে ঐই ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। দেখা গেছে মুদ্রা সরবরাহ কমে যাবার ফলে ঘাটতি দেশে দাম কমে যাবার পরিবর্তে বেকারত্ব বেড়ে

যায়। বাণিজ্যের অব্যাহত সম্প্রসারণের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্বর্ণমান অনুযায়ী মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো ক্রমে আরও পরিষ্কার হতে থাকে। ৩০ দশকের মহামন্দা এ সব সমস্যাকে আরও স্পষ্ট করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের ব্রিটন-উডস এ আন্তর্জাতিকভাবে বিনিময় হারের সমন্বয় করবার চেষ্টা হিসেবে স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থার (fixed exchange rates) পুনর্বিন্যাস করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একে ব্রিটন উডস ব্যবস্থা (Bretton woods system or adjustable peg) বা সমন্বয়যোগ্য ব্যবস্থা বলা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্বর্ণের সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার থাকবে স্থির: তোলা প্রতি ৩৫ ডলার। এই হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র অনির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ কেনার অধিকারী ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে সবচাইতে ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund, IMF) সেসময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশের জন্য আইএমএফ-এর শর্ত দাঁড়ালো প্রধানত তিনটি—

১. স্বর্ণ অথবা ডলারের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মুদ্রামান ঘোষণা করতে হবে।
২. অন্তত স্বল্পমেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার কেনাবেচার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের ঘোষণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে। এবং
৩. আইএমএফকে না জানিয়ে কেউ শতকরা ১০ ভাগের বেশি মুদ্রামান হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে না। শতকরা ১০ ভাগের বেশি মুদ্রামূল্য পরিবর্তন করতে গেলে আইএমএফ-এর অনুমতি লাগবে, যে অনুমতি সকল সদস্য দেশের মতামতের ভিত্তিতেই গৃহীত হবে। সে হিসেবে বিভিন্ন দেশের মুদ্রামান বস্তুতঃ ডলারের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে গেল এবং সে হিসেবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো সকল দেশই। একে বলা হয় স্থির কিন্তু সমন্বয়যোগ্য বিনিময় হার ব্যবস্থা।

একটা পর্যায়ে গিয়ে একক ডলার নির্ভর এই ব্যবস্থা ঘিরেও নানা সমস্যা দেখা গেল। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন আনুষ্ঠানিকভাবে ডলার ও স্বর্ণের যোগসূত্র ছিন্ন করেন। এর মধ্য দিয়ে সূচিত হলো নমনীয় ও ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা (flexible or floating exchange rates); এই ব্যবস্থায় বাজারের চাহিদা যোগান দিয়েই একটি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হবে। তবে বলাই বাহুল্য, ডলার এখনও বাস্তবে একটি তুলনীয় অবস্থানেই রয়েছে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত ডলারের তুলনামতেই বিভিন্ন মুদ্রার অবস্থান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আইএমএফ বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় একক ক্ষমতাধর শক্তি

বর্তমানে আমরা যে ধরনের বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে আছি সেটি 'স্বর্ণমান' ব্যবস্থাও নয় আবার 'ব্রিটন-উডস' ব্যবস্থাও নয়। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নিম্নরূপ:

- * কিছু কিছু দেশ তাদের মুদ্রাকে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রায় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দিয়েছে। বাজারের মাধ্যমে এসব মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের মধ্যে অন্যতম।
- * আবার কিছু প্রভাবশালী দেশ আছে যেগুলোতে নমনীয় কিন্তু নিয়ন্ত্রিত বিনিময় ব্যবস্থা চালু আছে। এই ব্যবস্থায়, এই দেশগুলির সরকার মুদ্রার স্থিতিশীলতা

রক্ষার প্রয়োজনে কখনো কখনো হস্তক্ষেপ করে। বাজারে মুদ্রামূল্যের উঠানামা নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য মাঝে মাঝে বাজারে বিক্রয় বা ক্রয়ও করে থাকে। এই ধরনের দেশের মধ্যে এখন আছে কানাডা, জাপান, বৃটেন ইত্যাদি।

- * কোনো কোনো দেশ, বিশেষত অনেক 'তৃতীয় বিশ্ব' ভুক্ত দেশ তাদের মুদ্রা অন্য এক বা একাধিক শক্তিশালী মুদ্রার সঙ্গে সম্পর্কিত করে রাখে।
- * কোনো কোনো দেশ সমষ্টিগতভাবে মুদ্রা রূক গঠন করে নিজেদের মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার চেষ্টা করেছে। এ ধরনের উদ্যোগের সবচাইতে বিকশিত রূপ হচ্ছে ইউরোপীয় একক মুদ্রা 'ইউরো'র প্রবর্তন।
- * উপরন্তু প্রায় সব দেশই মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য কখনো বাজার কখনো হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ করে থাকে।

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন-এর মধ্যে আমাদের মতো দেশগুলোতে মুদ্রার অবমূল্যায়ন (money devaluation)ই সবচাইতে বেশি দেখা যায়। যখন অন্য কোনো মুদ্রার সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রার মূল্য বা বিনিময় হার কমে যায় তখন তাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলে। যেমন, যখন ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমিয়ে দেয়া হয় তখন তাকে টাকার অবমূল্যায়ন বলা হয়। যদি আবার মূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয় তাকে বলে মুদ্রার উর্ধ্বমূল্যায়ন (money revaluation)। অবমূল্যায়ন সিদ্ধান্তের ব্যাপার এবং তা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ (সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক) নিয়ে থাকেন। এর কাছাকাছি ধারণা হলো মুদ্রার অবক্ষয় (money depreciation), এটি সরকারি ঘোষণার ব্যাপার নয়। যখন বাজারে একটি মুদ্রার মূল্য অন্য দেশের তুলনায় কমে যায়, তখন তার অবক্ষয় হয়েছে বলে ধরা যায়। আবার যখন অন্য মুদ্রার তুলনায় এই মুদ্রার মূল্য বাড়ে, তখন তাকে মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি (money appreciation) বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য মুদ্রার অবমূল্যায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত ঘটনা। বাংলাদেশে মুদ্রার অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত আইএমএফ-এর সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে কিংবা আইএমএফ-এর পরামর্শে বাংলাদেশ ব্যাংকই নিয়ে থাকে। নিচের ছক থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পারছি যে, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বহুবার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এসব সিদ্ধান্তের পেছনে প্রধানত রফতানি বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বৃদ্ধির যুক্তিই দেখানো হয়েছে।

কিন্তু মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে রফতানি কিংবা প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বৃদ্ধি পায় কিনা তা নিয়ে অর্থশাস্ত্রে অনেক বিতর্ক আছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মার্শাল-লার্নার শর্ত (The Marshall-Lerner condition)। এই শর্ত অনুযায়ী, যদি আমদানি ও রফতানি নমনীয়তা (elasticity) ১-এর থেকে বেশি (অর্থাৎ, $e_x + e_m > 1$) না হয় তাহলে এ ধরনের পদক্ষেপ বা বিনিময় হারের নমনীয়তার (flexibility) অন্য কোন পদক্ষেপে নিতি রফতানি বৃদ্ধি বা প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে কোনো লাভ হবে না।

একটি দেশে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বা অবক্ষয়-এর মাধ্যমে বিদেশে তার পণ্যের দাম কমে, সেই হিসেবে এর পর সে পণ্যের চাহিদা বাড়বে এবং রফতানি আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে এই খাতের বিকাশ ঘটতে সাহায্য করবে বলে ধারণা করা হয়। একইসঙ্গে একই ঘটনার ফলে এই দেশে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং তাতে আমদানিকৃত পণ্যের চাহিদা কমে যাবার কথা। কিন্তু এই ঘটনাগুলো কি মাত্রায় ঘটবে এবং সেগুলোর সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে অর্থনীতির উপর কী প্রভাব পড়বে তা নির্ভর করে এসব পণ্যের দাম চাহিদা নমনীয়তার (price elasticity of demand) উপর।

যদি রফতানি পণ্যের দাম চাহিদা নমনীয়তা ১ এর কম হয় তাহলে দাম যে হারে কমবে সে হারে চাহিদা বাড়বে না, অর্থাৎ অবমূল্যায়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে নিট রফতানি আয় বাড়বে না। আর যদি দাম চাহিদা নমনীয়তা ১ এর বেশি হয়, তাহলে দাম যে হারে কমবে তার চাইতে বেশি হারে চাহিদা বাড়বে। সেক্ষেত্রে নিট রফতানি আয় বাড়বে। অন্যদিকে আমদানি পণ্যের দাম বাড়লে, সে সব পণ্যের দাম চাহিদা নমনীয়তা ১ এর কম থাকলে নিট আমদানী ব্যয় বাড়বে, ১ এর বেশি থাকলে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ কমবে। দেখা গেছে আমদানি ও রফতানি দুয়ের সম্মিলিত দাম চাহিদা নমনীয়তা যদি ১ এর বেশি হয় তাহলে বাণিজ্য ভারসাম্য অনুকূল হবে।

সাধারণত মুদ্রার অবমূল্যায়ন বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে ব্যয় ও চাহিদা (cost-push demand-pull) দু'দিক থেকেই মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা তৈরি করে।

ছক ১: মার্কিন ডলারের সঙ্গে বাংলাদেশের টাকার বিনিময় হার (১৯৭১-২০০৮)

সময়	এক ডলারের বিনিময়ে বাংলাদেশের টাকার পরিমাণ
১৯৭১/২	৭.৩০
১৯৭৫/৬	১৫.০৫
১৯৮১/২	২০.০৭
১৯৮৫/৬	২৯.৮৯
১৯৯১/২	৩৮.১৫
১৯৯২/৩	৩৯.১৪
১৯৯৩/৪	৪০.০০
১৯৯৭/৮	৪৫.৪৫
১৯৯৯/০	৫০.৩১
২০০০/১	৫৩.৯৫
২০০১/২	৫৭.৪৩
২০০৪/৫	৬১.৩৯
২০০৫/৬	৬৭.০৭
২০০৭/৮	৬৮.৬০

সূত্র: বিবিএস, ২০০৯

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশ্বে 'স্বর্ণম'ন'ই ছিল বিনিময় হারের প্রধান নির্ধারক। ব্রিটন-উডস ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্বর্ণের সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার ছিল স্থির: তোলা প্রতি ৩৫ ডলার। ডলার ও স্বর্ণের এই যোগসূত্র হয় ১৯৭১ সালে। তবে এখনও ডলারের তুলনাতেই বিভিন্ন মুদ্রার অবস্থান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় শক্তি। বাংলাদেশে মুদ্রার অবমূল্যায়ন সিদ্ধান্তের পিছনে রপ্তানি বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক শক্তিবৃদ্ধির যুক্তিই দেখানো হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব ও বাণিজ্য শর্ত Balance of Payment and Terms of Trade

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণের মাত্রা এক নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের পার্থক্য, সম্পদ-সুযোগ-প্রযুক্তিগত ইত্যাদি ক্ষেত্রের পার্থক্যের কারণে উৎপাদনের লাভ ক্ষতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনো একটি দেশ কীরকম অবস্থানে আছে সেটা বোঝার জন্য লেনদেনের ভারসাম্য ও বাণিজ্য শর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে আমরা দুটো বিষয়ের বিশ্লেষণ দেখবো। একইসঙ্গে এই অংশে থাকছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থানের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা।

লেনদেনের ভারসাম্য

লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব বলতে বিভিন্ন দিক থেকে বা বিভিন্ন হিসাবে একটি দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য সকল দেশের নাগরিক, সরকার ও প্রতিষ্ঠানের যে লেনদেন হয় তার সামগ্রিক হিসাব বোঝায়। এই পুরো হিসাবকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। এগুলো হলো: চলতি হিসাব (current account) ও মূলধনী হিসাব (capital account)।

চলতি হিসাব (current account): এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান দু'ধরনেরই আমদানি ও রফতানির হিসাব। দৃশ্যমান আমদানি ও রফতানির মধ্যে আছে সব ধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি। আর অদৃশ্যমান আমদানি ও রফতানির মধ্যে আছে সব ধরনের অবস্তুগত বা সেবা (services) ধরনের পণ্যসামগ্রী। এর মধ্যে আছে: নাগরিকদের থেকে বিদেশিদের প্রদত্ত সেবা (পর্যটন, জাহাজসহ পরিবহন, বীমা ও ব্যাংকসহ অর্থকরী কাজ) থেকে প্রাপ্ত অর্থ; এদেশে কর্মরত বিদেশিদের দেশে পাঠানোর পর অবশিষ্ট অর্থ, মুনাফা, সুদ; প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ; চিকিৎসা, বেড়ানো, লেখাপড়াসহ বিভিন্ন কাজে প্রেরিত অর্থ। যে সব কাজে অর্থৎ যেসব দল১৯

দৃশ্যমান ও অদৃশ্য খাতের আমদানিতে অর্থ বাইরে যায় সেগুলোকে দায় (debit) এবং যে সব কাজে অর্থৎ যে সব দৃশ্যমান ও অদৃশ্য খাতের রফতানিতে অর্থ যোগ হয় সেটাকে ধরা হয় প্রাপ্তি (credit) হিসেবে। আমদানির চাইতে রফতানি বেশি হলে আমরা বলি চলতি হিসাব উদ্বৃত্ত (surplus) হয়েছে, আর আমদানির চাইতে রফতানি কম হলে আমরা বলি চলতি হিসাব ঘাটতি (deficit) হয়েছে।

মূলধনী হিসাব (capital account): এই হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদে আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে মূলধন স্থানান্তর। দীর্ঘমেয়াদি মূলধন স্থানান্তরের মধ্যে আছে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, বিদেশিদের এদেশে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ, আন্তঃসরকার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। স্বল্পমেয়াদি মূলধন স্থানান্তরের মধ্যে পড়ে সব ধরনের স্বল্পমেয়াদি বেসরকারি ঋণ ও বিনিয়োগ।

উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি

চলতি হিসাবে ঘাটতি মানে হলো আন্তর্জাতিক ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি। তার ফলে মূলধনী হিসাবে আবার উদ্বৃত্ত দেখা যায়।

লেনদেনের হিসাব = চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত/ঘাটতি + মূলধনী হিসাবের উদ্বৃত্ত/ঘাটতি = শূন্য

লেনদেনের হিসাবে ক্রমাগত যদি ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তার ফলাফল প্রধানত দুটো ক্ষেত্রে দেখা যায়:

১. ঘাটতি যদি দেখা যায় তাহলে স্থির বিনিময় হার নিয়ে একটি দেশ ক্রমাগত বৈদেশিক মুদ্রার মজুত হারাবার অবস্থায় পতিত হয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থকরী সংস্থাসমূহের কাছে ক্রমবর্ধমান হারে ঋণী হয়ে পড়ে। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না, কেননা মজুদ এবং ঋণের উৎস দুটোই সীমিত। আবার যখন উদ্বৃত্তের অবস্থা দেখা যায় তখন দেশটির মজুত ক্রমাগত, অন্য দেশগুলির ঘাটতি সৃষ্টির বিনিময়ে, বাড়তে থাকে। এর ফলে আভ্যন্তরীণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে।
২. যখন ঘাটতি দেখা যায়, তখন দেশের বিনিময় হারের উপর নিম্নমুখী চাপ পড়ে, আবার উদ্বৃত্তের সময়ে উর্ধ্বমুখী চাপ দেখা যায়। এই চাপের মুখে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তন হবে কী হবে না তা নির্ভর করবে ঐ দেশে বিদ্যমান বিনিময় হার ব্যবস্থার উপর।

লেনদেনের হিসাবে ক্রমাগত ভারসাম্যহীনতা দেখা গেলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলোর এক বা একাধিক ব্যবস্থা নেয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১. সেই দেশ চাহিদা ব্যবস্থাপনার নীতি (demand-management policies) গ্রহণ করতে পারে। ঘাটতির সময়ে সংকোচনমূলক রাজস্ব বা মুদ্রানীতিকেই যথার্থ বিবেচনা করা হয়। ধরা হয় এতে আমদানিসহ সামগ্রিক চাহিদা কমবে। এবং উদ্বৃত্তের সময়ে সম্প্রসারণমূলক নীতিকেই কার্যকর বিবেচনা করা হয়। বলা দরকার যে, অনেক সময় এসব নীতি একটি দেশের কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যেমন, কোনো দেশে একই সঙ্গে ঘাটতি ও বেকারত্ব থাকলে সংকোচনমূলক ব্যবস্থায় বিরূপ ফলাফল হয়।
২. ঐ দেশ আমদানি নিয়ন্ত্রণের দিকে যেতে পারে।
৩. ঐটি মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব বলতে বিভিন্ন দিক থেকে বা বিভিন্ন হিসাবে একটি দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য সব দেশের নাগরিক, সরকার ও প্রতিষ্ঠানের যে লেনদেন হয় তার সামগ্রিক হিসাব বোঝায়। প্রধানত চলতি ও মূলধনী এই দুই ভাগে পুরো হিসাবকে ভাগ করা যায়। লেনদেনের হিসাবে ক্রমাগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে চাহিদা ব্যবস্থাপনার নীতি গ্রহণ করা হয়। ঘাটতির সময়ে সংকোচনমূলক রাজস্ব বা মুদ্রা নীতি এবং উদ্ভবের সময় সম্প্রসারণমূলক নীতিকে কার্যকর বিবেচনা করা হয়।

বাণিজ্য শর্ত

বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যখন অংশগ্রহণ করে, তখন এটি একদিকে যেমন রফতানি করে তেমনি একই সঙ্গে আবার আমদানিও করে। আমদানি ও রফতানি মিলিয়ে তার ভারসাম্য অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে তা বোঝার জন্য বাণিজ্য শর্ত ধারণাটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বাণিজ্য শর্ত দিয়ে বোঝা যায় দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতি না উদ্ভূত অবস্থায় আছে।

এক কথায় বাণিজ্য শর্ত আসলে হলো আমদানি সূচক ও রফতানি সূচকের অনুপাত। অর্থাৎ, বাণিজ্য শর্ত = রফতানি দামের সূচক/আমদানি দামের সূচক। যদি একটি দেশ যে রফতানি করে তার দামের সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তার আমদানি দামের সূচকের তুলনায় বৃদ্ধি পায় তাহলে বোঝা যাবে যে, বাণিজ্য শর্ত তার অনুকূলে। আবার যদি রফতানি দামের সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়কালে তার আমদানি দামের সূচকের তুলনায় হ্রাস পায় তাহলে বোঝা যাবে যে, বাণিজ্য শর্ত তার প্রতিকূলে। এক হিসেবে বাণিজ্য শর্ত হচ্ছে আপেক্ষিক রফতানি দাম সূচক।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

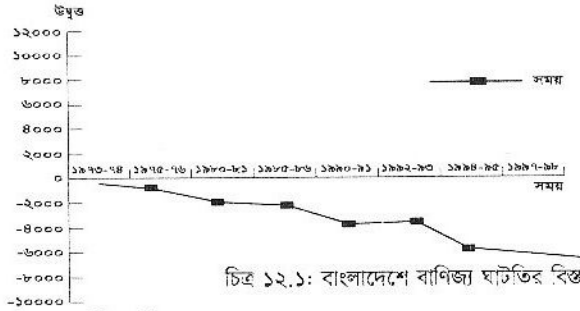
ছক ১: বাংলাদেশে বিদেশি বাণিজ্য (কোটি টাকায়)

বছর	রফতানি আয়	আমদানি আয়	ভারসাম্য
১৯৭৩-৭৪	২৯৭.৪১	৭৩২.০০	-৪৩৪.৫৯
১৯৭৫-৭৬	৩০৬.০০	১০৮৪.০	-৭৭৮.০
১৯৮০-৮১	১১৪৮.৪	৩৭২৮.৮	-২৫৮০.৪
১৯৮৫-৮৬	২৭৩৯.৬	৬২৯২.৯	-৩৫৫৩.৬
১৯৯০-৯১	৬০২৭.২	১১১৮.৭	-৫১৬০.৫
১৯৯২-৯৩	৮৮২১.৫	১৩৮১৯.৮	-৪৯৯৮.৪
১৯৯৪-৯৫	১৩৯৬১.৪৬	২৩৪৫২.৬৮	-৯৪৯১.২২
১৯৯৭-৯৮	২৫০৮৪.২	৩৬৪৯১.৪	-১১৪০৭.২
১৯৯৯-০০	২৮৭২৮	৪৫১৯৮	-১৬৪৭০
২০০৩-০৪	৩৯৮৯৪	৬৬৪৯০	-২৬৫৯৬
২০০৭-০৮	৯৭৩৫৯	১৪৯১৭৮	-৫১৮১৯

সূত্র: বিবিএস ১৯৯৮, ২০০৯

বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত বুঝতে গেলে বাণিজ্যের সামগ্রিক চেহারাটিও আমাদের দেখা দরকার। নিচের কয়েকটি ছকে এর চিত্র দেয়া আছে। প্রথম ছকে দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমাগত বাড়ছেই। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি

ছিল ৪৩৪.৫৯ কোটি টাকা, ১৯৯৪-৯৫ নাগাদ এই ঘাটতি প্রায় ২০ গুণ বেড়ে হয়েছে ৯৪৯১ কোটি টাকা। ২০০৮-৯ সাল নাগাদ এই ঘাটতি আরও অনেক বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকা।

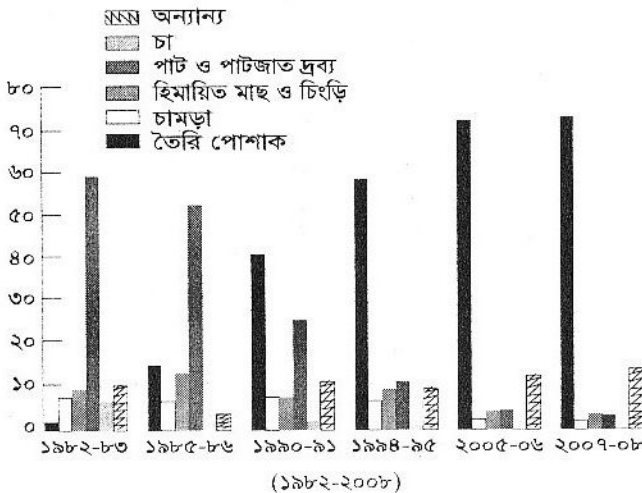


ছক ২: রফতানী বাণিজ্যের ধরন

রফতানি	(মোট রফতানি আয়ের %)					
	১৯৮২-৮৩	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৪-৯৫	২০০৫-০৬	২০০৭-০৮
তৈরি পোশাক	২.০	১৬	৪৩	৬১	৭৫.০৬	৭৫.৮৩
চামড়া	৮.০	৭	৮	৭	২.৪৪	২.০২
হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি	১০.০	১৪	৮	১০	৪.৩৬	৩.৭৮
পাট ও পাটজাত দ্রব্য	৬২.০	৫৫	২৭	১২	৪.৮৪	৩.৪৩
চা	৭.০	৪	২	১	০.১১	০.১১
অন্যান্য	১১.০	৪	১২	১০	১৩.১৯	১৪.৮৩

চিত্র ১২.২: বাংলাদেশের রফতানি বাণিজ্যের গঠন

সূত্র: বিবিএস, ১৯৯৮, ২০০৯

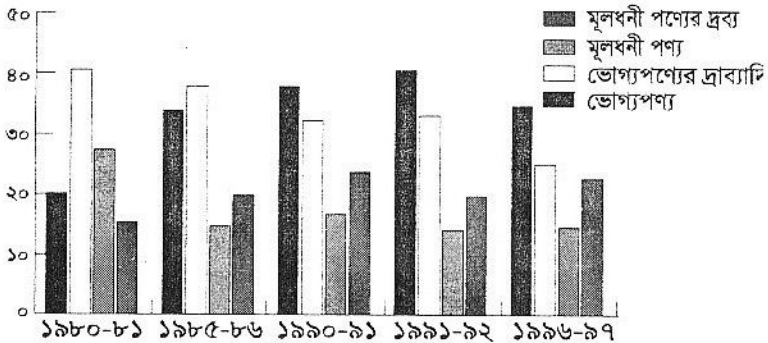


এই দু'টি ছক থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি ধরন পাওয়া যাচ্ছে। আমরা দেখছি, ৮০ দশকের মধ্যেই রফতানি বাণিজ্যের ধরন পুরোপুরি পাল্টে গেছে। ১৯৮২-৮৩ সালেও যেখানে পাট ও পাটজাতদ্রব্যই ছিল প্রধান রফতানি পণ্য (৬২%), সেটি ১৯৯৪-৯৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১২%। উল্টোদিকে তৈরি পোশাক ১৯৮২-৮৩ সালে যেখানে ছিল, ২%, ১৯৯৪-৯৫ সালে তা হয়েছে ৬১%। বর্তমান পর্যন্ত রফতানি বাণিজ্যের গতিমুখ তাই আছে। অর্থাৎ প্রথমত বাংলাদেশের রফতানি বাণিজ্য আগে যেখানে পাটনির্ভর ছিল এখন সেখানে তা বস্ত্রশিল্প নির্ভর। দ্বিতীয়ত, আগেও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য যেখানে একক পণ্য নির্ভর ছিল, এখনও তাই আছে।

আমাদানি ক্ষেত্রে ১৯৮০-৮১ থেকে ভোগ্যপণ্যের প্রাধান্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ২০০৬-৭ থেকে ২০০৭-২০৮ পর্যন্ত আমদানি এলসি ক্ষেত্রে ভোগ্য পণ্য বেড়েছে শতকরা ৮৪.৮৪ ভাগ। শিল্পে মূলধন বেড়েছে ২৯.২৬ ভাগ এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি কমেছে ৮.৩৮ ভাগ।

ছক ৩ : আমদানি বাণিজ্যের ধরন (%)

আমদানি পণ্যের ধরন	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯৬-৯৭
ভোগ্যপণ্য	১৭.৯	৩২.৮	৩৪.৭	৩৯.১৭	+৩২.৩
ভোগ্যপণ্যের দ্রব্যাদি	৪০.৩	৩৬.১	৩০.১	৩০.২৯	-২২.৩
মূলধনী পণ্য	২৬.৯	১২.৩	১৪.৪	১২.৫৭	-১২.৪
মূলধনী পণ্যের দ্রব্যাদি	১৪.৯	১৮.৯	২০.৮	১৭.৯৭	+১৯.৬



চিত্র ১২.৩: বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যের গঠন

বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হলো ভারত। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি বিশেষত্ব আছে। সেটি হল, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের বড় অংশই সংঘটিত হয় বেআইনিভাবে, যাকে প্রচলিত ভাষায় বলা হয় চোরাচালানী। নিচের ছকে বাংলাদেশ ও ভারতের বৈধ ও অবৈধ দুই বাণিজ্যেরই একটি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

ছক ৪: ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য

বিষয়	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
আইনি আমদানি	১৬৬০.২৬
আইনি রফতানি	৮৪.৪২
আইনি বাণিজ্য ঘাটতি	১৫৭৫.৮৪
বেআইনি আমদানি (বেআইনী রাস্তা)	২০৮৬.৩৮
বেআইনি আমদানি (আইনী রাস্তা)	৪১৪.০৬
মোট বেআইনি আমদানি	২৫০০.৪৪
বেআইনি রফতানি	৫০৬.৫২
বেআইনি বাণিজ্য ঘাটতি	১৯৯৩.৯২
ভারতের সঙ্গে মোট বাণিজ্য ঘাটতি	৩৫৬৯.৭৬

উপরের ছক থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতিই প্রধান প্রবণতা। বৈধ ও অবৈধ দুই ক্ষেত্রেই এই চিত্র অভিন্ন। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি এই চিত্রে আইনি বাণিজ্য ঘাটতি যেখানে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা, সেখানে বেআইনী বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা। এই ঘাটতি পরবর্তী দশকে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে ভারত থেকে বাংলাদেশ আইনি পথে আমদানি করেছে প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা, রফতানি করেছে ২ হাজার ৫২০ কোটি টাকা। আইনি পথেই ঘাটতি ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। বাংলাদেশের বাজারে চীন এখন ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি আমদানি রপ্তানি দাম সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত কী দাঁড়াচ্ছে? নিচের ছকে আমরা এর পরিচয় পাচ্ছি।

ছক ৫: বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত (১৯৭৯/৮০ = ১০০)

সাল	আমদানি দাম সূচক	রফতানি দাম সূচক	বাণিজ্য শর্ত
১৯৭৯/৮০	১০০	১০০	১০০
১৯৮০/৮১	৮৬.৮	১১৩.৫	৭৬.৫
১৯৮৫/৮৬	৭৮.৯	৯৮.৫	৮০.১
১৯৮৯/৯০	৯৫.৬	১০৩	৯২.৮
১৯৯৩/৯৪	১১৩.৩	১১০.৮	১০২.৩
১৯৯৬/৯৭	১৩৩.৪	১৩৬	৯৮.১
২০০২-০৩	১৫৭.৭৬	১২৬.২৩	৮০.০১
২০০৭-০৮	১৮৯.৩৯	১৫৪.৫৪	৮১.৬০

উপরের ছকে ১৯৭৯-৮০ সময়কালকে ভিত্তি ধরে হিসাব করা হয়েছে।

বলাইবাহুল্য যে, ভিত্তি বছর ভিন্ন হলে এই চিত্র পুরোপুরি এ রকম থাকবে না। তবে এ থেকে একটি প্রবণতা বোঝা যায়। ১৯৯৫-১৯৯৬ ভিত্তিবছর ধরেও ২০০৭-০৮ পর্যন্ত বাণিজ্য শর্তের অবনতি দেখা যায়।

সারসংক্ষেপ

বাণিজ্য শর্ত বলতে আমদানি ও রপ্তানি সূচকের অনুপাত বোঝায়। একটি রপ্তানিকারক দেশের রপ্তানি দামের সূচক একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যদি তার আমদানি দামের সূচকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, তাহলে বোঝা যাবে যে, বাণিজ্য শর্ত তার অনুকূলে। বিপরীতটি হলে বাণিজ্য শর্ত হবে প্রতিকূলে। বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি এখনও বর্ধমান। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বরাবরই একক পণ্য নির্ভর। আগে প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট, এখন পোশাক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব Theories of International Trade

আমরা এর আগে দু'টি অংশে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাধারণ ধারণা, এর গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য কিছু বিষয় এবং সেইসাথে বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করেছি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি বোঝা এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ থেকে এ বিষয়ক অনেক তত্ত্ব এ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করেছে। আমরা এখানে বিশেষতঃ শিল্প বিপ্লব সময়কালীন ক্লাসিকাল তত্ত্ব দিয়ে আলোচনা করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, সমালোচনা ইত্যাদি এইসঙ্গে উপস্থাপন করছি।

বাণিজ্য তত্ত্বের স্তর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে বাণিজ্যতত্ত্বীদের তত্ত্ব যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও অ্যাডাম স্মিথসহ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরাই প্রথম এ বিষয়ে সুসংহত ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর এই প্রশ্নটিকে স্থাপন করেন। তাঁদের মতে এই বিষয়টির সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন জড়িত। এগুলো হলো:

১. বাণিজ্য থেকে সুবিধাগুলো কী কী যেগুলো একটি রাষ্ট্র পেতে পারে? বাণিজ্য না করলে কি কি ক্ষতি হতে পারে?
২. বাণিজ্যের কাঠামো কী হবে? অর্থাৎ কী কী দ্রব্য আমদানি হবে, কী কী দ্রব্য রফতানি হবে? কী কী মৌলিক বিধি বাণিজ্যের এই প্রবাহকে প্রভাবিত করে?
৩. বাণিজ্যের শর্ত কী কী? অর্থাৎ আমদানি ও রফতানির মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক হতে পারে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে অ্যাডাম স্মিথ যে তত্ত্ব দাঁড় করান তাকে আমরা জানি চরম সুবিধা তত্ত্ব (Principle of Absolute Advantage) হিসেবে। এরপর ডেভিড রিকার্ডো আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব (Principle of Comparative Advantage) দেন। এর ধারাবাহিকতায় আরেকটি তত্ত্ব আমরা পাই, যাকে বলা হয় সুযোগবর্জন তত্ত্ব (Theory of Opportunity Cost)।

চরম সুবিধা তত্ত্ব

অ্যাডাম স্মিথ বলেন, অবাধ বাণিজ্য একজনকে লাভবান করে একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাণিজ্যতত্ত্বীদের এই ধারণা ঠিক নয়। তাঁর মতে, আসলে এটি চরম সুবিধাতত্ত্ব

অনুযায়ী সকলকেই লাভবান করবে। একটি দেশ (ক) যদি কোনো কিছু উৎপাদনে অন্যদের চাইতে বেশি দক্ষতা প্রদর্শন করে কিংবা যদি বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে এবং অন্যদেশে (খ) যদি সেই দ্রব্যের চাহিদা থাকে, কিন্তু উৎপাদন করা যদি সেখানে বেশি ব্যয়বহুল কিংবা অসুবিধাজনক হয় তাহলে দু'পক্ষের জন্যই লাভজনক হবে: ক ঐ দ্রব্য উৎপাদনে ক্রমাগত আরও বেশি বেশি মনোযোগ দেবে এবং বিশেষীকরণ (specialization) করবে এবং খ ঐ দ্রব্য উৎপাদন না করে আমদানি করবে এবং অন্য দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দেবে। এর ফলে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ হয়ে উঠবে, বিশেষীকরণ ঘটবে; এতে সব দ্রব্য উৎপাদনই দক্ষ ও লাভজনক হবে। সকলে কম দামে ভালো দ্রব্য পাবার সুযোগ অর্জন করবে। শ্বিথের মত অনুযায়ী, এই আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ ও বিনিময় অথবা আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন (international specialization and exchange or international division of labour) একটি দক্ষ ও লাভজনক বৈশ্বিক ব্যবস্থা দাঁড় করাবে।

চরম সুবিধা (প্রতি একক শ্রমে উৎপাদন)

	বাংলাদেশ	ভারত
পাটজাত দ্রব্য	৪	২
প্রসাধনী দ্রব্য	২	৬

১ একক শ্রম দিয়ে বাংলাদেশ ৪টি পাটজাত দ্রব্য ও ২টি প্রসাধনী দ্রব্য কিনছে। আর ভারত ১ একক শ্রম দিয়ে ২টি পাটজাত দ্রব্য ও ৬টি প্রসাধনী দ্রব্য কিনছে। যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকে তাহলে বাংলাদেশে ৪টি পাটজাত দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় হবে ২টি প্রসাধনী দ্রব্য আর ভারতে ২টি পাটজাত দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় হবে ৬টি প্রসাধনী দ্রব্য। যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হয় তাহলে বাংলাদেশ ৪টি পাটজাত দ্রব্য দিয়ে ২টির বদলে পেতে পারে ৬টি প্রসাধনী দ্রব্য। আর ভারত ৬টি প্রসাধনী দ্রব্যের বদলে ২টির জায়গায় পেতে পারে ৪টি পাটজাত দ্রব্য। এভাবে, এই তত্ত্ব অনুযায়ী, অবাধ বাণিজ্য থাকলে, দু'দেশই লাভবান হচ্ছে।

আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব

অ্যাডাম শ্মিথ বিভিন্ন দেশ কিছু দ্রব্য উৎপাদনে যে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে সেটাকে বলছেন চরম সুবিধা। অর্থাৎ কোনো কোনো পণ্যে কিছু কিছু দেশ চরম সুবিধা পেয়ে থাকে। এই ধারণায় প্রযুক্তিগত বিকাশকে হিসাবে আনা হয়নি। ডেভিড রিকার্ডো পরে এই ধারণাকে সংশোধন করে বলেছেন, চরম সুবিধা নয়, বাণিজ্যের প্রধান শর্ত হলো আপেক্ষিক সুবিধা।

আপেক্ষিক সুবিধা (প্রতি একক শ্রমে উৎপাদন)

	বাংলাদেশ	ভারত
পাটজাত দ্রব্য	৪	৪
প্রসাধনী দ্রব্য	২	১২

এখানে ধরা হচ্ছে যে, ভারত প্রযুক্তিগত এমন উন্নয়ন করেছে যাতে তার উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এর ফলে তার পক্ষেও এক একক শ্রম দিয়ে ৪টি পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব। একই শ্রম দিয়ে ভারত এখন ১২টি প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। রিকার্ডের বক্তব্য হলো এরকম অবস্থায় দুটো পণ্য উৎপাদনেই ভারত চরম সুবিধায় আছে। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে ভারতের জন্য প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দেয়া অনেক বেশি সুবিধাজনক। রিকার্ডের মতে, এই আপেক্ষিক সুবিধাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করে। আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী, ভারত প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদনে এবং বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দিলে দুই দেশেরই মোট উৎপাদন বাড়বে এবং অবাধ বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে দুই দেশই লাভবান হবে। অর্থাৎ, চরম সুবিধা নয়, আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী প্রতিটি দেশ বিশেষীকরণ ও উৎপাদনে গুরুত্ব দিলে পুরো বিশ্বে সামগ্রিক উৎপাদনই বৃদ্ধি পাবে।

অর্থাৎ আমরা আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের বিষয়টি এভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি যে, সবগুলো দেশই লাভবান হবে যদি প্রত্যেকে তার নিজ নিজ আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী, তুলনামূলক কম খরচে যেগুলো উৎপাদন করা সম্ভব সেগুলো, বিশেষীকরণ ও রফতানি করে এবং আপেক্ষিক সুবিধা যেগুলোতে নেই, অর্থাৎ যেগুলো উৎপাদনে আপেক্ষিকভাবে বেশি খরচ পড়ে সেগুলো যদি আমদানি করে।

একদিকে শিল্পে অনুন্নত দেশ, ও অন্যদিকে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিবেচনায় নিয়ে অনেকে বলেন—‘অনুন্নত’ দেশগুলো যদি জাপানকে তেল রফতানি করে, জাপান যদি যুক্তরাষ্ট্রকে ভোগ্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রফতানি করে, যুক্তরাষ্ট্র যদি অনুন্নত দেশগুলোতে মেশিনপত্র রফতানি করে তাহলে সকলেই লাভবান হবে। বলা দরকার যে, এরকম পরামর্শে বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক সুবিধাকে অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু যদি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয়, কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় তাহলে এই আপেক্ষিক সুবিধার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে। ‘অনুন্নত দেশ’ সেক্ষেত্রে শুধু প্রাথমিক পণ্য রপ্তানিতে কেন্দ্রীভূত নাও থাকতে পারে। শুধুমাত্র তেল রপ্তানিকারক না হয়ে শিল্পায়নে সেই দেশের আপেক্ষিক সুবিধা তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে খনিজ সম্পদ রপ্তানি না করে নিজ দেশে ব্যবহারই তার জন্য অধিক লাভজনক হবে।

সারসংক্ষেপ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব প্রথম সুসংহতভাবে উপস্থিত করেন ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদরা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভ-ক্ষতি, বাণিজ্য কাঠামো-আমদানি-রপ্তানির সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো যথাক্রমে চরম সুবিধা তত্ত্ব ও আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব সূত্রায়ন করেন। এছাড়াও সুযোগবর্জন তত্ত্বও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। চরম ও আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্বে বিভিন্ন দেশের চরম বা আপেক্ষিক সুবিধাকে অনেক ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করা হয়।

অনুমিতির সীমাবদ্ধতা

আগের পাঠে আলোচিত ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব তার সামগ্রিক তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই গড়ে উঠেছে। তাদের অনুমিতি (assumptions) অর্থনীতি নমনীয় দাম ও মজুরি নিয়ে এবং কোনোরকম অনিচ্ছুক বেকারত্বের অনুপস্থিতিতে ঠিকঠাকমতো চলছে। এসব তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি। যখন বেকারত্ব বেড়ে যায় কিংবা বিনিময় হারে যখন অসঙ্গতি থাকে কিংবা অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বা মন্দার অবস্থা দেখা যায় তখন বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। যখন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা গোষ্ঠী স্বার্থ কাজ করে তখন এমন বাণিজ্যও হতে পারে যাতে একটি দেশ দীর্ঘমেয়াদে বা এমনকি স্বল্পমেয়াদেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার মন্দার অবস্থা থাকলে উদ্যোক্তারা নানাভাবে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা পছন্দ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: যখন বলা হচ্ছে যে, আপেক্ষিক সুবিধার কারণে বাণিজ্যে সকলেই লাভবান হবে তখন আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখি এর ফল অর্থনীতির সকল খাতের জন্য একই রকম হয় না। বাণিজ্যে কোনো কোনো খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অর্থনীতিতে যদি বৈষম্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় থাকে তাহলে জিডিপি বাড়লেও আয় বিতরণের ক্ষেত্রে কোনো সহায়ক ভূমিকা নাও পড়তে পারে, বরঞ্চ বৈষম্য আরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

তৃতীয়ত: বাণিজ্যের এই তত্ত্বে অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার, প্রভাবশালী গোষ্ঠী কিংবা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানের চাপ সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য অনেক ক্ষতিকর বাণিজ্যের দিকে দেশকে ঠেলে দিতে পারে।

সুযোগবর্জন ব্যয় তত্ত্ব (theory of opportunity cost)

চরম ও আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের একটি অভিন্ন অসুবিধা আছে বলে পরবর্তী নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করেছেন। তাঁদের মতে দুটো ক্ষেত্রেই অভিন্ন অসুবিধাটি হচ্ছে পুরো তত্ত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে শ্রমের মূল্যতত্ত্ব (labour theory of value) ব্যবহার। শ্রমের মূল্যতত্ত্ব অনুযায়ী, শ্রমই সকল পণ্য-উৎপাদনের মূল উপাদান এবং একটি পণ্যের মূল্য তার ভেতরে কতটা শ্রম আছে তার উপর নির্ভর করে। সেই হিসেবে শ্বিথ ও রিকার্ডো যখন চরম ও আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, তখন শ্রমকে একক ধরেই তারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। এটাকে গ্রহণযোগ্য মনে না করবার পেছনে পরবর্তী নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা যে যুক্তি

দিয়েছেন তা হলো:

- শ্রম দিয়ে মূল্য পরিমাপ অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে।
- শ্রম ছাড়াও আরও অনেক উপাদান উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।
- সকল শ্রম একই মূল্য সৃষ্টি করে না। কারণ দক্ষতা, প্রযুক্তি ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন শ্রম বিভিন্ন ফলাফল সৃষ্টি করে।

শ্রমের মূল্যতত্ত্ব নিয়ে আপত্তি করলেও উপরোক্ত বাণিজ্য তত্ত্বকে এই অর্থনীতিবিদেরা প্রত্যাখ্যান করেননি। বরঞ্চ এগুলোকে তারা শ্রমের মূল্যতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুনভাবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এরকম চেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ: সুযোগবর্জন ব্যয় তত্ত্ব। গটফ্রাইড হেবারলার (Gottfried Haberler) ৩০-এর দশকে এই তত্ত্বকে বিকশিত করেন।

যে কোনো একটি দ্রব্যের সুযোগবর্জন ব্যয় বলতে আমরা বুঝি সেই দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে যে দ্রব্য উৎপাদন করা যায়নি তার থেকে সম্ভাব্য আয়। অর্থাৎ আলু উৎপাদনের সুযোগবর্জন ব্যয় হলো আলু উৎপাদন করতে গিয়ে যদি ধান উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে ধান উৎপাদনে যে আয় হতে পারতো সেই আয়।

হেবারলার দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি আসলে এই সুযোগবর্জন ব্যয়। অর্থাৎ এই ব্যয় দিয়েই একটি দেশ তার আপেক্ষিক সুবিধা নির্ধারণ করতে পারে। একটি দ্রব্যের সুযোগবর্জন ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হবে তা রফতানি লাভজনক কিনা। সে দ্রব্য উৎপাদনে কতটা শ্রম আছে, সেখানে শ্রম ছাড়াও আরও কিছু আছে কিনা, সেটি এক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

হেকসার-ওহলিন মডেল (Heckscher-Ohlin model)

সুইডিশ অর্থনীতিবিদ Eli Heckscher (1879-1952) ও Bertil Ohlin (1899-1979) এর নামেই এই মডেলটি পরিচিতি লাভ করেছে। এই মডেলটি বস্তুতঃ আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের মডেলটিকেই আরও ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারিত করেছে। এই তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমিতি হলো, বিভিন্ন দেশে একই পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন উৎপাদন ব্যয় হতে পারে। উৎপাদন ব্যয়ের এই পার্থক্যই এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় মনোযোগের বিষয়। হেকসার-ওহলিন তাঁদের মডেলে এই পার্থক্যের কারণকে সুনির্দিষ্ট করেছেন। তাঁরা বলেছেন, একটি দেশে যদি জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি থাকে তাহলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রফতানিই এই অর্থনীতির জন্য যুক্তিযুক্ত হবে। কোনো দেশে যদি শ্রমের যোগান বেশি থাকে তাহলে সেখানে শ্রমনির্ভর শিল্পই আপেক্ষিকভাবে সুবিধাজনক ও যথাযথ হবে। আবার কোনো দেশে যদি প্রযুক্তিগত সামর্থ্য থাকে এবং পুঁজির যোগান যথেষ্ট থাকে তাহলে পুঁজি ও উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠানই সেখানে আপেক্ষিকভাবে সুবিধাজনক হবে। অর্থাৎ, একটি দেশ সেসব ক্ষেত্রেই বিশেষায়ণ করবে এবং সেসব পণ্যই রফতানি করবে, যেসব পণ্যের

উৎপাদন উপাদানের প্রাচুর্য সেখানে আছে, আর সেসব পণ্য আমদানি করবে যেগুলোর উৎপাদন উপাদানের ঘাটতি আছে।

হেকসার-ওহলিন মডেলে যেসব অনুমিতি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল:

১. এই মডেলে দু'টি দেশ, দু'টি উৎপাদন উপকরণ ও দুটি পণ্য বিবেচনা করা হয়।
২. দুই দেশেই প্রযুক্তি অভিন্ন।
৩. প্রত্যেকটি পণ্যই অপরিবর্তনীয় উৎপাদন মাত্রায় (constant returns to scale) উৎপাদিত হচ্ছে।
৪. একটি পণ্য শ্রমনির্ভর, অন্যটি পুঁজিনির্ভর।
৫. শুধু একটি পণ্য উৎপাদনে কোনো দেশই পুরোপুরি বিশেষীকরণ করেনি।
৬. সকল পণ্য ও উৎপাদন উপকরণ বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।
৭. সকল উপকরণ দেশের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সচল কিন্তু আন্তঃদেশে তা কোনোভাবেই সচল নয়।
৮. দুই দেশেই রুচি অভিন্ন না হলেও সমরূপ।
৯. দু'দেশেই মুক্ত বাণিজ্য বিরাজমান, অর্থাৎ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বিধিনিষেধ পুরোপুরি অনুপস্থিত।
১০. পরিবহন ব্যয় এই মডেলে শূন্য।

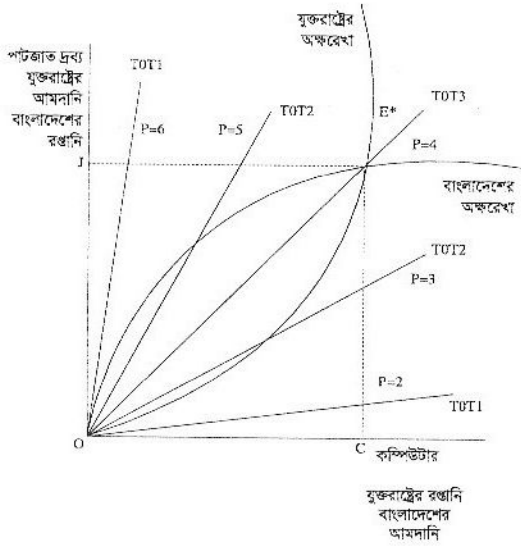
আন্তর্জাতিক ভারসাম্য (international equilibrium)

আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বলতে এ রকম একটি পরিস্থিতি বোঝায় যখন বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী একাধিক দেশের মধ্যে আমদানি রফতানিতে একটি ভারসাম্যাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ভারসাম্য তখনই সৃষ্টি হয় যখন বাণিজ্য শর্ত এরকম একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাতে বাণিজ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এ রকম সময়ে বিশ্বের প্রত্যেকটি এবং সামগ্রিকভাবে সকল বাজারে যোগান যতটা থাকে ঠিক ততটাই চাহিদাও থাকে। এই ভারসাম্যে কীভাবে পৌঁছা যায় এবং এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা বুঝতে অফার রেখা ধারণাটি ব্যবহার করা যায়।

অফার রেখা (offer curves)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য সুসংগঠিতভাবে নির্ধারণ করবার জন্য আলফ্রেড মার্শাল এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছিলেন। অফার রেখা দিয়ে একটি দেশ তার বাণিজ্য শর্তের বিকল্প সম্ভাবনাগুলো দেখায়। একেকটি অফার রেখা আসলে একই সঙ্গে তিনটি বিষয় প্রদর্শন করে, এগুলো হলো: রফতানি, আমদানি এবং বাণিজ্য শর্ত। এই রেখা নিছক চাহিদা রেখা বা যোগান রেখা নয় এটা দুটোই। এড্জওয়ার্থ (Edgeworth)-এর মত অনুযায়ী, বস্তুতঃ একটি অফার রেখা দিয়ে একটি দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা সীমাকেই (production-possibilities frontier) অনুভব করা যায়। এখানে আমরা যখন আমদানি বা রফতানির কথা বলছি তখন পরিমাণগতভাবে কতটা আমদানি বা রফতানি হলো তা নয়, বরঞ্চ একটি দেশ কতটা রফতানি করতে চাইছে কিংবা কতটা আমদানি

করতে চাইছে সেটাই দেখানো হচ্ছে। নিচে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অফার রেখা দিয়ে



আমরা এ দুটো দেশের বাণিজ্য ভারসাম্য বিন্দুর স্থান পাচ্ছি।

চিত্র ১৩.১: বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের অফার রেখা

চিত্রে আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কালনিক বাণিজ্য শর্ত রেখা (TOT) দেখছি। দেখছি বাণিজ্য শর্তের ভারসাম্য তৈরি হচ্ছে যখন $P=4$, এবং বাণিজ্য শর্ত রেখা TOT_3 -তে। এখানে পরস্পরের অফার রেখার মধ্য দিয়ে আমদানি ও রপ্তানি চাহিদা ভারসাম্য অবস্থায় আসছে। OC পরিমাণ কম্পিউটার যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করলে এবং OJ পরিমাণ পটজাত দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করলে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ভারসাম্য বিন্দু E^* তে পৌঁছাবে।

সারসংক্ষেপ

যে কোনো একটি দ্রব্যের সুযোগবর্জন ব্যয় বলতে বোঝানো হয় সেই দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে যে দ্রব্য উৎপাদন করা যায়নি তার থেকে সম্ভাব্য আয়কে। অন্যদিকে, হেকসার-ওহলিন মডেল অনুযায়ী, একটি দেশ সে সব ক্ষেত্রেই বিশেষায়ন করবে এবং সে সব পণ্যই রপ্তানি করবে যে সব পণ্যের উৎপাদন উপাদানের প্রাচুর্য সেখানে আছে আর সে সব পণ্য আমদানি করবে যেগুলোর উৎপাদনে উপাদানের ঘাটতি আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অনুধাবন এবং ব্যাখ্যা করার জন্য অফার রেখার ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। এই রেখা আমদানি, রফতানি বাণিজ্য শর্ত প্রদর্শন করে।

চতুর্দশ অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক ধারণা Introduction to Macroeconomics

অর্থশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র গত কয়েক দশকেই বিকশিত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের অর্থনীতিকে সামগ্রিকভাবে দেখার জন্য সামষ্টিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামো ক্লাসিক্যাল, নয়া ক্লাসিক্যাল, কেইনসীয়তো বটেই এমনকি মার্কসীয় ধারণাকেও আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র প্রধানতঃ নয়া ক্লাসিক্যাল কাঠামোর উপরই নির্ভরশীল। নয়া ক্লাসিক্যাল কাঠামোর সঙ্গে সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণের কাঠামোর মিশ্রণ নিয়েও তাত্ত্বিক অবয়ব দাঁড়িয়েছে। সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা এবং এই অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করবো। এই সঙ্গে থাকছে জাতীয় আয় ও তার পরিমাণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও বাংলাদেশের জাতীয় আয় সম্পর্কিত চিত্র। জাতীয় আয় সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রেও যে বিবর্তন ঘটেছে সে আলোচনাও এখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র কাকে বলে?

ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র যেখানে একক ভোক্তা, একক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, একক পণ্যের দামের উঠানামা, একক উদ্যোক্তার মুনাফা ইত্যাদি অর্থাৎ একক পর্যায়ের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে, সেখানে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র সামগ্রিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে থাকে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ কাঠামোতে সামগ্রিক অর্থনীতি থাকলেও তা অব্যাহত থাকেনি। বিকাশের এক পর্যায়ে নয়া ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ কাঠামোর ব্যাপক প্রভাবে ব্যক্তিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ কাঠামোর মধ্যে সেটিও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

নয়া ক্লাসিক্যাল কাঠামোতে একক ব্যক্তি বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের মতে বস্তুবে এটি সম্ভবও বটে। এই ধারার কোনো কোনো অর্থনীতিবিদদের মতে, জাতীয় অর্থনীতি বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তির অর্থনীতিই অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় এবং ব্যক্তিক অর্থনীতির যোগফল হিসেবে, কখনো কখনো প্রয়োজন পড়লে, সামষ্টিক অর্থনীতিকে দেখা যেতে পারে। ব্যক্তিক অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন এবং কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দেখার পেছনে আরেকটি তাত্ত্বিক প্রশ্নও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেটি হলো, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা

সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী। ক্লাসিক্যাল ও নয়া ক্লাসিক্যাল উভয় ধারাতেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়ার সার্বভৌমত্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাজার প্রক্রিয়ার অদৃশ্য হস্তই অর্থনীতিকে সবচাইতে ভালোভাবে ও দক্ষভাবে পরিচালিত করতে পারে। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল যে, পুঁজিবাদ বা বাজার অর্থনীতি কোনো সংকটে পতিত হলেও বাজার প্রক্রিয়া দিয়েই তার সবচাইতে কার্যকর সমাধান সম্ভব। বলাই বাহুল্য, অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয়তা যদি এভাবে কাজ করে তাহলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একক অর্থনীতি বিশ্লেষণই যথেষ্ট।

১৯২০ এর দশকের শেষ দিকে শুরু হয়ে ১৯৩০ এর দশকে অর্থেরও বেশি সময় জুড়ে অর্থনীতিতে যে গভীর, দীর্ঘস্থায়ী, একটানা ও অনমনীয় সংকট দেখা দেয় তাকে আমরা মহামন্দা (great depression) বলে জানি। এর আগেও মন্দাসহ নানা সংকট পুঁজিবাদী বিশ্বে এসেছে, কিন্তু এর মতো বিপুল ও সর্বব্যাপী চেহারা তার কখনোই ছিলনা। এর মতো দীর্ঘস্থায়ীও তা এর আগে কখনো হয়নি। এই মহামন্দা অর্থশাস্ত্রে কয়েকটি বিষয়ে নতুনভাবে চিন্তা করবার তগিদ সৃষ্টি করলো:

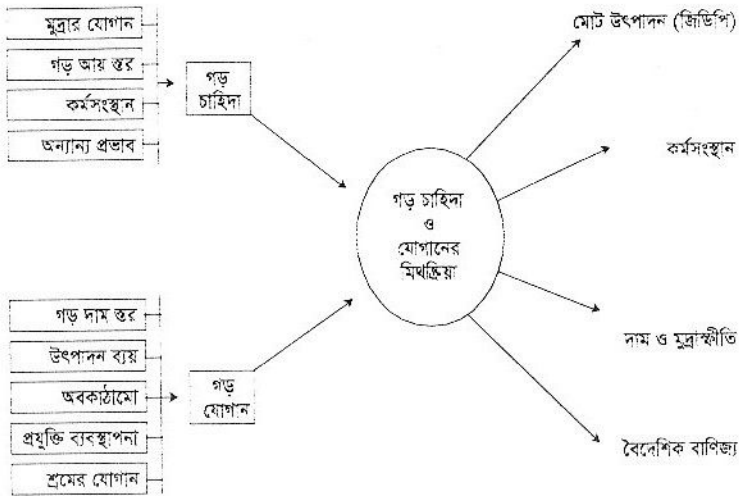
- * ‘নিখুঁত প্রতিযোগিতা’ বাস্তবে কার্যকর নয়।
- * অর্থনীতি একক ভোক্তা বা একক উৎপাদকের নয়। এই একক নানাভাবে অন্য অনেকের সঙ্গে যুক্ত।
- * একক ভোক্তা বা একক উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অর্থনীতির অনেক উপাদান আছে যা ব্যষ্টিক অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে।
- * বাজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার অর্থনীতির সংকট দূর করতে পারে না।
- * রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং জাতীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ব্যষ্টিক পর্যায়ের অর্থনীতির সংকট নিরসন ও বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মাইকেল কালেকি, জোয়ান রবিনসন ও জে. এম. কেইনস অনিখুঁত বাজার এবং অর্থনীতির সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আজকের সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র এঁদের এই তাত্ত্বিক অবদানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বিশেষত সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে যার উপস্থিতি বেশি দেখা যায় কিংবা যার কাঠামো অবলম্বন করে এই অর্থশাস্ত্র সবচাইতে বেশি বিস্তার লাভ করেছে তিনি হচ্ছেন কেইনস। ১৯৩৩ সালে নরওয়েজিয়ান অর্থনীতিবিদ রেগনার ফ্রিচ (Ragnar Frisch) প্রথম অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণের দুটো ভিন্ন এলাকাকে বোঝানোর জন্য “micro-dynamics” ও “macro-dynamics” ধারণা চালু করেন। এগুলোই ক্রমে যথাক্রমে “microeconomics” বা ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র এবং “macroeconomics” বা সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত হয়।

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও তার উপাদান

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উপাদান হিসেবে আমরা যে সব বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখি তার মধ্যে আছে: জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান, দামস্তর, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি রাজস্ব নীতি, মুদ্রানীতি, বাণিজ্য।

চিত্র ১৪.১: সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের কাঠামো



উপরের চিত্রে একটি অর্থনীতিতে কী কী উপাদান গড় চাহিদা ও গড় যোগান গঠন করে এবং সেগুলো মিলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে কী কী উপাদানকে নির্ধারণ করে তার একটি পরিচয় যাওয়া যাচ্ছে।

ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্রে যেখানে একক (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) চাহিদা, যোগান, আয়, কর্মসংস্থান, পণ্যের দাম ইত্যাদি বিশ্লেষণই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, সেখানে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় গড় ও সামষ্টিক ক্ষেত্রে চাহিদা, যোগান, আয়, কর্মসংস্থান, দামস্তর ইত্যাদির উপর। এছাড়া বিশ্লেষণ কাঠামোর কারণেই ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্রে সরকারের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না, অন্যদিকে যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব, তার কারণেই সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে সরকারের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। নিচের ছকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ছক ১: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের পার্থক্য

ব্যষ্টিক অর্থশাস্ত্র

একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা যোগান
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্থান
একক পণ্যের দাম ও তার পরিবর্তন
একক ব্যক্তির ভোগ
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ
সরকারের ভূমিকার খুব গুরুত্ব নেই

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র

অর্থনীতির সামষ্টিক চাহিদা ও যোগান
সমগ্র অর্থনীতির আয় বা জাতীয় আয়
সমগ্র অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান
সমগ্র অর্থনীতির দামস্তর
সমগ্র অর্থনীতির ভোগ
সমগ্র অর্থনীতিতে বিনিয়োগ
সরকারের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ

সাম্প্রতিক অর্থশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো জাতীয় আয়। পরের অংশে আমরা জাতীয় আয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক অর্থশাস্ত্রের বিশ্লেষণ কাঠামো সম্পর্কেও ধারণা পাবো।

সারসংক্ষেপ

ক্লাসিকাল ও নয়া ক্লাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বাজার প্রক্রিয়ার সার্বভৌমত্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩০ এর দশকের মহামন্দা অর্থশাস্ত্রে নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন সৃষ্টি করেছিল যার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। জাতীয় আয়, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থান, দামস্তর, সরকারি রাজস্ব নীতি ইত্যাদি সাম্প্রতিক অর্থশাস্ত্রের উপাদান।

জাতীয় আয় কী?

একটি রাষ্ট্রে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার জন্য সামগ্রিক উৎপাদন ও আয়কে দেখার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় আয় ধারণার ব্যবহার এভাবেই অর্থশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। জাতীয় আয়কে বিভিন্নভাবে দেখাও হয়ে থাকে।

জাতীয় আয় আলোচনায় যে ধারণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হলো: মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross Domestic Product, GDP), মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product, GNP), নিট জাতীয় উৎপাদন (Net national product, NNP)।

মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (যা সাধারণভাবে জিডিপি হিসেবে অভিহিত হয়) একটি দেশের মোট উৎপাদন ও কাজ বোঝার জন্য সবচাইতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। জিডিপি বলতে একটি নির্দিষ্ট অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ে সকল দ্রব্য ও সেবার মোটমূল্য বোঝায়। এটি পরিমাপের জন্য তিনটি পদ্ধতি আছে: চূড়ান্ত দ্রব্য পদ্ধতি, মূল্য সংযোজন পদ্ধতি এবং আয় পদ্ধতি।

নিট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Net domestic product): নিট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা এনডিপি পরিমাপের কার্যকর পথ হচ্ছে জিডিপি থেকে অবচয় বাদ দেয়া। এনডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য যার অন্তর্ভুক্ত থাকে নিট বিনিয়োগ অর্থাৎ অবচয় বাদ দিয়ে মোট বিনিয়োগ।

মোট জাতীয় উৎপাদন বা GNP বলতে শুধুমাত্র একটি দেশের নাগরিকদের উৎপাদিত দ্রব্য ও কাজের মোট মূল্যকে বোঝায়। সেই হিসেবে জিএনপি-তে কোনো দেশে বিদেশীদের আয় ধরা হয় না, কিন্তু সে দেশের নাগরিকদের বিদেশ থেকে প্রেরিত আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটি দেশের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি বোঝার জন্য জিডিপি-র চাইতে জিএনপি অধিকতর কার্যকর পদ্ধতি হলেও জিএনপি-র তথ্য তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপের দুই পদ্ধতি

জাতীয় আয় সাধারণত দুইভাবে পরিমাপ করা হয়। একটি হলো: দ্রব্য প্রবাহ হিসাব (Flow-of-product of Final goods approach), আরেকটি হলো আয় বা ব্যয় প্রবাহ হিসাব (Earnings or cost approach)। দুই হিসাবের ফলাফলে পার্থক্য হবার কথা নয়। এছাড়া মূল্য সংযোজন পদ্ধতিতেও জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়।

চূড়ান্ত দ্রব্য প্রবাহ হিসাব (Flow-of-product or Final good approach)

প্রতি বছর একটি অর্থনীতিতে বিপুলসংখ্যক দ্রব্য (goods) এবং সেবা (service) একটি দেশের নাগরিকেরা ভোগ করেন। এর মধ্যে চাল, ডাল, সবজি, গম, দুধ থেকে পাট, তুলা, মেশিন, কাপড়, টিভি থেকে শিক্ষা, বিভিন্ন আইনগত পরামর্শ পর্যন্ত আছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, এই তালিকায় দুই ধরনের দ্রব্য আছে। এক ধরনের দ্রব্য আছে যেগুলো উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় (পাট, তুলা, মেশিন), আর কিছু দ্রব্য আছে যেগুলো ভোক্তারা চূড়ান্ত দ্রব্য (চাল, ডাল, সবজি, দুধ, কাপড়, টিভি) হিসেবে ভোগ করেন। আর সেবা (service) যেগুলো বিভিন্ন আয়ের জনগোষ্ঠী ভোগ করেন তার মধ্যে চুল কাটা, রিকশাসহ পরিবহন, দোকান, চলচ্চিত্র ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। দ্রব্য প্রবাহ হিসাবে সেবা ছাড়া দ্রব্যগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত দ্রব্যগুলোই ব্যবহার করা হয়। সে হিসেবে চূড়ান্ত দ্রব্যগুলোর সঙ্গে তার বাজার দাম গুণ করেই হিসাব দাঁড় করানো হয়।

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

এখানে Y = জিডিপি, C = মোট ভোগ, I = মোট বিনিয়োগ, G = মোট সরকারী দ্রব্য ও সেবা ক্রয়, $(X - M)$ = নিট রফতানি।

আয় বা ব্যয় প্রবাহ হিসাব (Earnings or cost approach)

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয় ও ব্যয়কে হিসাব করে জিডিপি দাঁড় করানো হয়। এতে আরেকদিক থেকে বিভিন্ন উৎপাদন উপাদানের আয়কে যোগ করা হয়। এগুলো হল: নীচের সমীকরণ অনুযায়ী যথাক্রমে খাজনা (r), মজুরি (w), সুদ (i) ও মুনাফা।

$$Y = \Sigma r + \Sigma w + \Sigma i + \Sigma \pi$$

নিচে দুই পদ্ধতির একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থিত করা হলো।

ছক ১:

দুই পদ্ধতির তুলনা

দ্রব্য প্রবাহ পদ্ধতি

জিডিপির উপাদান

• দ্রব্য ও সেবা ভোগ (C)

+ মোট বেসরকারি আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (I)

+ সরকারী ব্যয় ও বিনিয়োগ (G)

+ নিট রফতানি (X)

= মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন

আয় বা ব্যয় প্রবাহ পদ্ধতি

জিডিপির অন্তর্ভুক্ত আয় বা ব্যয়ের ক্ষেত্র

মজুরি, বেতন ও অন্যান্য আয়

+ সুদ, খাজনা এবং অন্যান্য সম্পত্তি আয়

+ পরোক্ষ কর ও অবচয় + মুনাফা

= মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন

মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (value added approach)

এটি একটি প্রতিষ্ঠানের আয় এবং ব্যয়ের পার্থক্যটি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ স্তরে যে মূল্য সংযোজন হল সেটিই কেবলমাত্র হিসাবে ধরা হয়। এর ফলে প্রতিটি স্তরে মূল্য যা সংযোজন হয় তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সরকারী ব্যয় (government expenditure)

সরকারি ব্যয় জিডিপি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখানে বলা দরকার যে, সরকারী ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জিডিপিতে ধরা হয় না। তাকে বলে 'স্থানান্তরিত ব্যয়' (Transfer payment)। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সরকারের এমন ধরনের ব্যয় যা সরকার নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করে বা তাদের জন্য করে থাকে কোনো দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ে নয়, বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় নীতি ও দায়িত্বের অংশ হিসেবে। এর মধ্যে আছে: বেকার ভাতা, বার্ষিক ভাতা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়

নিচের ছকে ১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জিডিপি একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে। এ থেকে পরিবর্তনের ধারণাটিও চিহ্নিত করা যায়।

ছক ২: চলতি দামে বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি (কোটি টাকায়)

খাত	১৯৭২-৭৩	%	১৯৭৯-৮০	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৮-৯৯	%
মোট	৪৯৮৫	১০০	১৯৬০৫	৮৩৪৩৯	১৩০১১৮	১৭৪৯২৬	(১০০)
১. কৃষি	২৪৭১	৪৯.৫৭	৮০৮২	৩০০৫৯	৩৯৯৮৭	৫২৩৯৬	২৯.৯৫
শস্য	১৯৪৯	৩৯.০৯	৬৩১৩	২১৭৮২	২৪৬৫৫	৩০২৮৮	১৭.৩১
বনজ সম্পদ	১১৪	২.২৯	৪৪৬	২৮৬৪	৪৩০৬	৫৬৮৭	৩.২৫
পশু সম্পদ	১৬৩	৩.২৭	৭২৬	২৬৫৬	৪৬৮৬	৬৭৬১	৩.৮৬
মৎস্য সম্পদ	২৪৫	৪.৯১	৫৯৭	২৭৫৭	৬৩৪০	৯৬৫৯	৫.৫২
২. খনি	১	-	১১	২৬	৬১		০.০৩
৩. শিল্পসমূহ	৩৯৪	৭.৯০	২২০১	৭২৮০	১২৪৫৫	১৫৬৪০	৮.৯৪
বৃহদায়তন	১২০	২.৪০	১১৭৯	৪২২৬	৮১৬৭	১০৩১৪	৫.৮৯
ক্ষুদ্রায়তন	২৭৪	৫.৫০	১০২২	৩০৫৪	৪২৮৮	৫৩২৬	৩.০৪
৪. নির্মাণ	২১৯	৪.৩৯	৯৩১	৪৭২৬	৭৫২৩	১০৪৮০	৫.৯৯
৫. বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও সেনিটারি সেবাসমূহ	১৩	০.২৬	৬১	১১২০	২৭০৬	৩৪২৪	১.৯৫
৬. পরিবহন, মজুদ ও যোগাযোগ	৫২৫	১০.৫৩	২২৬৫	৯৭৭০	১৪৬০০	১৮৫২৩	১০.৫৮
৭. বাণিজ্য সেবাসমূহ	৩৯৭	৯.৯৬	১৯১৬	৬৮২৮	১১৬৯০	১৫৬১২	৮.৯২
৮. গৃহায়ন সেবাসমূহ	৪৬৯	৯.৪১	৭৫৩	৭৩৮৭	১২৩৮৮	১৬৫১৮	৯.৪৪
৯. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১১৩	২.২৬	৫৫০	৩৮১৯	৭১৩৩	১০৩১৩	৫.৮৯
১০. ব্যাংক ও বীমা	৫৪	১.০৮	৩১০	১৬৩০	২৪৬৫	৩২৮৩	১.৮৭
১১. পেশাগত ও বিবিধ সেবাসমূহ	৩৩০	৬.৬২	১৫৩৫	১০৮০৯	১৯১৪৪	২৯০৩৬	১৬.৫৯

পরবর্তী জিডিপি হিসেবে খাতওয়ারী বিবরণে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। মোট খাত এখন ১১টির পরিবর্তে ১৫টি ধরা হয়। নতুন স্বতন্ত্র চারটি হলো মৎস্য, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং হোটেল-রেস্তোরা। নিচের ছকে কয়েকটি সামষ্টিক উপাদান বাংলাদেশে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কী অবস্থায় আছে তার একটি চিত্র দেওয়া হলো।

ছক ৩: বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির চিত্র	১৯৯৮	২০০৮
চলতি দামে জিডিপি	২,৪১,২৭৪ কোটি	৫,৪১,১১৯ কোটি
জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার	৫.৬	৬.২১
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হার)		
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৭.৭৮	২০.১
জাতীয় সঞ্চয়	২২.৬০	২৯.২
মোট বিনিয়োগ	১৭.৩	২৪.২
মুদ্রার সরবরাহ	৫২৯৫১ কোটি	২৪৮৭৯০ কোটি
মুদ্রাস্ফীতি	৮%	১১%
মার্কিন ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার	৪৮.৫	৬৯
বাণিজ্য শর্ত	৯৮.১	৮১.৬

বিসিএস ২০০০ ও ২০০৮

সারসংক্ষেপ

জাতীয় আয়ের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রে সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার জন্য সামগ্রিক উৎপাদন ও আয়কে দেখার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় দ্রব্য পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সাধারণতঃ দুইভাবে মোট জাতীয় উৎপাদন করা যায়। একটি দ্রব্য প্রবাহ হিসাব অন্যটি আয় বা ব্যয়প্রবাহ হিসাব।

দ্বৈত হিসাবের সমস্যা (problem of 'double counting')

জিডিপি'র হিসাবে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য অর্থাৎ যেগুলো শুধুমাত্র ভোক্তার ভোগের জন্যই ব্যয় হয়, সেগুলোই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন কোনো মধ্যবর্তী দ্রব্য (intermediate goods) চূড়ান্ত দ্রব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন গম বা সুতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দ্রব্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সে জন্য এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্যই, অর্থাৎ গম নয়, আটা বা রুটি এবং তুলা নয়, কাপড় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আয় বা ব্যয় প্রবাহের হিসাবেও দ্বৈত হিসাবের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের কাপড় বিক্রির আয় হিসাব করা হল। কিন্তু কাপড়ের দামের মধ্যে সুতার দাম অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সুতা থেকে আয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বৈত হিসাবের সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবার জন্যই ব্যবহার করা হয় 'মূল্য সংযোজন পদ্ধতি' (value added approach)।

প্রকৃত ও দৃশ্যমান জিডিপি (Real & Nominal GDP)

আমরা জিডিপি পরিমাপ করতে বাজার দামস্তর ব্যবহার করি, কিন্তু দামস্তর কোনো অপরিবর্তনীয় বা স্থির ব্যাপার নয়। বাজার অর্থনীতিতে দামস্তর অব্যাহতভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। দামস্তর এভাবে পরিবর্তিত হলে জিডিপি'র মূল উপাদানের জন্য নয়, বরঞ্চ দামস্তরের জন্য জিডিপি'র মূল্য বদলে যায়। তার জন্য দৃশ্যমান জিডিপি প্রকৃত জিডিপিকে প্রতিফলিত করে না। সে কারণে দরকার হয় দৃশ্যমান জিডিপি থেকে প্রকৃত জিডিপি বের করার।

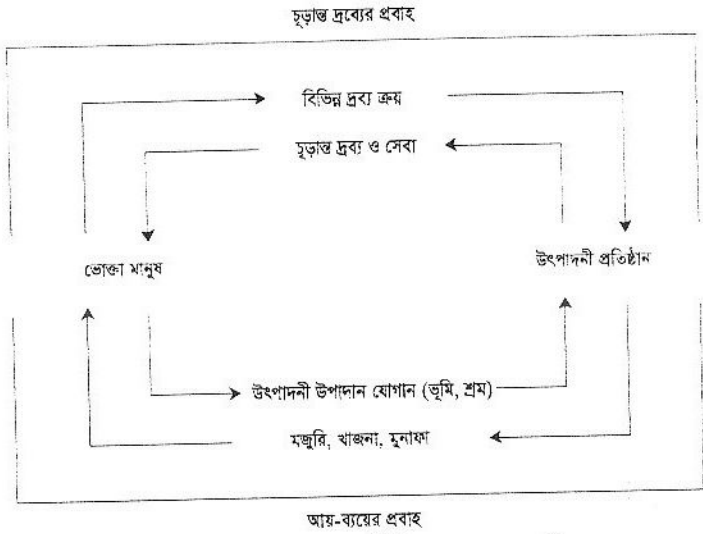
প্রকৃত জিডিপি আসলে একটি আপেক্ষিক ধারণা। আপেক্ষিক এই অর্থে যে দৃশ্যমান জিডিপি যেখানে পরিবর্তনশীল দামস্তর দিয়েই প্রকাশ করা হয়, সেখানে প্রকৃত জিডিপি প্রকাশ করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিশ্রেফিকিতে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের দামস্তরকে স্থির ধরে তার ভিত্তিতে অন্যান্য সময়ের জিডিপি পরিমাপ করা হয়। এতে করে বিভিন্ন সময়ের জিডিপি'র তুলনামূলক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়।

প্রকৃত জিডিপি বের করার জন্য যে অনুপাতটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় সেটি হলো জিডিপি ডিফ্লেক্টর (GDP deflator)। দৃশ্যমান জিডিপিকে প্রকৃত জিডিপি দিয়ে ভাগ করলে জিডিপি ডিফ্লেক্টর পাওয়া যায়। আবার অন্যদিক থেকে দৃশ্যমান জিডিপিকে জিডিপি ডিফ্লেক্টর দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই প্রকৃত জিডিপি। জিডিপি

ডিফ্লেক্টরকে অনেক সময় জিডিপি'র দাম হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

$$\text{প্রকৃত জিডিপি} = \frac{\text{দৃশ্যমান জিডিপি}}{\text{জিডিপি ডিফ্লেক্টর}} = \frac{PQ}{P}$$

দামের পরিবর্তনের প্রভাব থেকে জিডিপিকে আলাদা করে স্থির ব্যয়ে তা হিসাব করলে জিডিপি'র প্রকৃত পরিবর্তন বোঝা যায়।



চিত্র ১৪.২: সামষ্টিক অর্থনীতির তৎপরতার চিত্র

জিডিপি হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদি

এই চিন্তা এখন অর্থশাস্ত্রে অধিক থেকে অধিকতর হারে আসছে যে, প্রচলিত জিডিপি হিসাব পদ্ধতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তৎপরতাকে হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে না। আবার অনেক খরচ আছে যেগুলো জিডিপি হিসাবের সময় বিবেচনা করা হয় না। যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মুনাফা, মুদ্রা সরবরাহকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কিন্তু জিডিপিতে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয় না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘কালো অর্থনীতি’ বলে পরিচিত গোপন, অপরাধমূলক বেআইনী অর্থনীতি। জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জিডিপি'র শতকরা প্রায় ৩০ ভাগের বেশি এই অর্থনীতির মধ্যে পড়ে। চোরচালানী, কালোবাজারী, বেআইনী কমিশন, ঘুষ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। ১৯৮৫ সালে লিভারপুল ইউনিভার্সিটির গবেষণা দল যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে এই হিসাব করেছে জিডিপি'র শতকরা ১৪.৫ ভাগ। ইটালীতে এক হিসাবে কালো অর্থনীতি ধরা হয়েছে জিডিপি'র শতকরা ৩০ ভাগ। ১৯৮৭ সালে

ইটালীয় পরিসংখ্যানবিদেরা তাদের দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় শতকরা ১৮ ভাগ অতিরিক্ত যোগ করা শুরু করেন।^{২৭}

আবার পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে অনেক কাজ বা শ্রম বা সেবা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু যেগুলো অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কৃষি এবং গৃহে ব্যয় সাশ্রয়ী নারী শ্রম কিংবা কৃষি, সজ্জিচাষ, মাছধরাসহ মজুরিবিহীন কাজ বাজার বহির্ভূত শ্রম হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

ক্রয়ক্ষমতার সাম্য ভিত্তিক জিডিপি (purchasing power parity, PPP, based GDP)

একটি দেশের জিডিপি পরিমাপে সে দেশের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা চলতি দামস্তর অনুযায়ী হিসাব করা হয়। আবার জিডিপির প্রকৃত গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য জিডিপি ডিফ্লেক্টর ব্যবহার করা হয়। একটি নির্দিষ্ট বছরের দামস্তরকে স্থির ধরে তার সাপেক্ষে বিভিন্ন বছরের জিডিপি হিসাব করা হয়। কিন্তু যখন আমরা বিভিন্ন দেশের জিডিপির মধ্যে একটি তুলনামূলক অবস্থা পর্যালোচনা করতে চাই, তখন এসব পদ্ধতি যথেষ্ট হয় না। কেননা, একেবারেই দেশ একেক মুদ্রা ব্যবহার করছে এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তর বিভিন্ন রকম। তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই পণ্যসামগ্রী কিনতে যে ডলার প্রয়োজন বাংলাদেশে তার চাইতে অনেক কম ডলার দিয়ে সেই পণ্যসামগ্রী কেনা সম্ভব। এই কারণে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করবার জন্য বর্তমানে ক্রয়ক্ষমতার সাম্য (purchasing power parity, PPP) ধারণা ব্যবহার করা হয় এবং তার ভিত্তিতে জিডিপিও দেখানো হয়। এতে বিভিন্ন দেশের পণ্য ও সেবাসমূহ তাদের নিজ নিজ বাজার বিনিময় হার-এর মধ্যে সীমিত না রেখে সেগুলোকে অভিন্ন হিসাবের আওতায় আনা হয়। এতে যে সব দেশ বাজার সম্পর্ক ছাড়াও অনেক অর্থনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চলছে, সে সব দেশের আয়ে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। এর সবচাইতে পরিষ্কার উদাহরণ হলো চীন। চীনের প্রচলিত হিসেবে জাতীয় আয় দেখলে এটি হলো তথাকথিত দরিদ্র বা অনুন্নত দেশ। কিন্তু পিপিপি দিয়ে চীনের জিডিপি হিসাব করলে দেখা যায় এটি বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানের দেশ, কোন কোন বছর দ্বিতীয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বোঝার জন্য এই পদ্ধতি এখন খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। নিজের মুদ্রা দিয়ে একটি দেশের জিডিপি ও ক্রয়ক্ষমতার আন্তর্জাতিক তুলনার পিপিপি দিয়ে জাতীয় আয় পরিমাপে অনেক তফাৎ হয়।

২৭. Philip Hardwick, Bahadur Khan and John Long Mead: *An Introduction to modern Economics*, ELBS, London, 1994

সারসংক্ষেপ

দৃশ্যমান ও প্রকৃত জিডিপি এক নয়। পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে অনেক কাজ বা শ্রম বা সেবা জিডিপিতে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয় না, অথচ এগুলো অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করবার জন্য বর্তমানে 'ক্রয়ক্ষমতার সাম্য' ধারণা ব্যবহার করা হয় এবং তার ভিত্তিতে জিডিপিও দেখানো হয়।

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধারা ও বিতর্ক Major Strands and Debates in Macroeconomics

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই একক বা সর্বসম্মত মতবাদ বা তত্ত্বের সমষ্টি নয়। এখানে অনেক বিতর্ক আছে, মতভেদ আছে। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র আজকের পর্যায়ে এসেছে। ক্লাসিকাল ও নিওক্লাসিকাল অর্থশাস্ত্রের কাঠামো সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে কেইনসীয় একটি ভিন্ন ধারা তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিতর্ক শেষ হয়নি। মুদানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি, যোগান নির্ভর অর্থশাস্ত্র নতুনভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে গত দু'দশকে। আমরা এর মধ্যেই দেখেছি নয়া ক্লাসিকাল ও কেইনসীয় সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা আরেকটি ধারা: 'নব্য ক্লাসিকাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র'। এত্বের শেষ পর্যায়ে আমরা সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন তাত্ত্বিক অবস্থান ও বিতর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করছি।

ক্লাসিক্যাল ও কেইনসীয় বিতর্ক

ক্লাসিক্যাল অবস্থান

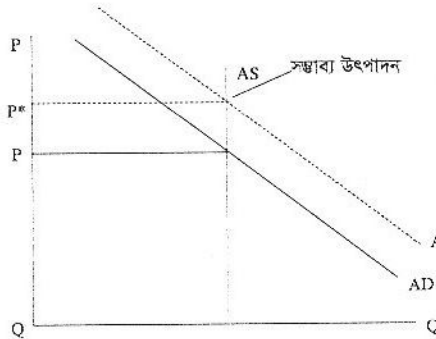
ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রে সামষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার গোড়াপত্তন অ্যাডাম স্মিথ, জে.বি.সে এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁদের চিন্তা অনুযায়ী বাজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেহেতু সবকিছুর সমাধান করতে পারে, সুতরাং অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য বিরাজ করে। তাঁদের মতেলে দাম ও মজুরি হলো নমনীয়। কোনো কারণে ভারসাম্য বিনষ্ট হলেও বাজার প্রক্রিয়ায় তাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের চিন্তা অনুযায়ী, বাজার (পুঁজিবাদী) অর্থনীতিতে এই কারণেই কখনো অতিউৎপাদন হওয়া সম্ভব নয়। এই ধারণা বা বিশ্বাস রিকার্ডো, মিল এমনকি মার্শাল পর্যন্ত একইভাবে বিস্তৃত ছিল। এই বিশ্বাসটি জে.বি.সে-র একটি বিখ্যাত উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রচারিত আছে। উক্তিটি হলো: 'যোগান নিজেই তার চাহিদা তৈরি করে'। এর অর্থ হলো যা কিছু উৎপাদন হোক, বাজার প্রক্রিয়াতেই তার চাহিদা তৈরি হয়ে ভারসাম্য তৈরি হবে।

এই বিশ্বাস এতই প্রবল ছিল যে, এমনকি ৩০-এর দশকে যখন মহামন্দা চলছে এবং যখন মার্কিন শ্রমশক্তির চারভাগের একভাগ পুরোপুরি কর্মহীন তখনও বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ.সি.পিগু (A.C.Pigou) বলছেন, "নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

সব সময়ই পূর্ণ কর্মসংস্থানের ঝোঁক প্রবল থাকে। মজুরি ও দামের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়কে সাময়িকভাবে বাখানকারী ঘটনা থেকেই মাঝে মাঝে বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।”

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের ধারণা অনুযায়ী, সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তনে দামস্তরের উপর যে প্রভাব পড়ে, তা খুবই সাময়িক। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর তার কোন স্থায়ী প্রভাব নেই। দাম ও মজুরির যে নমনীয়তা তাতে পূর্ণ কর্মসংস্থানে ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত হয়ে যাবে। সে কারণে, এই মত অনুযায়ী সামগ্রিক চাহিদা সংক্রান্ত নীতি দিয়ে উৎপাদন বা কর্মসংস্থানের মাত্রাকে প্রভাবিত করা যাবে না। নিচের চিত্রে দেখলে আমরা দেখবো যে, এই মডেলে সামগ্রিক যোগান রেখা খাড়া বা পূর্ণ অনমনীয়। দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে সামগ্রিক চাহিদা রেখা স্থানান্তর করে তাই উৎপাদনের উপর কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করা যায় না। অর্থাৎ পূর্ণ কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে, কিন্তু তা থেকে দীর্ঘমেয়াদি কোনো মন্দা বা সংকটের সম্ভাবনা নেই। ব্যষ্টিক পর্যায়ে সম্পদের অপচয় বা অদক্ষ ব্যবহার সম্ভব, কিন্তু একটানাভাবে এই ঘটনা সামষ্টিক পর্যায়ে সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রেও সজীব রয়েছে। তবে বর্তমানে অপরিপাক তথ্য প্রবাহকে অনেকেই হিসাবের মধ্যে নিচ্ছেন।



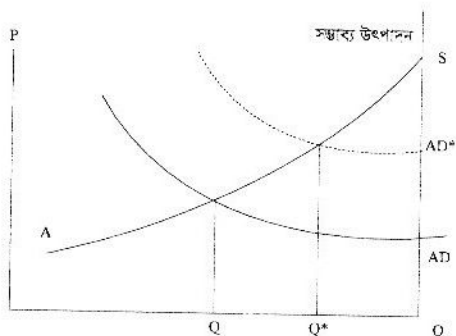
চিত্র ১৫.১: ক্লাসিক্যাল অবস্থান

কেইনসীয় অবস্থান

৩০ দশকের মহামন্দা পর্যন্ত উপরোক্ত বিশ্বাস সংবলিত তাত্ত্বিক কাঠামোই অর্থশাস্ত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা ৩০ দশকে একটানা 'যে রকম বেকারত্ব, অপচয় এবং সামগ্রিক সংকট উপস্থিত করে, তাতে এই অধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সময় এই অবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও পুরনো তাত্ত্বিক কাঠামোর সমালোচনা নিয়ে অনেকেই কাজ করেছেন। এদের মধ্যে আছেন মাইকেল কালেকি, জোয়ান রবিনসন এবং জে.এম. কেইনস। কেইনস-এর কাজ বিভিন্ন কারণে সবচাইতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামো ক্লাসিক্যাল ও নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের মৌলিক কিছু সূত্রান, বিশ্বাসকে শক্তিশালীভাবে অস্বীকার করে। এর প্রভাব সে সময়ে এবং দীর্ঘসময়ের জন্য এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে তাকে 'কেইনসীয় বিপ্লব' (The

Keynesian Revolution) বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর দুটো বৈশিষ্ট্য প্রধান। প্রথমত সামগ্রিক চাহিদা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। এবং দ্বিতীয়ত তাঁর মতে সামগ্রিক যোগানও ভিন্ন। এখানে দাম ও মজুরি অনমনীয় এবং যোগান রেখা নমনীয়, ডানদিকে উর্ধ্বমুখী।



চিত্র ১৫.২: কেইনসীয় অবস্থান

গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, বাস্তব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি এবং সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল ও কেইনসীয় অবস্থানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ আছে। কেইনসীয় কাঠামোতে বলা হচ্ছে:

প্রথমত: বাজার অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের নিচেই ভারসাম্য দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, অর্থনীতির ক্ষমতা অব্যবহৃত আছে এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেকারত্ব আছে এরকম অবস্থা দীর্ঘসময় টিকে থাকতে পারে এবং ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে যেহেতু দাম ও মজুরি অনমনীয় সুতরাং অর্থনীতিতে এরকম কোনো স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া সম্ভব নয় যাতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থায় যেতে বা অর্থনীতি সক্রিয় হয়ে ওঠা শুধু বাজার প্রক্রিয়াতেই সম্ভব হয়। সেজন্য, দ্বিতীয়ত: মুদ্রা এবং রাজস্ব নীতির মাধ্যমে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে অর্থনীতিকে সক্রিয় করে তুলতে। রেখার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি, সরকারের ভূমিকা বা ব্যয় বৃদ্ধি যখন সামগ্রিক চাহিদা বাড়ছে তখন তা সামগ্রিক উৎপাদনও বাড়ছে।

সারসংক্ষেপ

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তনে দামস্তরের উপর যে প্রভাব পড়ে, তা খুবই সাময়িক। দাম ও মজুরির যে পরিবর্তনযোগ্যতা তাতে কর্মসংস্থানে ভারসাম্য পুনঃস্থাপিত হয়ে যাবে। এই কারণে অর্থনীতিতে কখনও অতি উৎপাদন সম্ভব নয়। কেইনসীয় মতে, দাম ও মজুরি পরিবর্তন বিমুখ এবং যোগান রেখা পরিবর্তনযোগ্য, ডানদিকে উর্ধ্বগামী। সেই কারণে অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার পূর্ণ কর্মসংস্থানে ভারসাম্যে যেতে পারে না।

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি

মুদ্রার গতিবেগ ও মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হলো, স্বল্পমেয়াদে দৃশ্যমান জিডিপি এবং দীর্ঘমেয়াদে দামের গতিপ্রকৃতির উপর মুদ্রা যোগানের প্রভাব থাকে। কেইনসীয় ব্যাখ্যাতেও এই প্রভাব স্বীকার করা হয়। তবে কেইনসীয়রা যেখানে অন্যান্য উপাদানকেও গুরুত্ব দেয়, সেখানে মুদ্রানির্ভর ব্যাখ্যায় মুদ্রার যোগানকেই মুখ্য বলে ধরা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গেলে মুদ্রার গতিবেগ (The Velocity of Money) ও মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব (The Quantity theory of Money) আলোচনায় আনা দরকার।

মুদ্রার গতিবেগ বলতে বোঝায় দৃশ্যমান জিডিপি ও মুদ্রার যোগানের অনুপাত। অর্থাৎ একটি দেশের মোট আয়ের সঙ্গে মুদ্রার সম্পর্কই এর মাধ্যমে বোঝানো হয়। সমীকরণে এভাবে দেখানো যায়:

$$V = \frac{GDP}{M} = \frac{P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots}{M} = \frac{PQ}{M}$$

এখানে P হচ্ছে গড় দামস্তর, Q হচ্ছে প্রকৃত GDP আর V হচ্ছে দৃশ্যমান জিডিপি ও মুদ্রা প্রবাহের অনুপাত।

মুদ্রার পরিমাণতত্ত্বের সমীকরণ আমরা উপরের সমীকরণ থেকেই পেতে পারি। এটি হলো নিম্নরূপ:

$$P = \frac{MV}{Q} = \left(\frac{V}{Q}\right) M = kM$$

এখানে $k = V/Q$ । এই কাঠামোতে পূর্ণ কর্মসংস্থান অনুমান করা হয়।

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির (Monetarist Approach) মূলকথা

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিক রূপ বিকাশ লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিল্টন ফ্রিডম্যান-এর নেতৃত্বে। তাঁরা কেইনসীয়দের বিরুদ্ধে এই অবস্থানই স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেন যে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য মুদ্রানীতিই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, মুদ্রার গতিবেগ স্থিতিশীল (চরম মতামত অনুযায়ী, প্রবক) এবং তার ফলে জাতীয় উৎপাদন সরাসরি মুদ্রা সরবরাহ দ্বারা আনুপাতিকভাবে প্রভাবিত হয়। এই

দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত অব্যর্থ অর্থনীতি ও ক্ষুদ্র সরকারের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত।

মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও বিভিন্ন ধারা-উপধারা আছে। তবে এর মধ্য থেকে অভিন্ন যে মূলবক্তব্যগুলি চিহ্নিত করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

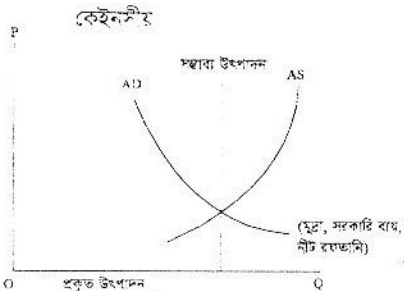
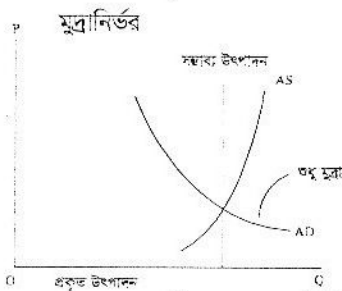
১. মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি দৃশ্যমান জিডিপি প্রধান নির্ধারক।
২. মুদ্রার চাহিদা সুদের হার দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না।
৩. দাম ও মজুরি আপেক্ষিকভাবে নমনীয়।
৪. স্বল্পমেয়াদে মুদ্রা ও উৎপাদন দুটোকেই প্রভাবিত করে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যেহেতু অর্থনীতি প্রায় পূর্ণ কর্মসংস্থানে থাকে, সেহেতু মুদ্রার মূল প্রভাব পড়ে দামস্তরের উপর। স্বল্পমেয়াদ ও দীর্ঘমেয়াদ উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও দামের উপর রাজস্বনীতির প্রভাব অনুপেক্ষ।
৫. বেসরকারি খাত স্থিতিশীল।

কেইনসীয় ও মুদ্রানির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির মূল তফাৎ

প্রথমত: সামগ্রিক চাহিদার উপর কী কী উপাদান মূল প্রভাব বিস্তার করে, সে প্রশ্নে দুই মতবাদীদের তফাৎ মৌলিক। মুদ্রাপন্থীদের মতে সামগ্রিক চাহিদা পূর্ণত বা প্রধানত মুদ্রা সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁদের মতে, মুদ্রাগত পরিবর্তন ছাড়া শুধুমাত্র রাজস্বনীতির পরিবর্তন উৎপাদন ও দামের উপর উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মুদ্রাপন্থীদের সামগ্রিক চাহিদা রেখা যেহেতু, $PQ = \text{ধ্রুবক}$, সেহেতু রেখাটি rectangular hyperbola হয়।

অন্যদিকে কেইনসীয় অর্থনীতিবিদদের মতে, উৎপাদন, দাম ও সামগ্রিক চাহিদার উপর মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য উপাদানও এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ তাঁদের মতে, উৎপাদন নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজস্বনীতি ও নিট রফতানির মতো উপাদানগুলো এর পাশাপাশি খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত: সামগ্রিক যোগান নিয়েও দুই মতবাদীদের তফাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেইনসীয় মডেলে দাম ও মজুরির জড়তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সে কারণে কেইনসীয় যোগান রেখার চাইতে মুদ্রাপন্থীদের যোগান রেখা অনেক খাড়া হয়। যেহেতু



চিত্র ১৫.৩: মুদ্রানির্ভর ও কেইনসীয় দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা

তাদের মতে দাম ও মজুরি পরিবর্তনমুখী, সুতরাং সম্ভাব্য উৎপাদন রেখার খুব কাছাকাছি গড় যোগান রেখা অবস্থান করে।

সারসংক্ষেপ

মুদ্রাপন্থীদের মতে সামগ্রিক চাহিদা প্রধানত মুদ্রা সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে কেইনসীয় অর্থনীতিবিদের মতে, উৎপাদন, দাম ও সামগ্রিক চাহিদার উপর মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য উপাদানও এখানে ভূমিকা পালন করে। তাঁদের মতে, রাজস্ব নীতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নব্য ক্লাসিক্যাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্র (New Classical Macroeconomics)

সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রে এই মতবাদ তুলনামূলকভাবে নতুন। এটি উদ্ভূত হয় মূলতঃ ১৯৮০ দশকে। এর উদ্ভবের সঙ্গে যেসব অর্থনীতিবিদদের নাম জড়িত তাঁরা হলেন: শিকাগোর রবার্ট লুকাস (Robert Lucas), স্ট্যানফোর্ড-এর টমাস সার্জেন্ট (Thomas Sargent), এবং হার্ভার্ড-এর রবার্ট ব্যারো (Robert Barro)।

নব্য ক্লাসিক্যাল সামষ্টিক অর্থশাস্ত্রের তাত্ত্বিক কাঠামো যে দু'টি অনুমিতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি হলো:

১. দাম এবং মজুরি নমনীয় (flexible)। এবং
২. জনগণ সকল প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করেন।

প্রথম অনুমিতিটি আমরা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও পাই। এর অর্থ হলো দাম ও মজুরির নমনীয়তা থাকার ফলে চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বিত হয়। দ্বিতীয় অনুমিতিটি নতুন। এটি তথ্য এবং তথ্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। এই অনুমিতি অনুযায়ী মানুষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাদের প্রত্যাশা নির্মাণ করে। সরকারের মতোই জনগণের কাছেও যদি সকল তথ্য থাকে, তাহলে জনগণকে বোকা বানানো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য, এই কথাটি সরকার শুধু নয়, বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদিও তাত্ত্বিকরা এই দিকটিতে সেভাবে আলোকপাত করেননি।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ সঞ্চয় করবে না ভোগব্যয় করবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে তার কাছে কী তথ্য আছে এবং তার ভিত্তিতে তার প্রত্যাশা কী দাঁড়াচ্ছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যাশাকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গঠনের পেছনে একটি নির্ধারক উপাদান হিসেবে দেখে তারা যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, তাকে বলা হচ্ছে যৌক্তিক প্রত্যাশা তত্ত্ব (Rational expectations hypothesis)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যৌক্তিক প্রত্যাশার ভিত্তি হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ ও সামগ্রিক তথ্য।

যোগাননির্ভর অর্থশাস্ত্র (Supply-side Economics)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৮০-র দশকের প্রথম পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব নিরোধে স্বল্পমোদি ব্যবস্থাপনার উপরই জোর পড়েছে বেশি। ৮০ দশকের শুরুতে বড় আকারে কর প্রত্যাহার করে অর্থনৈতিক ধীরগতি কিংবা স্থবিরতা থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিতে থাকেন কিছু অর্থনীতিবিদ। এই বক্তব্য পরে ক্লাসিক্যাল-নয়া

রু্যাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উপধারার জন্য দেয় যা ক্রমান্বয়ে 'যোগান নির্ভর অর্থশাস্ত্র' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

আশির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার নেতৃত্বাধীন সরকার এই অর্থশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ সমর্থন জ্ঞাপন করবার ফলে এটি সমগ্র ৮০ দশক জুড়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

এই অর্থশাস্ত্রের মূল বিষয় দু'টি: ১. প্রণোদনা (incentives) এবং ২. বৃহৎ আকারে কর প্রত্যাহার (large tax cut)। প্রণোদনা বলতে বোঝানো হচ্ছে কাজ, সংরক্ষণ এবং উদ্যোগের জন্য যাতে যথেষ্ট উৎসাহ থাকে সে রকম অবস্থা সৃষ্টি করা। উচ্চ কর, সরকারি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এর বিরোধী অবস্থা নির্দেশ করে। তারা কেইনসীয়দের সমালোচনা করেন এই বলে যে, কেইনসীয় মডেলে চাহিদা ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত জোর দেবার ফলে যোগানের উপর একেবারেই জোর দেয়া হয়নি। বড় আকারে কর হ্রাস এই যোগানের দিকটিকে চাঙ্গা করবার জন্য তাদের অবস্থানের সাথেই সম্পর্কিত। তারা মনে করেন যে, কর হ্রাস করলে তা বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সবই বাড়বে। কেননা উচ্চ কর মূলধন যোগান, বিনিয়োগ সবই কমায়। তাদের মতে কর উচ্চ আয়ভোগীদের উপর অনুপাতিকভাবে কম কর ধরা উচিত। তাতে তাদের বিনিয়োগ যোগান বাড়বে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি

বাস্তবে এসব নীতি অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে না পারায় ৯০ দশকে এসে এই ধারার প্রভাবও কমে যায়। প্রথমে ১৯৯৭-১৯৯৮ ও পরে আরও বৃহৎ আকারে ২০০৭-২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ধ্বস মূলধারার অর্থশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। সাময়িক সমাধানের পথ হিসেবে কেইনসীয় অর্থশাস্ত্রের পুনরাগমন ঘটে। সরকারগুলোর মধ্যে না হলেও বিদ্যায়তনে, রাজনীতিতে ও অনুসন্ধিৎসু মানুষদের মধ্যে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ষোড়শ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় খাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয়

Public sector and Public expenditure

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই ব্যবস্থাতেই আমরা রাষ্ট্রীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখি। এছাড়াও অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় কিছু ব্যয়েরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এগুলোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কিংবা কর্মপদ্ধতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় ভিন্ন। আমরা এখানে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কিংবা বাজার অর্থনীতির কঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় খাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করবো।

এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় খাতের মূল ভূমিকা থাকে বাজার প্রক্রিয়ার সম্পূরক। বাজার অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করা এবং বেসরকারি খাতের মুনাফা ঠিক রাখাসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সংকট সমাধানে সহায়তা করা এর অন্যতম কর্মসূচি। সেজন্যই বাজার অর্থনীতিতে যে সব ভূমিকার জন্য কিংবা যে সব যুক্তিতে সাধারণত রাষ্ট্রীয় খাত ও সরকারি ব্যয় গত কয়েক দশকে অনেকক্ষেত্রে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে যেগুলো হলো:

- * প্রতিযোগিতাকে সহায়তা করা
- * বেসরকারি খাত যে সব দ্রব্য যোগান দিতে সক্ষম নয় সেগুলো যোগান দেয়া।
- * বহিঃস্থ বিরূপ প্রভাব দূর করা। পরিবেশ দূষণ কমানো।
- * আইনি ব্যবস্থা।
- * আয় ও সম্পদের বিতরণ উন্নত করা।
- * সামষ্টিক ব্যবস্থাবলির উন্নয়ন।

২০০৭-৮ সময়কালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করার রাষ্ট্রীয় ভূমিকা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিশাল অংকের রাষ্ট্রীয় অর্থ দিয়ে ধসে পড়া বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থা উদ্ধারের কর্মসূচি প্রদান করে। নতুন নতুন নীতিমালা প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় সকল দেশে।

ছক ১: বিভিন্ন দেশে ৮০ ও ৯০ দশকে জিডিপির শতকরা হারে সরকারি আয়

দেশ	১৯৮০	১৯৯০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩০.৮	৩১.৮
জাপান	২৭.৬	৩৪.৬
পশ্চিম জার্মানি	৪৪.৭	৪৩.৪
ফ্রান্স	৪৪.৫	৪৬.৫

দেশ	১৯৮০	১৯৯০
যুক্তরাজ্য	৪০.১	৪০.৪
ইটালি	৩২.৯	৪২.১
কানাডা	৩৬.২	৪১.৬
ডেনমার্ক	৫২.২	৫৬.১
নেদারল্যান্ডস	৫২.৮	৪৯.৫
সুইডেন	৫৬.৬	৬৩.৯
ইউরোপীয় কমিশন (গড়)	৪১.৪	৪৩.৯
বাংলাদেশ		১৪.৬৭ (২০০০)

সূত্র: Economic Outlook, OECD, December 1992, হাউজিং, খান, মিড, ১৯৯৬।
বিবিএস, ২০০০

* সরকারী আয়ের মধ্যে আছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত আয়

ছক ২: বিভিন্ন দেশে দুই দশকে জিডিপি শতকরা হারে সরকারি ব্যয়

দেশ	১৯৮০	১৯৯০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৩.৭	৩৬.১
জাপান	৩২.৬	৩২.৩
পশ্চিম জার্মানি	৪৮.৩	৪৬.০
ফ্রান্স	৪৬.১	৪৯.৯
যুক্তরাজ্য	৪৫.০	৪২.১
ইটালি	৪১.৬	৫৩.১
কানাডা	৪০.৫	৪৬.৯
ডেনমার্ক	৫৬.২	৫৮.৪
নেদারল্যান্ডস	৫৭.৫	৫৫.৬
সুইডেন	৬১.৬	৬১.৪
ইউরোপীয় কমিশন (গড়)	৪৫.৬	৪৮.৭
বাংলাদেশ		১৮.৬ (২০০০)

সূত্র: পূর্বোক্ত

পরপর দুটো ছক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণভাবে সরকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রীয় খাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় নিয়ে বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের বিরোধিতা থাকলেও শিল্পোন্নত ও নেতৃস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশে সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অবস্থান করছে। উল্লেখযোগ্য যে, সরকারি ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো:

দ্রব্য এবং সেবার উপর মোট চূড়ান্ত ব্যয়: সেনাবাহিনী, পুলিশ, শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং সম্পর্কিত বিভিন্ন যোগান।

- মোট মূলধনী ব্যয়: সড়ক, সেতু, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয় নির্মাণের মত ব্যয়।
- ভর্তুকি
- ব্যক্তিগত খাতে মঞ্জুরি: পেনশন, বেকার ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।
- ঋণের সুদ ইত্যাদি।

সাধারণভাবে সরকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় নিয়ে বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের বিরোধিতা থাকলেও উপরের পরপর দুটো ছক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিল্পোন্নত ও নেতৃস্থানীয় পুঁজিবাদী দেশে সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অবস্থান করছে। অর্থনৈতিক সংকটের পর ২০০৯ সাল নাগাদ এর অনুপাত আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপরের দুটো ছক থেকে আমরা আরও দেখছি যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রের ভূমিকা কিংবা জিডিপিতে সরকারি আয় ও ব্যয়ের আনুপাতিক হার শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। অর্থনৈতিক সংকটের পরে গত দুই দশকে ‘মূলধারার অর্থশাস্ত্র’ দ্বারা পরিচালিত বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি’র সমর্থন, চ’প ও পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব ‘অর্থনৈতিক সংস্কার’ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের ভূমিকা অনেক সংকুচিত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পাট, সিল, কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অনেক প্রতিষ্ঠান এসময় বন্ধ হয়ে যায় বা ভেঙে পড়ে।

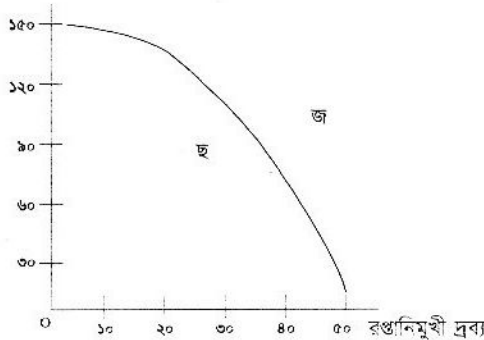
২

উৎপাদনের অগ্রাধিকার ও উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা (Production Possibility Curve)

যে কোনো অর্থনীতিতে কিংবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার ব্যবহার, বিকল্প উৎপাদনের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য উৎপাদন সম্ভাব্য রেখার ব্যবহার করা হয়। দুটো বিকল্প পথে বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে এই রেখা একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কিংবা একটি শিল্প কিংবা একটি অর্থনীতির জন্য উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও বাস্তব ব্যবহার সম্পর্কে চিত্র দিতে পারে। নিচে দুটো বিকল্প দ্রব্য, যেমন অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং রফতানিমুখী দ্রব্যাদি সম্পর্কে একটি ছক তৈরি করে আমরা এরকম একটি রেখা আঁকতে পারি।

সম্ভাবনা	রফতানিমুখী দ্রব্য	অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য দ্রব্য
ক	০	১৫০
খ	১০	১৪০
গ	২০	১২০
ঘ	৩০	৯০
ঙ	৪০	৫০
চ	৫০	০

অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য দ্রব্য



চিত্র ১৫.৪: উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা

উপরের চিত্রে বিভিন্ন বিন্দুতে একটি অর্থনীতির উৎপাদন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। একটি গ্রুপের দ্রব্যের বদলে অন্য গ্রুপের উৎপাদনের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা সুযোগ বর্জন ব্যয় (opportunity cost)-এর ধারণাও পাই।

চিত্রে আরও দুটো বিন্দু দেখা যাচ্ছে ছ ও জ। ছ বিন্দুতে অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না, যে কোনোরূপে এই বিন্দুতে দু'ধরনের পণ্যই কম উৎপাদন হবে। আবার জ বিন্দু উৎপাদন ক্ষমতার অতিরিক্ত যা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

একটি অর্থনীতি তার উৎপাদন ক্ষমতার বহুধরনের ব্যবহার করতে পারে। খাদ্য না অস্ত্র, ঔষধ না ক্ষতিকর নেশাদ্রব্য, শিক্ষার গ্রন্থ না হিংসাত্মক প্রকাশনা, শিল্প কারখানা না শপিংমল, গণপরিবহন না ব্যক্তিগত গাড়ি, বিপ্লব পানি না কৃত্রিম পানীয় ইত্যাদি কোনটির উৎপাদন অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার পাবে তা নির্ভর করে অর্থনীতির এবং সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের সামগ্রিক চরিত্রের উপর।

সারসংক্ষেপ

নব্য ক্লাসিকাল তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ সঞ্চয় করবে না ভোগব্যয় করবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে তার কাছে কী তথ্য আছে এবং তার ভিত্তিতে তার প্রত্যাশা কী দাঁড়াচ্ছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোনো অর্থনীতি কিংবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার ব্যবহার বিকল্প উৎপাদনের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য উৎপাদন সম্ভাব্য রেখার ব্যবহার করা হয়। একটি অর্থনীতি তার উৎপাদন ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহার করবে তা অর্থনীতির সামগ্রিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে।

গ্রন্থপঞ্জি

A. Koutsoyiannis: *Modern Microeconomics*, Macmillan, London, 2nd edition, 1979.

Dominick Salvatore: *Microeconomic Theory*, 3rd edition, McGraw Hill, 1992.

Dominick Salvatore: *Microeconomics*, Harper Collins, 1991.

Encyclopaedia Britannica, 1998.

F.M. Scherer and David Ross: *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Boston, 1990.

G.S.Maddala, Ellen Miller: *Microeconomics*, Theory and Applications, McGraw-Hill, 1989.

J. Vernon Henderson and William Poole: *Principles of Economics*, D.C. Heath and Company, 1991.

James M. Henderson and Richard E. Quandt: *Microeconomic Theory*, A Mathematical Approach, 3rd edition, McGraw-Hill, 1985.

J.M. Keynes : *The General Theory of Employment, Interest and Money*, 1936.

Joseph E. Stiglitz: *Economics*, WW Norton & Company. NY, 1st edition, 1993.

Keith Cowling and Dennis C. Mueller, "The Social Costs of Monopoly Power", *The Economic Journal*, December 1978.

Martian Hart-Landsberg: *The Rush to Development*, MR. NY, 1993

Miltiades Chacholiades: *International Economics*, International Edition, McGraw-Hill, 1990.

Orley M. Amos: *Microeconomics*, Wadsworth, 1987.

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus: *Economics*, 16th edition, Irwin-McGraw-Hill, US, 1998.

Paul Wonnacott and Ronald Wonnacott: *An Introduction to Microeconomics*, 2nd edition, McGraw-Hill, 1982.

Philip Hardwick, Bahadur Khan, John Langmead: *An Introduction to Modern Economics*, 4th edition, Longman, London, 1996.

Richard A. Bilas: *Microeconomic Theory*, McGraw-Hill, 2nd edition, 1982.

Robert L. Heilbroner and James K. Galbraith: *The Economic Problem*, 8th edition, Prentice-Hall, NJ, 1987.

Robert Wade: *Governing the Market : Economic Theory and the role of Government in East Asian Industrialization*, Princeton, NJ, 1990.

Stanley Fischer and Rudiger Dornbush: *Introduction to Microeconomics*, McGraw-Hill, 1983.

William J. Baumol: *Economic Theory and Operations Analysis*, Prentice-Hall, 1977.

আনু মুহাম্মদ : বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচল, ২০০০

————— : বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ, ২০০৫

————— : বিশ্বায়নের বৈপরীত্য, ২০০৫

এছাড়া

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো, (বিসিএস) বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, সিপিডি প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

গ্রন্থ

০১. বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং বাংলাদেশের অনুন্নয়ন, প্রথম সংস্করণ, করিম প্রকাশনী, ১৯৮৩; দ্বিতীয় সংস্করণ, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭।
০২. বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ (আতিউর রহমানের সঙ্গে), পাপড়ি প্রকাশনী, ১৯৮৪।
০৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ, প্রথম সংস্করণ, শহীদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫; দ্বিতীয় সংস্করণ, মীরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০।
০৪. বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল, প্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০।
০৫. বাংলাদেশের কোটিপতি, মধ্যবিভ ও শ্রমিক, চলন্তিকা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
০৬. অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র: সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩। দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ, সংহতি, ২০১০।
০৭. ক্রান্তিকালীন বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়ন সাম্রাজ্য, বস্তু প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২; দ্বিতীয় সংস্করণ, মীরা প্রকাশন, ২০০১।
০৮. পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
০৯. সমাজ, সময় ও মানুষের লড়াই, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৪।
১০. ধর্ম, রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, চার্বক, ঢাকা, ১৯৯৪।
১১. বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব?, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫।
১২. কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ও বহুজাতিক মানুষেরা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫।
১৩. নারী, পুরুষ ও সমাজ, প্রথম প্রকাশ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭। প্রথম সংহতি সংস্করণ, ঢাকা, ২০১০।
১৪. রাষ্ট্র ও রাজনীতি: বাংলাদেশের দুই দশক, সন্দেশ, ঢাকা, ২০০০।
১৫. বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।
১৬. আতঙ্কের সমাজ সত্ত্বাসের অর্থনীতি, মীরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১।
১৭. অর্থশাস্ত্রের মূলনীতি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
১৮. বাংলাদেশের তেল-গ্যাস: কার সম্পদ কার বিপদ?, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২।

১৯. বিশ্বায়নের বৈপরীত্য, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩।
২০. বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫।
২১. মানুষের সমাজ, রোদ প্রকাশন, রাজশাহী, ২০০৫।
২২. উন্নয়নের রাজনীতি, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০০৬।
২৩. বিপ্লবের স্বপ্নভূমি কিউবা, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।
২৪. ফুলবাড়ী কানসাট গার্মেন্টস ২০০৬, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।
২৫. ইলিয়াস এবং প্রশ্নের শক্তি, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯।
২৬. অরক্ষিত দেশ, অরক্ষিত মানুষ, এ্যাডর্ন, ২০০৯।
২৭. আনু মুহাম্মদ-এর সাক্ষাৎকার, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১০।
২৮. পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা, সংহতি, ঢাকা, ২০১০।

অনুবাদ গ্রন্থ

০১. হাত বাড়িয়ে দাও (বিচিত্রা, ১৯৮২), ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ২০০০।
০২. বাংলাদেশের বর্গাচাষ ও বর্গাচাষী আন্দোলন, ১৯৯০।
০৩. এঙ্গেলসের এন্টি ডুরিং, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫।

গ্রন্থ সম্পাদনা

০১. আসহাবউদ্দীন আহমদ রচনাবলী (১-৩ খণ্ড)।
০২. সইফ উদ দাহার রচনাবলী (কাজ চলছে)।
০৩. আখলাকুর রহমান রচনাবলী (কাজ চলছে)।



আনু মুহাম্মদ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬-তে
জন্ম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের
অর্থনীতি বিভাগ থেকে ছাত্রত্ব শেষ করে
এ বিভাগেই শিক্ষক হিসেবে যোগ
দেন। বর্তমানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান
হিসেবে কর্মরত। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী
বিপ্লবী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক
কর্মতৎপরতার সাথে দীর্ঘদিন ধরে
সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বর্তমানে তেল-গ্যাস-
খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা
জাতীয় কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব
পালন করছেন, সম্পাদনা করছেন
ইন্টারনেটভিত্তিক পত্রিকা ‘মেঘবার্তা’
(www.meghbarta.org)। রাজনীতি,
অর্থনীতি, পরিবেশ ও নারী প্রশ্নে এ
পর্যন্ত তাঁর ৩০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত
হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর
কয়েকটি গ্রন্থ *Development or
Destruction?: Essays on Global
Hegemony, Corporate Grabbing and
Bangladesh*; বিপ্লবের স্বপ্নভূমি কিউবা:
বিশ্বায়িত পুঁজিবাদে ল্যাটিন আমেরিকা
এবং কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ।

‘অর্থশাস্ত্র পরিচয়’ মূলতঃ একটি পাঠ্যবই, তবে কেবলমাত্র অর্থনীতির ছাত্রদের জন্য লেখা নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকের একটি বড় দুর্বলতা হলো ছাত্রদের সহজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে সেগুলো রচিত হয়, অর্থশাস্ত্র পরিচয় সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী। অর্থশাস্ত্রের সাথে পরিচিত হতে আগ্রহী যে কারো জন্য এটি নির্ভরযোগ্য প্রবেশিকা গ্রন্থের অভাব মেটাবে।

‘অর্থশাস্ত্র পরিচয়’ রচনাকালে লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল বিষয়টিতে সম্যক ধারণা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যেন বাস্তব জীবনের সাথে এই শাস্ত্রটির সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। এভাবে লেখক বইটিতে অর্থনীতির জটিল ও গূঢ় প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে না গিয়ে, অর্থশাস্ত্রের পরিধি আর অর্থনীতিবিদের দায়কে সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করেছেন।

অর্থনীতির পাঠ্যসূচিগুলি প্রায়ই এমনভাবে রচিত হয়ে থাকে যে, শিক্ষক আর শিক্ষার্থী উভয়েই একচক্ষু দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপ্তকের ‘উন্ময়ন ব্যবস্থাপত্রের’ কাছে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ করে, উদ্বৃত্তমূল্যের রহস্য তাদের কাছে চিরগোপনই থেকে যায়, মজুরির বৃদ্ধির সাথে সমাজের সার্বিক বিকাশের কোন সম্পর্কই স্থাপন করতে পারে না সে। ফলে শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতি পর্যবসিত হয় স্রেফ লাভ আর লোকসানের সরল এবং গং বাঁধা বুলিতে।

‘অর্থশাস্ত্র পরিচয়’ সেই বিবেচনায় সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি পাঠ্যপুস্তক, পাঠককে তা প্রশ্ন করতে শেখাবে; আর সকল পাঠ্যপুস্তকেরই আদতে তাই হবার কথা ছিল।

মংগলি

দাম : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN 978-984-8882-06-1



9 789848 888206